ফাল্গুন—১৩৪২

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রয়োবিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

মাটি, না, মা-টি ?

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

পাথর, মাটি, জল—এ সব "ভূত," জড় পদার্থ! কিন্তু এ ভূত যে দশচক্রে ভগবান্ ভূত, আর এক জড় যে জড়ভরত—তা এতদিন ত' খেয়াল করি নাই। কথাটা খোলসা করিয়া বলার দরকার। যে গুলোকে আমরা অচেতন, নির্জীব, জড় ভাবি, তারা সত্য সত্যই কি তাই? আমরা মানুষ, আমাদের জীবন ব্যবহার বা এক কথায়, কারবার চালাইবার জন্য এক একটা কারবারি জগৎ বা হাট ফাঁদিয়া বসিয়া আছি। তুমি, আমি মাঝারি মানুষ। তোমার, আমার কারবারি জগৎ সর্ব্বথা এক নয়। দুটো বৃত্ত যদি হয়, তবে সে বৃত্ত দুটো হুবহু মিলিয়া যায় না। কাটাকাটি করে। খানিকটায় মেলে, খানিকটায় মেলে না। কাণ খাড়া করিয়া থাকিলে একটার তোপ আমরা দুজনেই শুনি; কুইনিন গালে দিলে দুজনারই তিত লাগে; আগুনে দুজনারই হাত পোড়ে; জল, মাটি এ সবের ভেতর প্রাণ ও চেতনার পরিচয় তুমিও পাও না, আমিও পাই না। ইত্যাদি। কিন্তু আমার শিরঃপীড়া আমারি, তোমার নয়; আমার ভাবনা, চিন্তা, কল্পনা-জল্পনা এ সবও তাই। তোমার আলাহিদা। তলাইয়া দেখিতে গেলে অনুভূতি (Experience) মাত্রই অনন্যসাধারণ (unique)—সূক্ষ্ম হিসাবে।

যেটাকে বাহ্যজগৎ বলিয়া কারবার করিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়াছি—খোদ আমরা নিজেরাই সল্লা পরামর্শ করিয়া এটাকে গড়িয়া পিটিয়া লইয়াছি এমনটা ঠিক নয়; লক্ষ লক্ষ বৎসর আমাদের জীবনযাত্রার ফলে সেটা মোটা-মুটি একভাবে আমাদের পক্ষে গড়িয়া উঠিয়াছে—সেটাকেও তুমি বা আমি ঠিক একই ভাবে অনুভব করি না; সেটার সম্পর্কে তোমার ও আমার কারবার ঠিক একই নয়। বাইরের রূপ, রং যে ঠিক একই ভাবে তুমি ও আমি দেখি এমন নয়; শব্দ সম্বন্ধেও তাই; স্পর্শ, গন্ধ, রস সম্বন্ধে আরও বেশী করিয়া তাই। তবে, তোমায় আমায় কারবার চালাইতে হইতেছে বলিয়া দুজনেই নিজের নিজের পুরো "সজীব" অনুভূতিকে ছাঁটিয়া মোটামুটি "সমান" করিয়া লইয়াছি, আর সমান ভাবিয়াই ব্যবহার চালাইতেছি। এ

সবে কারবারি মিলের চাইতে গরমিল যেখানে বেশী, সেখানে আমাদের কারবারে গোল বাধে। যে আকাশে একটা চাঁদের যায়গায় ত্নটো তিনটে চাঁদ দেখে, সাদা সবুজ সব রংকেই হল্‌দে দেখে, তাকে আমরা কারবার হইতে ছুটি দিয়া আই ইন্‌ফার্‌মারিতে পাঠাইয়া দিই। গোলটা মনের দিক্‌ হইতে হইলে, তাকে রাঁচি পাঠাইতেও হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, কারবারে কলে-ছাঁটা মাজা-ঘষা দেখা শুনা ইত্যাদির চাউলই কাটিতেছে; আ-ছাঁটা, অথবা নিজের নিজের "ঘরের ঢেঁকি" ছাঁটা চাউল কাটিতেছে না। কলে-ছাঁটা চাউল চলিতেছে বলিয়াই আমাদের এই ব্যাপক "ফুলো"-ব্যাধি—ভবরোগ। যে কলে ছাঁটাই হইতেছে ব্যক্তিগত (প্রাতিস্বিক) পূরো অনুভূতিগুলি, সে কলটা লাখ লাখ বৎসর ধরিয়া মানুষের ধরাপৃষ্ঠে জীবন সংগ্রামের ফলে গড়িয়া পিটিয়া উঠিয়াছে। শুধু মানুষই বা বলি কেন—মানুষের গোড়া ধরিয়াও টান মারিতে হয়। সে কলটা বিচার-বিবেকের ততটা নয়, যতটা "অন্ধ" আচার আর সংস্কারের। আমাদের ধাতে সে কলটা বাহাল হইয়া রহিয়াছে। তাই প্রায় বিনা বিচারেই, আমরা—যারা মাঝারি মানুষ তারা, বাইরের জিনিষ আর ব্যাপারগুলোকে একই রকম ভাবে পাইতেছি মনে করিতেছি। সত্য সত্যই যে একই রকম ভাবে পাইতেছি এমন নয়।

যেটাকে আগে "কল" বলিলাম, সেটাকে "ছাঁচ" বলিলেও হয়। তোমার ছাঁচ ও আমার ছাঁচ মোটামুটি একরূপ, হুবহু একরূপ নয়। মানুষের ভেতরেও গরমিল কোথাও কোথাও, কোন কোন অবস্থায়, "অস্বাভাবিক" (abnormal) হইতে পারে। একজন জন্মান্ধ অথবা একজন মূকবধির যে ছাঁচে তার জগৎটা ঢালাই করিয়া লইতেছে, সে ছাঁচ তোমার আমার নয়। যাদের আমরা "পাগল" বলি, বাতিকগ্রস্থ বলি, তাদেরও ছাঁচ আলাহিদা। যাঁদের ভেতর কোনও রকম অসাধারণ আধ্যাত্মিক বিভূতি (Psychic Power) বিকশিত হইয়াছে—(যথা—যোগী, মিডিয়াম ইত্যাদি) তাঁদেরও ছাঁচ আলাহিদা। এমন কি, বৈজ্ঞানিক—যিনি যন্ত্রপাতি সাহায্যে তাঁর প্রত্যক্ষের জগৎটাকে অনেক বড় করিয়া লন এবং তাঁর হিসাবে (Theory) ও গণাগাথা দ্বারা সেটাকে "পরিকল্পিত" করিয়া লন—তাঁর ছাঁচটিও আলাহিদা। জন্মান্ধের জগৎকে আমরা মাঝারি মানুষ অসম্পুর্ণ জগৎ বলি; পাগলের জগৎকে জগাখিচুড়ি মনে করি; যোগীর জগৎ অতীন্দ্রিয়—হয়ত' ধ্যান (trance) এর ভেতরেই তার অস্তিত্ব; বৈজ্ঞানিক এ যুগে বড়ই জবরদস্ত; তবু তাঁর থিওরি আর ব্যাখ্যা এত ঘন ঘন তিনি পাল্টাইতেছেন এবং "তথ্য"গুলিও এত তাড়াতাড়ি ডিগবাজি মারিতেছে যে, তাঁর জগৎটাকেও বৈজ্ঞানিক ধুরন্ধরেরাই কেহ কেহ "মায়াপুরী" ভাবিতেছেন। অথচ, যোগীর দাবী তাঁর জগৎ "সত্যলোক," আর বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস তাঁর জগৎ "ধ্রুবলোক"। মাঝারি মানুষের মামলাটাও যে সহজ এমন মনে করিও না। মাঝারি মানুষ কে বা কাহারা?—এ প্রশ্নের জবাব এক তুড়ি মারিয়া দেওয়া যায় না। তোমার, আমার, তার—এ তিন জনের মাথার খুলির মাপ যদি ৮০, ৮৭, ৯০ হয়, তবে গড়ে আমাদের তিনজনের মাথার খুলির মাপ হইল ৮৫·৬। কিন্তু আমাদের কাহারও মাপ ৮৫·৬ নয়। ভারতবর্ষে লোকের গড়ে আয় বাৎসরিক ৩০৲ টাকা, আয়ুঃ ২৩ বৎসর ইত্যাদি। বহুলোকের দেখা-শুনা (Observation) গুলো পরস্পর তুলনা করিয়া লওয়ার প্রয়োজনীয়তা সকল অভিজ্ঞ পরীক্ষক ও বিচারকই অবগত আছেন। বিজ্ঞানের রিপোর্ট দাখিলায় অনেক সময় দেখি তাদের একটা গড় কষিয়া লইতেও হইয়াছে। সেই গড়-পড়তা লইয়াই বিজ্ঞানের অণ্বীক্ষা—আণ্বীক্ষিকী বিদ্যা। এ কথাটা এ ক্ষেত্রে ফলাও করিতে চেষ্টা করিব না। তবে দেখিতেছি যে, "মাঝারি মানুষ" যদি বিজ্ঞানের গড়পড়তা মানুষ হয়, তা হইলে, সে মানুষ একটা আদর্শ মাত্র; একটা গণিতের সংখ্যা; ভাব-লোকে সে মানুষ বিদ্যমান, নরলোকে তার সত্তা নাই।

আরও এক কথা মনে রাখা দরকার। বিজ্ঞানেই কেবল যে গড় কষার দরকার আছে এমন নয়। আমাদের আটপৌরে "কারবারি হাটেও" গড়পড়তা চলিতেছে। বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম হিসাব—যেমন, বিজ্ঞানাগারে এক গ্রামের কোটি ভাগের এক ভাগ অথবা এক ইঞ্চির নিযুত ভাগের এক ভাগ পর্য্যন্ত হিসাব লওয়ার বন্দোবস্ত আছে। আমাদের হাটে কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব বাটখারা ও মাপ-কাঠি অল্প বিস্তর আলাহিদা; তবু বাজার-চলন একটা সাধারণ ওজন ও মাপ হওয়ার ব্যবস্থাও রহিয়াছে। রহিয়াছে বলিয়া কারবার চলে, লেন-দেন (ব্যবহার) চলে। হিসাব

এক্ষেত্রে মোটামুটি, জাবদা। সামান্য অডিটেই গরমিল, গোঁজামিল ধরা পড়ে। যাক্—এ সব কথাও আর একদিন পরিষ্কার করিতে যত্ন করিব।

এখন, তোমার-আমার ভিতরে যে "কল" বা "ছাঁচ" রহিয়াছে এবং সদাই জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির শিপ্‌টে চলিতেছে, তার কাজ হইতেছে—বাছাই, ছাঁটাই, ঢালাই। মানে—অনুভূতির "কাঁচামাল" মাত্রই এতে বাছাই হইতেছে, ছাঁটাই হইতেছে, ঢালাই হইতেছে। সব কিছু অপক্ষপাতে, সমগ্র, সম্পূর্ণভাবে আমরা নিই না; নেবার জন্য প্রস্তুত নই; নিলে কাজও চলে না। যে আকাশে ধ্রুবতারাটি দেখিতে চায়, তার আকাশের সব বাদ দিয়া একটু-খানিতেই অভিনিবেশ করিতে হয়। যে রাস্তায় বাড়ী-ভাড়ার নোটিশ খুঁজিতে বাহির হইয়াছে, তার স্থান বিশেষেই মনোযোগ দিতে হয়। সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি, অপক্ষপাত হইলে চলে না। তাতে কাজের হাঙ্গামা ঢের বাড়িয়া যায়। হয়ত কাজটা ফাঁসিয়াই যায়। ভিতরে বাছাই, ছাঁটাই, ঢালাইএর যে যন্ত্রটি কাজ করিতেছে, সেটাকে অভিনিবেশ বলিতে পারি। তার মূলে পক্ষপাত—রাগ-দ্বেষ। "রাগ" সংস্কৃত রাগ (=অনুরাগ), বাংলা রাগ নয়। ইংরাজিতে এক কথায়—Interest. এর সবটাই, এমন কি, বেশীটাই—জ্ঞাতসারে, "সজ্ঞানে" কাজ করে না। অল্প-স্বল্প করে। বেশীর ভাগ, সাগরে ডুবো বরফের চাঁই-এর মতন, আড়ালে আব্‌ডালে—অবচেতনা বা আধ-চেতনার ভেতরে থাকিয়া কাজ করে। কেন আমার বাছাই-ছাঁটাই-ঢালাইএর যন্ত্রটা (রাগ-দ্বেষগুলো, পক্ষপাতগুলো, Interestগুলো) এমন-ধারা হইল বা হইয়াছে, তার কৈফিয়ৎ উপস্থিত "বৈঠক" (Situation)এর বিচারে বা হিসাবনিকাশে খানিকটা বই সবটা পাওয়া যায় না। তার পিছনে রহিয়াছে আমার (সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠী, জাতি, মানবতা, এবং মানবেতর সত্তা সমূহের) লক্ষ লক্ষ বৎসরব্যাপী গোটা বিরাট্ ইতিহাস। এখনকার উপস্থিত "বৈঠক" সামান্য একটুখানি হদিশ দিতে পারে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু বৈঠক (situations) টানিয়া আনিয়া গাঁথিয়া যুড়িয়া লইতে হইবে। আমার সত্তার বর্ত্তমান "টুকরা" (section)টিতে চলিবে না, সত্তার অনাদি ধারায় ডুব মারিয়া খোঁজ করিতে হইবে। আমার যন্ত্রটার শক্তিকূট (diagram of components) যদি হয়—(ক, খ, গ, ঘ……), তোমারটার হইবে—(ক', খ', গ', ঘ'……); "বীজ" বা কম্পোনেণ্টগুলো শুধু যে একটু আধটু আলাদা-ধাঁজের এমন নয়; সম্ভবতঃ, দুই চারিটে মোটেই মেলে না। আমার হয়ত আধ্যাত্মিক, অলৌকিক, অতীন্দ্রিয়ের দিকে "ঝোঁক", বিশ্বাস ও বোধ বেশী বেশী; তোমার কম। তুমি ও দিকে ততটা ভিড়িতেই চাও না; ও-সব তেমন মানতে চাও না। বীজ বা কম্পোনেণ্টগুলো যে আলাদা তা ছোট-বড়, খুঁটিনাটি অনেক তাতেই ধরা পড়ে বা "বিশ্লেষণ" ক'রে দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এক আমারি যন্ত্র বদ্‌লাইতেছে। বাল্য, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্যে ঠিক ঠিক এক নয়। জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে ঠিক এক নয়। স্বপ্নে যন্ত্রের অনেক "ভেতর গোপ্তা বা চোরা প্যাঁচ" ধরা পড়ে। ফ্রয়েড্ প্রভৃতি তাই নিয়ে নতুন শাস্ত্র খাড়া করিয়াছেন। আমাদের দেশী শাস্ত্রও আছে। জাগরণে যিনি সাধু সর্ব্বত্যাগী, তিনি স্বপ্নে হয়ত' বা কাম-কাঞ্চন আস্বাদ করিতে লোলুপ। ওতে যন্ত্রের পরখ হয়, সু-আড়া, বে-আড়া যেখানে যা কিছু, তা ধরা পড়ে।

মানুষের নানান্ অবস্থায় তার যন্ত্রস্থ শক্তিকূট (ক, খ, গ, ঘ...ইত্যাদি) আলাহিদা। বন মানুষ, "বুনো" মানুষ, আধা-সভ্য ও সভ্য মানুষ—এদের মধ্যে বিস্তর ফারেগ। বুনো মানুষ (savage) মাটি, জল, বাতাস, মেঘ, ঝড় ইত্যাদি "আত্মীয়" করিয়া, কিনা, সজীব সচেতন ভাবে দেখে। তাদের ভেতরও ইচ্ছাশক্তি আছে; রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি আছে। এমন কি, আমাদের চাইতে বেশী বেশী আছে। তারা হয় দেবত-বিগ্রহ, নয়ত দানব-বিগ্রহ। এক কথায় তারা সেই পুরাতন অর্থে—"অসুর"। অথবা—"দেব"। যা খুসী। শুধু স্যাভেজ কেন, শিশুরাও তার চারধারের জগৎটাকে "নিজের মতন" ভাবে—সজীব, সচেতন। শিশু হোঁচট্ খাইয়া পড়িয়া কাঁদিল। যাতে হোঁচট্ খাইল, সেইটাকে তুমি মারো, শিশুর রাগ পড়িবে, খুসি হইবে। ঘর-দোর, মাটি-পাথর, গাছ-পালা কুকুর-বেড়াল তার "খেলু"দেরই সামিল। হয় অরি, নয় মিত্র। শিশুর "বোধোদয়" হয় নাই, বুনোর মাথার খুলি অপরিণত, তাই (অর্থাৎ, বিচার নাই বলিয়া) তারা এমন ভাবে, এমন করে। কিন্তু বেদের ঋষি, নর্‌ম-গাথার ঋষি ইত্যাদি ইত্যাদি বহু পুরাতন "যন্ত্র" মাটি, পাথর, জল, বাতাস,

আকাশ, বিদ্যুৎ এসব "দেব" "অসুর"রূপেই দেখিয়া গিয়াছেন যে! এখনও মহাত্মা, মহাপুরুষ যাঁদের আমরা বলি, তাঁরাও দেখি "খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী" এসব "জড়" মানিতে নারাজ। সবই নারায়ণ—"নারায়ণ এবেদং সর্ব্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যম্"। এই সেদিনও পরমহংসদেব ঘর-দোর, কোশা-কুশী, ফুল-বেলপাত, নৈবেদ্য, গঙ্গাজল সবই চিন্ময় দেখিলেন! কি দিয়ে কেই বা কার পূজো করে? চিন্ময় মহাসাগরে নানান্ ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে। তার ভেতর কখনও মীনের মতন ডুব সাঁতার খেলে বেড়াচ্ছি; কখনও নুণের পুঁতুল যেমনধারা নুণের সাগরে গ'লে যায়, তেমনি ধারা বেমালুম গ'লে গিয়েছি! তল্লাস নেই, পাত্তা নেই! বৈষ্ণব বা আরও কেউ কেউ এই প্রাকৃত, "জড়ীয়" লোকটাকে তফাৎ করেন; কিন্তু কেন? অপ্রাকৃত, নিত্য, সত্য চিন্ময় ধামটিতে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য নয় কি? নৈলে "সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ"। বিষ্ণু মানেই তাই। বিষ্ণু—বৈমুখ্য, ভেদ-দৃষ্টি, সংসারবুদ্ধি—এতে ক'রেই এই সাধারণ ব্যবহারের জগৎটাকে "প্রাকৃত", "নশ্বর", "জড়ীয়" ক'রেছে। সোজা, সিধে, সুমুখ, সরস হ'লে নিত্য, চিন্ময়, রসময়, লীলাময়, ব্রজ বই আর কোথাও কিচ্ছু নেই। অর্থাৎ, তোমার বেয়াড়া যন্ত্রটি সোজা হ'লে। চিৎ, অচিৎ, ঈশ্বর—এসব তত্ত্বনির্দ্দেশও আচার্য্যদের এই কারবারি, চলতি, বেয়াড়া যন্ত্রটাকে শোধরাইয়া লইবার ফিকির। তুমি আমি কারবারে কতকগুলো বস্তুকে "জড়" বানাইয়াছি যে! শিবকে বাঁদর গড়িয়াছি! জড় হিসাবেই কারবার (সং সাজার, বাঁদর নাচের?) চলিতেছে যে! "কারবার বন্ধ কর" বলিলেই ত' বন্ধ করিতে পারি না! মুস্কিল! মায়াবাদী বেদান্তী অথবা শূন্যবাদী হয়ত' একদম বন্ধ করিতে বলেন। ততদূর না পারিলেও, কারবারের "ভোল" ফিরানও ত' সহজ নয়! তাই চিৎ, অচিৎ, ছোট, বড় ভেদটা নিয়েই সুরু কর। যন্ত্রটা আগে শোধ্‌রাও—পরে আপনিই বুঝ্‌বে—কে, কি, কেমন! এইটা হইল আচার্য্যদের পন্থা। যাক্—ফেরা যাক্—অনেক দূর "কোয়াসায়" এগিয়ে পড়া গেছে। হাঁ, আমাদের "বেয়াড়া" যন্ত্রে, কারবারি চশমায় ও-সব কোয়াসা বই কি! "জ্যোতির্ম্মা গময়—"

কিন্তু যন্ত্রটা বেয়াড়া? আমাদের ফাঁদা এই কারবারের হিসাবে খাসা সু-আড়া। এইটেই সু-আড়া, সয়সে আছা। যোগী ঋষি তাঁদের যন্ত্র নিয়ে এসে এ কারবারে "খৈ" পাইবেন না। বুনো ত' হারিয়া কোণঠেসা হইয়া রহিয়াছে। শিশুও চিরকাল শিশু থাকিলে তার সুবিধা নেই। "কাজের মানুষ" পাকা কারবারী প্রায় সকলকেই বনিতে হইতেছে। নহিলে উপায় নেই। অথচ, আসলে অনেকটাই ভূয়া কারবার এটা—ফলং—বধবন্ধনম্! ত্রিতাপ জ্বালা! পরিত্রাণ নেই। হয়—পারত'—কারবার একদম বন্ধ কর; নয়ত' একদম ভোল ফিরিয়ে দাও। শেষেরটাই সোজা, বহুৎ আচ্ছা। ভোগো যোগায়তে। প্রত্যেক রকম কারবারে তার নিজস্ব "হিসাব" (frame of reference) আছে। বাহালিটারও নিজস্ব একটা আছে। সেই মামুলিটার মোটামুটি নাম রাখিয়াছি—সভ্যভব্য জীবন-যাত্রা। ওপরকার, খোসার হিসাব এটা। তবু এই-ই সই। বুনোর জীবনযাত্রা, শিশুর জীবনযাত্রা, পাগলের জীবনযাত্রা, যোগীর জীবনযাত্রা (অর্থাৎ, abnormal ও subnormal দুই-ই)—এ সবের হিসাব, মূল frame of reference, আলাহিদা।

বৈজ্ঞানিকের "জগৎ" আর তার হিসাব মান (ঐ frame of reference)ও আলাহিদা। আমাদের অ-দেখা সেখানে দেখা। আমাদের দেখা অনেক কিছু সেখানে বাতিল। শব্দের ঢেউ, আলোর ঢেউ—এসব আমাদের কারবারি জগতে নেই। কাজ চালানর জন্য দরকার নেই বলিয়াই নেই। বাতাসের ভেতর দানাগুলোর ছুটোছুটি, ধাক্কাধুক্কি; অণুর ভেতর, এটমের ভেতর, খুব বাঁধিয়া অদ্ভুত কেরামতি নাচ;—এসব আমার কারবারি হিসাবের বাইরে। আকাশে জ্যোতিষ্কদের সঙ্গে আমার যতটুকু যেমন ধারা পরিচয়, বৈজ্ঞানিকের তেমন ধারা নয়। এই রকম অনেক ক্ষেত্রেই। আমার দেখা-শুনো ইত্যাদি কতকগুলি গণ্ডীর মধ্যে, সীমার ভেতরে। বিজ্ঞান সে গণ্ডী ভাঙ্গিয়া দেয়; সীমা এ-মুড়ো ও-মুড়ো দুমুড়ো ছাড়িয়ে যায়। আমার কারবারি জগতের তুলনায় বৈজ্ঞানিকের জগৎটা বেশী খাঁটি মনে করিতেছি। তবু সেটাও হয়ত' মায়াপুরী! বৈজ্ঞানিক খাঁটি বাস্তব লইয়া কারবার করেন না। অন্ততঃপক্ষে তাঁদের নিজেদেরও অনেকের সংশয়। তাঁর নিজস্ব কলে (থিওরি ও যন্ত্রপাতির) তিনিও দস্তুরমত ছাঁটাই বাছাই ঢালাই করেন। বুঝহ যে জান সন্ধান।

এই ত' ব্যাপার! নানান্ হিসাব, নানান্ মান (frame of reference); কাজেই, ঘাটে ঘাটে, ধাপে ধাপে, মোড়ে মোড়ে কারবারি জগৎ সব আলাহিদা। কোনটাই পুরা, "জলজীয়ন্ত", বাস্তবের "কাণ ঘেঁষিয়া" যায় না। এর ভেতর আমাদের মত সাধারণ জীবের জগৎ—যতই "কেজো" হোক্, যতই ভোটে ভারী—দমে ভারী হোক না কেন,—নিতান্তই সঙ্কীর্ণ ও বিকৃত জগৎ। আমরা মধু-কৈটভের এলাকায় বাস করি। জীব মাত্রই। একজন কৃপণ কিপ্‌টে টিপে টিপে টুকরো টুকরো করিয়াই দিতে জানে। আর একজন ঠকবাজ, সে টুকরোটুকুও ভেজাল বানিয়ে দেয়। ওপরে খাঁটির লেবেল! গোটার কারবার নেই, খাঁটিও চলে না। তাই বলিতেছিলাম—আমাদের "ছাঁচ"টা, যতই না "জীবনযাত্রার" পক্ষে কেজো হোক্, বেয়াড়া। তাকে বিশ্বাস নেই। শুধু তর্কের অপ্রতিষ্ঠাই নয়, চলতি বস্তুজ্ঞানেরও অপ্রতিষ্ঠা। অথচ এই বেয়াড়া বুদ্ধি নিয়েই বলি—মাটি, পাথর এসব জড়, "ছোটলোক"! আসলে, মাটি পাথর—এসব যে চিন্ময়, চিদ্‌বিগ্রহ নয় তা কে বলিবে? কার তেমন বুকের পাটা? আমাদের কারবারি বেয়াড়া বুদ্ধির সে এক্তার নেই। তার জ্যাঠামিতে জটলাই বাড়ে। দর্শনের ভাষায় আমাদের সাধারণ ব্যবহারিক জগৎ আমাদের "অদৃষ্ট" ও কর্ম্ম দিয়ে গড়া। এ দুটোকে যদি বলি (ক, খ), তবে, সে জগৎ হইতেছে (ক, খ) এর ফাংশন্ (function)। যতক্ষণ (ক, খ) এভাবে আছে, ততক্ষণই জগৎটা এ-ভাবে আছে। অর্থাৎ, মাটি, পাথর এসব প্রাণহীন, চেতনাহীন জড়—এই কারবারি ভাবের মাল ততক্ষণ কাটিতেছে। ততক্ষণ তারা অচিৎ—তাদের ভেতর চিতের সাড়া নেই। সাড়া শোনবার দরকার নেই, শুনিতে প্রস্তুত নেই বলিয়াই নেই। জগৎটা (ক, খ)এর না হইয়া (গ, ঘ)এর function উৎপাদ্য (উৎপাদিত ফল) হইলে হয়ত' সাড়া পাইতাম। যাদের সেরূপ, তারা হয়ত' পায়ও। অন্য শ্রেণীর জীব (উচ্চাবচ) হয়ত' পাইতেছেন। বৈজ্ঞানিক এরির মধ্যে নতুন এক সাড়া পাইতেছেন। সাড়া=Response; গাছ-পালা, ধাতু ইত্যাদির ভেতর বিষ ক্রিয়া, মাদক ক্রিয়ার খুব সূক্ষ্ম সাড়াও আচার্য্য জগদীশচন্দ্র আমাদের "শোনাইয়াছেন"। নানান্ ক্ষেত্রেই নূতন সাড়া পড়িয়াছে। যোগীদের ত কথাই নেই। যারা স্বাভাবিক অবস্থার (natural stateএর) খুব কাছাকাছি—যথা বর্ব্বর, শিশু—তারাও জড়ে "ভূতে" প্রাণের, চৈতন্যের সাড়া পায়। কবিরাও হয়ত' (যথা, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ) কেহ কেহ পান। কবির মিষ্টিসিজ্‌ম্, ঋষির ভিশন্—"সাক্ষাৎকার"—এ সবেরও অনুভূতি আলাহিদা। আমাদের "কেজো বৈঠকে" জগৎটা মরিয়া ভূত হইয়া গেছে। কেন না, ছুরি চালাইতে হইবে যে! এটা যে মর্গ! শুটকী মাছের হাট আমাদের; তাজা, টাটকা গোটা বিকোয় না; লোণা, বাসী, ভাগাই কাটিতেছে। অথচ, সোণার অনন্ত হাতে, নাকে ফাঁদি নথ, মেছুনী মাগীর দেমাক কত! দরে না বনিলে আঁশ জলের ছিটেও দেয়! মেছুনীটি আমাদের হেঁসেল ঘরেই বাসা নিয়াছে—নামটি তার "কেজো বুদ্ধি"—practical, commonsense। আসলে, তার অনেকটাই common nonsense। আমাদের চলতি "সভ্যতার" প্রতিষ্ঠা ইনি। স্বরূপে, স্বভাবে এ "সভ্যতা" অচল; কৃত্রিমতায়, বিকারে সচল। এটা ঠিক "স্বাস্থ্য" নয়। কেউ কেউ "ব্যাধি"ই বলিয়াছেন; তার নিদানও করিয়াছেন। ততদূর না হোক্—এর হিসাব, এর বিবৃতি সত্য বাস্তবপূর্ণ অনুভূতির পাকা খাতায় নির্ব্বিচারে উঠিবার যোগ্য নয়।

ঋষিরা বলেন—সবই খাঁটি খাঁটি ("খলু") ব্রহ্ম। নির্ব্বিশেষ, সবিশেষ ব্যাখ্যার গোল বাধাইও না। আসল মানে—সবই—এমন কি, একটা ধূলোও—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ—পূর্ণ বিগ্রহ! "পূর্ণ মদঃ—" পূর্ণ ছাড়া কিছু নেই। তোমার শুটকী ভাগার কারবার, তাই ধূলোকে ছোটলোক দেখ; ভাবো—"ও ত' ধূলো মাটি!" আসলে ব্রহ্মই। হালের এটম্‌ও দেখ্‌ছি একটা ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্ম নিখিল "সৃষ্টি" করিয়া তাতে "অনুপ্রবেশ" করিয়াছেন—এর মানেও তাই! ব্রহ্ম বা পুরুষ তাই "গুহাহিত"; তাঁর শ্রীমন্দির তাই স্বল্প "দহর"। ব্যবহারে—তোমার আমার "কেজো হিসেবী চশমা"র চোখেই তাই। নৈলে, শুধু সর্ব্বত্র ভগবান এমন নয়, সবই ভগবান্। ভক্ত তুমি, রসিক সুজনের মতন দেখিয়া হাঁসিও; ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিও না। কুতো ভয়, ভয় কিসের? মরা মোটেই নেই, সব রাম। ভূত নেই, সব শিব। ধারা সত্যি সত্যি নেই, রাধা আছেন। যাক্, ও-সব হেঁয়ালি গুহ্য কথা। ঈশ্বর

সব "সৃষ্টি" করিয়াছেন—মাটি, পাথর, জল, বাতাস, আকাশ—এসব তবে "সৃষ্ট" পদার্থ, "ভূত"! ও গো তাই নাকি? শুধু "সৃষ্টি" করেন নি, সব হইয়াছেন! সৃষ্টি মানেই তাই। থিজ্‌ম, প্যান্‌থিজ্‌মের ঝগড়া তুলো না। ফ্যায়দা নেই। শ্রুতি বলেন—"পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি। নারায়ণাৎ প্রাণো জায়তে মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী…"। বেশ, তার পর? "অথ নিত্যো নারায়ণঃ। ব্রহ্মা নারায়ণঃ। শিবশ্চ নারায়ণঃ। শক্রশ্চ নারায়ণঃ। কালশ্চ নারায়ণঃ। দিশশ্চ বিদিশশ্চ নারায়ণঃ। ঊর্দ্ধঞ্চ নারায়ণঃ। অধশ্চ নারায়ণঃ। অন্তর্বহিশ্চ নারায়ণঃ। নারায়ণ এবেদং সর্ব্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যম্। নিষ্কলঙ্কো নিরঞ্জনো নির্ব্বিকল্পো নিরাখ্যাতঃ শুদ্ধো দেব একো নারায়ণো ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চিৎ।" কেমন? বিশ্বরূপ, আবার বিশ্বাতিগরূপ; "অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্", দুই-ই মিলিল ত'? ভগবান্ আমাদের দশচক্রে ভূত হইয়াছেন যে! জড় যে ঘোর সমাধিমগ্ন জড়ভরত! তার ঘাড়ে পান্ধি বয়াবে, বয়াও। কিন্তু হুঁসিয়ার! সে লাফিয়ে লাফিয়ে পা ফেলে। সত্যি। ইলেক্‌ট্রণের নাচের কথা মনে আছে ত?

মাটি, পাথর, এমন কি, একটা ধূলোর উপাসনা জড়ের উপাসনা নয়। জড়ই নেই, ছোটই আদপে নেই—তার আবার উপাসনা! মাথা নেই তার মাথা ব্যথা! তবে, হ্যাঁ, আমাদের কারবারি জড়ের বাতিক, ভূতের বাতিক, ছোটর বাতিক কাটিয়ে, কাটানর বন্দোবস্ত ক'রে, তবে উপাসনায় বস্‌তে হবে। সেই জন্যই নানান্ খানা তোড়-জোড়! ভূতশুদ্ধি, প্রাণপ্রতিষ্ঠা আরও কত কি। তাই না সম্প্রতি এক লেখায় বলিছি—মায়ের পানে পেছন ফিরে ভারি খেলায় মেতেছে। একটিবার খেলা ফেলে মায়ের পানে ফের দিকিন—সত্যি সত্যি মায়ের সাম্‌না-সাম্‌নি হ'লে দেখ্‌বে—মাটির মা আমার "মাটির তনয়া—ও মাটি—মা-টি! তখন নতুন খেলা খেল, খুলি হয়ত'। নয়ত' মায়ের কোলে উঠে "ঠাণ্ডা" হও।

ধরার দান

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

চাইনে আমি স্বর্গ ভগবান
যেথায় শুধু দেবতা করে বাস,
আলোর মাঝে চাইনে আমি স্থান,
আঁধার মাঝেই রইব বারমাস।
দেবতা থাকুন দেবত্ব তাঁর লয়ে
আমার বোঝা বেড়াই আমি বয়ে
মাটির ধরা আঁকড়ে আমায় ধরে
ওরই বুকে থাকতে আমি চাই,
ধরার প্রেমে বুকটা থাকুক ভরে,
ধরার মত কারেও দেখি নাই।

স্বর্গ থাকুক অনেক দূরে মম
জানি সেথায় আমার কেহ নাই,
ধরায় আছে আমার প্রিয়তম—
যাদের আমি বুকের মাঝে পাই।

কাঁদলে আমি ওরাই ছুটে আসে,
হাসলে আমি ওরাই সাথে হাসে,
আমার ব্যথা মুছিয়ে ওরাই দেয়
ওদের হাতে—আমায় বুকে টেনে,
আমায় ওরা ওদের করেই নেয়,
আমায় ওরা নিজের বলেই জেনে।

বদ্ধ কারাগার এ হউক—তবু,
থাকতে হে চাই এরই বুকের মাঝে,
আমায় হেথায় থাকতে দিয়ো প্রভু
জড়িয়ে থাকি এখানকারই কাজে।
আলো আমি চাইনে মালিক পেতে,
থাকব জেগে নিকষ আঁধার রেতে,
নরকই হোক—তাও এ আমার জানি
বন্ধু আমার হোক না সে সয়তান,
স্বর্গে পূজা পৌঁছাবে না মানি
বলব তবু শ্রেষ্ঠ ধরার দান।

উপন্যাস

অভিজ্ঞতার মূল্য

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এল

উনিশ

মৌজা বহুয়া ও রোসনার মধ্য দিয়া নদীটি পশ্চিমদিক হইতে সোজা টানা পথ ধরিয়া আসিতে সেইখানে সহসা বাঁক লইয়া একেবারে দক্ষিণ দিকে ফিরিয়া গিয়াছে।

চৈত্রের শেষে ক্ষীণতোয়া এই স্বচ্ছ-সলিলার বাঁকের ধারে সন্ধ্যামুখে বেলা বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। এখান হইতে প্রায় এক রশি দূরে তাহাদের বাড়ী এবং এই সমস্ত চরটা তাহার পিতার জমিদারীভুক্ত! কিছুদিন হইতে প্রত্যহ এই সময় নিরালায় এইখানে ঘুরিয়া বেড়ান তাহার অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল।

একটা বড় পাথরের উপর বসিয়া পড়িয়া, বেলা নদীর দিকে চাহিয়া বায়ুভরে ছোটখাট তরঙ্গগুলির খেলা দেখিতে দেখিতে অতীত স্মৃতির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল। পর্দ্দা আন্দোলনের কার্য্যে ব্রতী হইয়া যে দিন সে পিতার নিকট হইতে অতিকষ্টে অনুমতি পাইয়া উৎফুল্লচিত্তে যাত্রা করিয়াছিল সে দিন সে একবারও মনে করিতে পারে নাই যে এত সত্বর তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে এবং দারুণ গ্লানি ও মর্ম্মদাহ বহন করিয়া! মিসেস্ লালের সেই অহেতুক মন্তব্য ও তাহার চেয়েও কঠিন বাক্য আজও তাহার কানের মধ্যে যেন ধ্বনিত হইয়া তাহাকে উত্তেজিত করিয়া ফেলে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও তৃপ্তির সহিত অনুভূত হয় যে,সে দিনের সেই সংঘর্ষের আলোই চোখ ফুটাইয়া তাহার জীবনের গতিকে নিমেষে ভুল পথ হইতে এই নদীর বাঁকের মতই যেন ফিরাইয়া দিয়াছে!

একটা কোনও অবলম্বন চাই, যাহাকে আশ্রয় করিয়া মানুষ নিরবচ্ছিন্ন নির্ভরতার সহিত জীবনতরী বাহিয়া যাইতে পারে। আশ্রম তাহাকে প্রথম হইতেই আনন্দ দিত সন্দেহ নাই এবং বাহিরের লোকের সংস্পর্শ ক্রমেই অকারণ লজ্জার জড়তা অপসারিত করিয়া অবাধ লঘু স্বচ্ছন্দতার আস্বাদ দান করিতেছিল। কিন্তু তখনও সে জানিতে পারে নাই, ইহার চেয়ে কত গভীর উপভোগ্য আনন্দ নারী-জীবনে প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে। সেই আনন্দের অনুভূতি সঞ্চারিত করিয়াছে তাহার বিকচোন্মুখ নারীহৃদয়ের শিরা উপশিরায় …কে?…কাহার অস্ফুট আহ্বানের অব্যক্ত আকর্ষণী শক্তি লীলাবতীর অন্যায় রোষকে হেলায় দলিত করিয়া তাহাকে অবলীলাক্রমে ঈপ্সিতের সহিত মিলিনের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে?

তাই বুঝি এতদিনে তাহার সন্ধানের আভাষ মিলিয়াছে, নারীর শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য, পরম সার্থকতা, নিহিত আছে—কোথায়!

নৌকার দাঁড়টা সন্তর্পণে এক পাশে তুলিয়া রাখিয়া জয়করণ নিঃশব্দে তীরে লাফাইয়া পড়িল। তাহার পর মৃদু পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া কিছুদূর আসিতেই বেলার সহিত তাহার দৃষ্টি বিনিময় হইয়া গেল। দিগন্তে অস্তিম সূর্য্যের রক্তাভার মতই নিমেষে বেলার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল।

দুই হাতে তাহার লজ্জানত মুখটি তুলিয়া ধরিয়া জয়করণ বলিল—এখানে ব'সে কি ভাবছ বেলা?

বেলা কিছুই বলিল না। বলিবার চেষ্টাও তাহার দেখা গেল না। তেমনি ভাবেই মাথা নামাইয়া মাটির দিকে তাকাইয়া যেন কিসের আবেগ দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

তাহা লক্ষ্য করিয়া জয়করণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া এক হাত তাহার কাঁধের উপর রাখিয়া বলিল—আমার ওপর রাগ হয়েছে নাকি?

এইবার বেলা সোজা হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া

বলিল—হাঁ রাগ ত করেছিই—কারণ থাকলেই রাগ হয়! তাড়াতাড়ি পাশেই বসিয়া পড়িয়া জয়করণ বলিতে লাগিল—এতদিন কেন যে আসতে পারিনি, কত কষ্টে—কি করে যে আজ পালিয়ে এসেছি তা যদি তুমি শুন্‌তে—

বেলা একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল—আমি শুনতে কিছুই চাই না। অন্ধকার হয়ে আসছে, অনেক দেরী হয়ে গেছে, এবার আমি বাড়ী যাব।

জয়করণ তাহার ছুটি হাত ধরিয়া ফেলিয়া মিনতির স্বরে বলিল—আর একটু ব'স বেলা, অনেক কথা আছে। আমার নৌকায় বাতি আছে, আমি তোমায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসব।

সজোরে মাথা নাড়িয়া বেলা বলিয়া উঠিল—না, না, আর আমি এখানে থাকতে পারবো না। আর কেনই বা থাক্‌বো? বেলাকে এক রকম জোর করিয়া বসাইয়া জয়করণ কাতর কণ্ঠে বলিল—আর দশটি দিন মাত্র সবুর ক'রো বেলা। তারপর আর আমাদের মধ্যে কোন ব্যবধান থাক্‌বে না, কোন সঙ্কোচের গ্লানি আমাদের অন্তরায় হতে পারবে না—এক সঙ্গে দেখলে কেউ কিছু বলতে সুযোগ পাবে না। তখন আমরা তুজনে মিলে, মনের আনন্দে প্রাণভরে—

বেলা বলিয়া উঠিল—তোমার বাবা রাজি হলে ত!

জয়করণ তখন বেলার আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া নিম্নস্বরে বলিতে লাগিল—রাজি তাঁকে হতেই হবে! না হয়ে আর অন্য উপায় নেই, এমন মজার চাল চেলেছি এক!

উৎসুককণ্ঠে বেলা বলিল—কি বল ত?

অশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ে নিজের কাহিনীকে অলঙ্কারভূষিত করিয়া জয়করণ যতই বিবৃত করিতে লাগিল, প্রশংসার দীপ্তিতে বেলার চক্ষু ক্রমশঃ ততই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। সুতরাং চতুর্দ্দিকে অন্ধকার যে ক্রমেই গাঢ়তর হইয়া আসিতেছিল বেলার আর সেদিকে খেয়ালই ছিল না। অজানিত পুলকে বিভোর হইয়া তাহার সমস্ত দেহ-মন এক অপরূপ উন্মাদনায় কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপে কতক্ষণ যে কি ভাবে কাটিয়াছিল বেলা তাহা জানিতে পারে নাই। এমন সময় অদূরে পরিচিত কণ্ঠস্বরের আহ্বানে তাহার চমক ভাঙ্গিল—বেলা!

অপ্রতিভ হইয়া বেলা শিলাখণ্ডের উপর হইতে নামিয়া পড়িল—এ যে ললিতা! কখন এল?

জয়করণ ক্ষিপ্র হস্তে তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—চল আমরা নৌকায় পালিয়ে যাই, তাহলে আর—

তীব্র টর্চ্চের আলো তাহাদের উপর পড়িতেই জয়করণ বসিয়া পড়িয়া চকিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ক্ষণ পরেই ললিতা কাছে আসিয়া বলিল—এখানে, একলা, এই আঁধারে, কি কচ্ছিস ভাই?

তাহার মুখে বিদ্রূপের হাসি, চোখে কৌতুকের দৃষ্টি!

নদীর দিক হইতে ঝপাঝপ্ শব্দ আসিতে লাগিল।

ললিতা বিস্মিতভাবে বলিল—নৌকা নাকি ভাই?

বেলা এতক্ষণ নিস্পন্দের মত দাঁড়াইয়া ছিল। এইবার সহসা ফিরিয়া স্বচ্ছন্দেই বলিল—হাঁ, তা আর বুঝতে পার্‌লি না? জয়করণ বাবু! তোকে দেখেই পালিয়ে গেলেন।

ললিতা তখন গলা ছাড়িয়া খুব খানিকটা হাসিয়া বলিল—ডাক্‌ব নাকি? তাহার পিঠে গুম্ গুম্ করিয়া গোটা কতক কিল বসাইয়া দিয়া বেলা বলিল—তুই এলি কখন পোড়ারমুখী!

কুড়ি

ললিতার শ্বশুরালয় রহুয়ায় ও জয়করণের টোলাতেই। প্রায় এক বছর পরে আজ সে বাপের বাড়ী আসিয়াছে। সন্ধ্যার সময় প্রিয় সখী বেলার সহিত দেখা করিতে আসিয়া শুনিল, সে নদীর ধারে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, এখনও ফিরে নাই। সে আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল।

দীর্ঘকালের পর তুই বন্ধুতে সাক্ষাতের ফলে কিল খাইয়া তাহা হাসিমুখে সহ্য করিয়া ললিতা বলিল—তোর কি পরিবর্ত্তনই না হয়েছে ভাই, এই অল্প সময়ের মধ্যে!

বেলা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া, পিঠে হাত বুলাইয়া আদর করিয়া বলিল—কিসে?

সেই শিলার উপর বসিয়া পড়িয়া ললিতা বলিতে লাগিল—এই নির্জ্জন অন্ধকারে, নদীর ধারে, তুই কখনও এ সময় একলা থাক্‌তে পারতিস্?

ললিতার গালে একটি মৃদু চাপড় দিয়া বেলা বলিল—এখনও একলা নই, এর আগেও ছিলাম না।

তবুও তোর খুব সাহস বেড়েছে—বলিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া ললিতা চাপাস্বরে কহিল—

জয়করণবাবুর সঙ্গে এত ভাব তোর কি রকম করে হোল রে?

পূর্ব্বাকাশে তখন কৃষ্ণা তৃতীয়ার চাঁদ হাসিয়া উঁকি মারিতেছেন দেখিয়া অন্ধকার গোপনে অন্তর্হিত হইতেছে। কখনও সেই নির্ম্মল উজ্জ্বল শশীর পানে চাহিয়া, কখনও উচ্ছল খরস্রোতা নদীর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, বেলা সেই শিলাখণ্ডের উপর ললিতার দেহে ভর দিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় তাহার প্রেমের অরুণ উন্মেষ ও অভিনব বিকাশের কাহিনী আবেগ-ভরা স্বরে একে একে সমস্তই কহিতে লাগিল। প্রিয়তমা সখীর নিকট এতদিনে মনের গোপন কথাগুলি নিঃশেষে উজাড় করিয়া দিয়া অব্যক্ত পরম তৃপ্তিতে অবশেষে বেলা তাহার দেহ এলাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে চোখ বুঝিল।

ললিতা নিবিষ্টচিত্তে প্রতি কথা প্রতি ভাব লক্ষ্য করিতেছিল। এইবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—ঈস্। তুই যে একেবারে ভাবের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিস দেখছি। এরই মধ্যে এত শিখ্‌লি কোথা থেকে?

বেলা রাগ করিল না। তাহার আয়ত চক্ষু ঈষৎ চাহিল, ঠোঁটের কোনে মিষ্ট হাসির একটি রেখা ফুটিল। তারপর ধীর স্বরে বলিল—সত্য ভাই, আমিই বলতে পারি নে, কেমন ভাবে কি করে আমি এত ভালবাস্‌তে জানলাম; কি মনে হয় জানিস? আমার মত প্রেমের এত গভীরতা বোধ হয় কেউ কখনও অনুভব করে নি।

বেলার তুই গণ্ডে অঙ্গুলীর মৃদু চাপ দিয়া ললিতা বলিয়া উঠিল—তুই চুপ কর তো! তোর বাড়াবাড়ি দেখে আর বাঁচি নে। আমরা যেন আর প্রেমের স্বাদ পাই নি! আসল ভালবাসা পাওয়া যে কি, তার সন্ধান পাওয়াও যে কত তুর্লভ, সে যে পেয়েছে সেই কেবল জানে।

ললিতার মুখ কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বেলা সন্দিগ্ধ হইয়া কহিল—তোর এমন কথা বল্‌বার মানে?

ললিতা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—মানে মতলব আর কি—জান্‌তে পারবি দিন কতক পরেই।

একটা সন্দেহের ছায়া যেন ঘনাইয়া আসিতেছিল, তাহাকে এক মূহূর্ত্তও সহ্য করা বেলার পক্ষে যে কি কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কথাতেই তাহা প্রকাশ পাইল।

তোর পায়ে পড়ি ভাই, বলনা শীগ্‌গির কি হয়েছে?

ললিতা একবার দ্বিধা করিয়াই বলিয়া ফেলিল—তোর কি মনে হয় জয়করণ বাবু সত্যই তোকে খুব ভালবাসেন?

বেলা উঠিয়া বসিতেই এক ঝলক জোছনা তাহার দীপ্ত মুখের উপর পড়িয়া তমসামুক্ত অনাবিল প্রেমের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া দিল।

নিরুদ্বেগ স্বচ্ছন্দ স্বরে সে বলিল—এই-ই? আমার কি ভয়ই না হয়েছিল! তা ভাই তুই নিজের চোখে না দেখলে ত বুঝতে পারবি নে। তুই যদি চুপি চুপি আস্‌তিস্—আলো না ফেলে, একটু দূরে দাঁড়িয়ে সবই শুনতে পারতিস—

ললিতা কিন্তু মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল—না শুনেছি, সে জন্য তুঃখ নেই। তোমায় কিন্তু ভাই একটু সাবধান না করে থাক্‌তে পারছি না, কিছু মনে কোরো না। পুরুষ মানুষদের কথায় অত সহজে বিশ্বাস করতে নেই, তাতে হয়ত বিপদে পড়তে হয়।

বেলা উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিল—উনি সে প্রকৃতির মানুষ নন্। তুই যদি একটিবার দেখ্‌তিস ওঁর সরলতা—আন্তরিকতা, তা হলে ওসব কথা তোর মনেই আস্‌তো না।

ললিতা মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল—পুরুষদের আকৃতি বা প্রকৃতির কথা কিছু না বলাই তুর্ব্বলা আমাদের পক্ষে হয় ত ভাল, হয় ত অনধিকার চর্চ্চা। আমাদের একবার বাইরে বেরোলেই দোষ, তুটো দূর আত্মীয় পুরুষের সঙ্গে হেসে কথা কইলেই অপরাধ। অথচ ওঁরা যদি—থাক্ সে সব কথা। কেন না ওঁদের বেলায় লীলা খেলা, আর পাপ লিখেছেন মোদের বেলা। কিছু দেখলেও প্রাণের ভয়ে চোখ বুজে থাক্‌তে হয়। কৌতূহলী হইয়া বেলা বলিল—কেন, কিছু দেখেছিস্ নাকি?

ললিতা সে কথার উত্তর না দিয়া বেলার চিবুক স্পর্শ করিয়া একটু নাড়া দিয়া বলিল—কিন্তু তুই ভাই সত্যই ভালবেসেছিস্, গুণ আছে তোর প্রেমের—কি সুন্দর রূপ হয়েছে তোর এই কয় মাসে!

ললিতার হাত ধরিয়া বেলা বলিল—যাঃ বাজে কথা। তুই বুঝি কথা এড়িয়ে যাবি? এখন, কি দেখেছিস—বল্।

ললিতা একটু ভাবিয়া বলিল—দেখি নি ত কিছুই।

বেলা তাহাকে একটা ধাক্কা দিয়া বলিল—তবে রে মিথ্যেবাদী!

ললিতা বলিয়া ফেলিল—না দেশলেও—কানে কিছু কিছু কথা আসে বটে।

তবে বল্, কি শুনেছিস্।

ললিতা বলিতে লাগিল—জয়করণবাবু তাঁর বন্ধুবান্ধবদের কাছে যে সব কথা বলেন, ইনিও তাঁদের কাছে সব শুনতে পান কিনা, তাই অনেক কথাই আমার শোনা হয়ে যায়। কেমন করে তোমাদের কত ভাব হোল, তারপর ছল করে লীলাবতীর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে আগে থাক্‌তে সব ব্যবস্থা করে, নিশীথ রাতের ট্রেনে কি ভাবে তোমায় নিয়ে এসেছিলেন—নিজের কামরাতে সযত্নে তোমার বিছানা করে দিয়েছিলেন—আর কেউ না কি ছিল না—আরও কত কি!

উত্তরোত্তর লজ্জিত হইয়া বেলা বলিল—ঐ ত ওঁর দোষ। এত সরল আর খোলা প্রাণ, কোনও কথা চাপতে বা লুকোতে জানেন না। অথচ এত ভালমানুষ যে, সে সব কথা বলে ফেলার পরিণাম কি হবে, তাও চিন্তা করে দেখেন না।

ললিতা আর থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল—কিন্তু পুরুষের অত অপরিণামদর্শী হওয়া যে আমাদের পক্ষে অনর্থের সূত্রপাত করে, সেটাও দয়া করে একবার ভেবে দেখা উচিত।

বেলা প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—এতে আর কি এমন অনর্থ হতে পারে ভাই?

এবার কতকটা বিদ্রূপের স্বরে ললিতা বলিল—না, এমন আর কি বল। তবে কাল আমি এতদূর পর্য্যন্ত শুনে এসেছি যে এমন অবস্থা তোমার নাকি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তোমার বাবাকে এখন বাধ্য হয়ে বিয়ে দিয়ে ফেলতে হবে—এবং সেই চার হাজার তিলক দিয়ে।

বেলা দৃপ্তস্বরে উত্তর করিল—হতেই পারে না—মিছে কথা। এই খানিক আগে আমায় বলে গেলেন যে এমন চাল এক চেলেছেন যে তাঁর বাবাকে রাজি হতেই হবে—বিয়ে দিতে, টাকা যা হয় দিলেই হবে।

আজ সকালের কি খবর জান? যা শুনে, কেবল তোমাকে বলবার জন্যই আজ আমি এখানে ছুটে এসেছি—বলিয়া ললিতা উঠিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই আবার বলিল—না, এখানে সে কথা বলব না। আগে বাড়ী চল।

বেলাও উঠিয়া পড়িয়া ললিতার হাত চাপিয়া ধরিল—না, না, তোকে এখনই বল্‌তে হবে—মেরি কসম্।

ললিতা তখন কহিল—তবে আমায় বল্‌তেই হল, যেন দুঃখ পাস্‌নে ভাই। ধামনের জমিদার বাবু তেজনারায়ণ তেওয়ারীর একমাত্র মেয়ের সঙ্গে জয়করণ বাবুর সম্বন্ধ কথাবার্ত্তা কিছুদিন ধরে চল্‌ছে। তিলক দেবেন নগদ পাঁচ হাজার, তাছাড়া বরাভরণ ইত্যাদিতে সবশুদ্ধ নাকি আরও চার পাঁচ হাজার খরচ কর্ব্বেন। তাঁরা আজ সকালে রহুয়ায় এসে পাকা কথা কয়ে সগুণ দিয়ে গেছেন। তখন জয়করণ বাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই সংবাদ পেয়েই—ওকি তুই অমন হয়ে পড়লি কেন?

নিমেষের মধ্যে বেলার মুখ ছাইএর মত পাংশুবর্ণ হইয়া গেল এবং মুষ্টিবদ্ধ হাতে সে ধীরে ধীরে শিলার উপর বসিয়া ক্রমে শুইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি বেলার মাথা কোলের উপর তুলিয়া লইয়া ললিতা বলিল—এই জন্যই ত এতক্ষণ বল্‌তে চাই নি। চোখ চাও বহিন্।

অনেক ডাকাডাকির পর বেলা চক্ষু চাহিল বটে, কিন্তু তাহার মনে হইতেছিল যেন কোথাও আলোর চিহ্নমাত্র নাই। জলে স্থলে জমাট গাঢ় অন্ধকার ভরিয়া রহিয়াছে।

একুশ

প্রায় একমাস পরে একদিন সকালে ডাক্তার লাহিড়ীর বাসায় গিয়া রামজনম ও মুরলীমনোহর ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বসিতে বলিয়া ভৃত্য জানাইল যে ডাক্তারসাহেব কলে বাহির হইয়াছেন, ফিরিতে বোধ হয় বিলম্ব নাই।

মুরলী বলিল—তখনই বলেছিলাম এখন দেখা পাওয়া যাবে না। পরে আসা যাবে, এখন চলুন—ভাল করে মুসাবিদা করে ফেলা যাক্।

রামজনম চিন্তিতভাবে বলিলেন—তা'র আগে এটাও দেখা দরকার যে—

—কি দেখবেন মোক্তার সাহেব? এই যে মনোহরও আছেন।—বলিয়া ডাক্তার প্রবেশ করিলেন।

মুরলী আরম্ভ করিল—আপনার সঙ্গে—

ডাক্তার কহিলেন—বসুন, বসুন—বড় বিমর্ষ দেখছি যে মোক্তার সাহেব।

মুরলী বলিতে লাগিল—তাই ত পরামর্শের জন্য আমরা এখানে এসেছি। আমার প্রথম প্রশ্ন হবে, কিশোরীলালকে আপনি শেষ কবে দেখ্‌তে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, শারীরিক বা স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তাকে আপনি কোথাও বায়ু পরিবর্ত্তনে যাবার উপদেশ দিয়েছেন কি না এবং যদি দিয়ে থাকেন ত সে কোথায়?

তাহার চেয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া ডাক্তার উত্তর দিলেন—তার আগে আমার এই প্রশ্ন হচ্ছে যে, পুলিশের সি আই ডিতে তুমি নাম দিয়েছ কিনা এবং তাহা যদি হয়—ত সে কোন তারিখে।

রামজনম বলিয়া উঠিলেন—আমার বিপদের কথা বোধ হয় আপনার মালুম নেই? চিড়িয়া উড়েছে!

ডাক্তার চেয়ারে বসিয়া বলিলেন—না, কোন্ চিড়িয়া ভাই, ময়না—না তোতা?

মুরলী বলিতে লাগিল—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্যাম্প রয়েছে আজ পাঁচদিন, চাম্‌থায়। মোক্তার সাহেব ও আমি সেখানে একটা কেসে ছিলাম চারদিন। আজ ভোরের ট্রেণে ফিরে এসে দেখা গেল মিসেস্ লাল অদৃশ্য হয়েছেন! অনুসন্ধানে জানা গেল তিনি কিশোরীর সঙ্গে কার্সিয়ং গেছেন! এই রকম একটা ঘটনার আশঙ্কা আমাদের অনেক দিন থেকেই ছিল। স্বামীর বিনানুমতিতে একজন পরপুরুষের সঙ্গে—যা'র সহিত পূর্ব্বঘনিষ্ঠতার অনেক প্রমাণ আছে—গোপনে পলায়ন—এ এক রকম অসহ্য!

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বলিলেন—তাই ত! বিশেষতঃ পুরুষ যখন স্বাস্থ্যলাভ করতে চলেছেন। এখন মোক্তার সাহেব কি করতে চান?

রামজনম বলিলেন—দেওয়ানী করে কে একবছর বসে থাক্‌বে। আমি আজই ফৌজদারী করে এর একটা হেস্তনেস্ত করতে চাই। ওয়ারেণ্ট বার করা আমার পক্ষে কিছুই শক্ত নয়।

ডাক্তার বলিলেন—সেই সঙ্গে ষ্ট্রেচারের ব্যবস্থাও করবেন। তা আমাকে কি সাক্ষী মানতে চান না কি?

মুরলী বলিয়া উঠিল—অন্ততঃ এখন জানতে চাই যে আপনার পরামর্শেই কিশোরী কার্সিয়ং গিয়েছে কি না।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন—আর যদি মিসেস্ লালের পরামর্শেই গিয়ে থাকে?

মুরলী বলিল—তা আমাদের কেস্ হবে না। বুঝতে পার্চ্ছেন না, বিবাহিতা স্ত্রী—abduction—আইন মানিয়ে ত চলতে হবে! কিশোরীই যে মিসেস লালকে অনেক দিন থেকে প্রলোভন দেখিয়ে, শেষে ভুলিয়ে নিয়ে গেছেন—

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন—কি উদ্দেশ্যে?

মুরলী বলিল—সে সব আমরা ঠিক করে নেব। কিশোরীর বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থা কেমন এবং আপনি তাকে কার্সিয়ংএ বায়ু পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিয়েছেন কিনা—উপস্থিত এই দুটি কথা জানা আমাদের দরকার।

ডাক্তার বলিলেন—প্রথমে আমার জানা দরকার যে লীলা যদি কিশোরীর সঙ্গে কার্সিয়ং গিয়ে থাকেন, তাতে মোক্তার সাহেবের ভয় পাবার কি আছে?

মুরলী বলিল—ভয়ের কারণ নেই? কি যে বলেন!

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—আমার মনে হয়, ভয়ের ভিত্তি ওঁর নিজেরই দুর্ব্বলতায়—হতে পারে স্নায়বিক। কারণ, সাহেবের ক্যাম্পে বড় মকর্দ্দমায় হয়ত কয়দিন অত্যধিক পরিশ্রম হয়ে থাকতে পারে, তা না হলে এ রকম ঘটনাকে বিপদের মধ্যে গণ্যই করা যেতে পারে না।···কি বলেন মোক্তার সাহেব? মনে পড়ে সেই দিনের কথা, যে দিন কিশোরী ও আপনার সঙ্গে এই পর্দ্দা নিয়ে আমার প্রথম আলোচনা হয়েছিল?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মোক্তার বলিলেন—মনে পড়ে বই কি। এ রকম বিপদে পড়তে হবে তখন কি জানতাম! আর প্রকৃতপক্ষে আমি কোনও কালে পর্দ্দার বিরুদ্ধে যেতে চাই নি—

ডাক্তার বলিলেন—কারণ মনের সে প্রসার গতি এখনও আপনার হয় নি।

রামজনম বলিয়া ফেলিলেন—নাই হোক। কিন্তু লীলাকে শাস্তি দেওয়া একবার দরকার হয়েছে। আপনার কাছে সে জন্য আমি করজোড়ে সাহায্য প্রার্থনা কচ্ছি।

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে হাতজোড় করিয়া বলিলেন—আমিও করজোড়ে আপনাকে অনুনয় করছি, এ বিষয়ে সাহায্য করতে আমায় অনুরোধ কর্ব্বেন না।

মুরলী জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বলিলেন—তোমরা ছেলেছোকরা মানুষ, এসব কথা ঠিক বুঝতে পারবে না।

তারপর রামজনমের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—শুনছেন মোক্তার সাহেব। লীলার সঙ্গে যদিও কয়েক বিষয়ে আমার মতের মিল না থাক্‌তে পারে, কিন্তু লীলার মত গুণবতী মেয়ে আমি কমই দেখেছি—বোধ হয় ঠিক অমনটি আর দেখি নি! কিছুদিন সংস্পর্শে এসে বুঝতে পেরেছি যে তার সহৃদয়তা, আন্তরিকতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার তুলনা পাওয়া শক্ত। আপনি যে তার উদারতাকে এখনও সন্দেহ করেন এতে আমি কেবল আশ্চর্য্য নয়, মর্ম্মাহত হয়েছি। তার কার্য্যে বা চরিত্রে সন্দিহান হওয়া আমি পাপ মনে করি। সুতরাং মাপ কর্ব্বেন, তাকে অপমান কর্ব্বার কোন চক্রান্তে আমার কাছে লেশমাত্র সাহায্য পাবেন না।

মুরলী উঠিয়া দাঁড়াইল—তা হলে চলুন। রামজনম ইতস্ততঃ করিতেছেন, দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন—একটি কথা জান্‌তে পারি কি? লীলাকে কি আপনি ত্যাগ কর্ব্বেন?

রামজনম বিস্মিত হইলেন—তার কি মানে আছে!

ডাক্তার কহিলেন—মানে আছে বই কি। এই সব মামলা হাঙ্গামার পর, আমার মনে হয়, লীলার মত আত্মসম্মানী মেয়ে—তার পিতার অবস্থাও মন্দ নয়—হয় ত আর আপনার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাইবে না।

মুরলী কিছু বলিতে উদ্যত হইলে ডাক্তার সঙ্কেতে তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—এইটেই হচ্ছে কিছু করতে যাওয়ার আগে—আপনার প্রধান বিবেচনার বিষয়। ভেবে দেখবেন মোক্তার সাহেব—মকর্দ্দমার ফলাফলের উপর এটা মোটেই নির্ভর কর্‌ছে না। একবার যদি প্রকাশ্য আদালতে এই সব কথা বার করেন, তারপর হয়ত অভিমানিনী লীলাকে ফিরে পাওয়া আপনার অসম্ভব হবে। আর আপনার কেসের কি গতি হবে তাও অনুমান করা শক্ত নয়। পর্দ্দার বিরুদ্ধাচারী আপনি ও আপনার স্ত্রী এবং কিশোরীলালও,—তার বহুল প্রমাণ আছে। সেই সূত্রে পরস্পরের ঘনিষ্ঠতা হতে দেবার সহায়তা আপনি যথেষ্ট করেছেন। সুতরাং রুগ্ন দুর্ব্বল কিশোরীকে দোষী প্রমাণ করা আপনার পক্ষে কতদূর সম্ভব, আইনজ্ঞ আপনারা বিচার করে দেখবেন। আমার বিবেচনায় লীলাকে অযথা সাজা দিতে গিয়ে, তার দশগুণ শাস্তি আপনি নিজেই পাবেন।

মুরলী বলিল—অনেক দেরী হয়ে গেল—আমার অন্য কায আছে—এখন উঠুন।

রামজনম অব্যবস্থিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় ফাগুনি ছুটিয়া আসিয়া হাঁফাইয়া বলিল—মাইজি আ গেয়ে, আপ্‌কো বোলাতে হেঁ।

ডাক্তার আনন্দে প্রায় লাফাইয়া উঠিলেন—কেস্ আপনাদের ফেঁসে গেল না কি? যারে ফাগুনি, আমার গাড়ী নিয়ে জলদি তাঁকে এখানে নিয়ে আয়। না, না, দাঁড়া, আমি নিজেই গিয়ে দিদিকে আন্‌ছি। চলুন না মোক্তার সাহেব, বাড়ীতে যেতেই হবে—আমার গাড়ীতেই চলুন—বিলম্বেন অলম্।

তারপর মুরলীর হাত ধরিয়া ডাক্তার বলিলেন—তুমিও এস, কিন্তু খুব সাবধান—এ সব কথা যেন ঘুণাক্ষরে প্রকাশ না পায়।

গাড়ীতে উঠিবার সময় লাহিড়ী একবিন্দু আনন্দাশ্রু অলক্ষ্যে মুছিয়া ফেলিলেন!

বাইশ

কার্সিয়ংএ লীলাবতীর পিতার বাড়ী দুইখানি ছিল; একটিতে নিজে থাকিতেন, অপরটি ভাড়া দেওয়া হইত। ডাক্তার লাহিড়ীর পরামর্শে ও লীলাবতীর সাহায্যে সেই বাড়ীটি ঠিক করিয়া কিশোরীর পিতা সপরিবারে কয়েক মাস কার্সিয়ংএ থাকা স্থির করিয়াছিলেন।

অপরিচিত স্থানে দুর্ব্বল স্বামীকে লইয়া গিয়া কোনও অসুবিধা বা বিপদে না পড়িতে হয়, এইজন্য সাবিত্রী পত্রযোগে লীলাবতীকে সঙ্গে যাইবার জন্য কাতর অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। অনেককাল পরে পিতার সহিত সাক্ষাতের প্রলোভনবশে লীলা মনে মনে সম্মত ও কতকটা প্রস্তুত হইয়া ষ্টেশনে যান এবং সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুনয়ের ফলে তাহাদের সহিত যাওয়া সংঘটন হয়। অবশ্য তাহার পূর্ব্বদিন রামজনম সফরে যাওয়ার জন্য এ সকল বিষয় জানিতে পারেন না। সেই কারণে স্বামীর বিরক্তির ভয়ে লীলা সকলপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া যত সত্বর সম্ভব ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তথাপি ইতিমধ্যে যে কিছু একটা গোলযোগ হইয়াছে তাহা ফাগুনি পরিষ্কার করিয়া না বলিতে পারিলেও লীলার বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই।

তাহার পর রামজনমের সঙ্গে ডাক্তার লাহিড়ী আসিয়া যে কয়েকটি প্রশ্নে ব্যাপারটা পরিষ্কার করিয়া দিয়া বিবাদের পথ বন্ধ করিয়া গিয়াছিলেন তাহাও লীলা আন্দাজ করিয়াছিলেন। ইহার পর রামজনম কিছুই বলেন নাই এবং লীলারও সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে স্পৃহা হয় নাই। কালের গতি সে ক্ষতের উপর প্রলেপ দিয়া যাইতেছিল বটে, কিন্তু তাহাকে একেবারে নিরাময় করিতে পারে নাই।

সেদিন বৈকালের দিকে লীলাবতী ভিতরের দালানে বসিয়া নিজ মনে চরকায় সুতা কাটিতেছিলেন, এমন সময় তাহার পশ্চাতে আসিয়া বেলা ডাকিল—লীলাদি!

হাতের কায বন্ধ করিয়া লীলা কিছুক্ষণ আশ্চর্য্য হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। বেলা তাঁহার কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল—লীলাদি, আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করেছেন কি?

কিসের অপরাধ, বেলা?

আমি রাগের মাথায় কি সব আপনাকে বলে চলে গিয়াছিলাম—

—ওঃ, এই-ই? কিন্তু তার আগে আমিও তোমায় শক্ত কথা কম বলি নি! তখন যদি জানতাম জয়করণ বাবুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে—

—না হবে না—

—কেন এই যে শুনি তোমাদের এত ভালবাসা—

—না, ভুল শুনেছেন। ভালবাসতে বোধ হয় তিনি জানেন না। আপনি ঠিকই বলেছিলেন—আমারই অন্যায় হয়েছিল, অজ্ঞাত পুরুষের সঙ্গে সামান্য পরিচয়ে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে যাওয়া এবং সেই সুযোগ পেয়ে ছলনা করে তিনি যে আমার কি সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, সে কথা পরে একদিন বলবো। কিন্তু ভগবানের দয়ায় সে চাতুরী ধরা পড়ে যায় এবং তার পরও আমার সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করায় আমি ঘৃণাভরে তার লাঞ্ছনার বাকি রাখি নি। যাক্ সে সব কথা। এখনও আপনি আমায় ক্ষমা করেছেন কিনা বলুন।

লীলা সস্নেহে বেলার হাত ধরিয়া বলিলেন—আমি তোমায় সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেছি বোন। পরে বুঝেছিলাম, দোষ তোমার ছিল না। তাই তোমায় যে কটু বলেছিলাম সেই গ্লানিই এখনও আমায় কষ্ট দেয়।

বেলা সস্মিত মুখে বলিল—না দিদি, আপনি আর কিছু মনে রাখ্‌বেন না।

রামজনম সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—বেলা, তোমার ভাই যে তাড়া লাগিয়েছেন, ট্যাক্সি আর দাঁড়াতে চায় না।

লীলা উত্তর করিলেন—না চায়, যেতে পারে। আমি অন্য গাড়ী বেলাকে আনিয়ে দেব। এত শীঘ্র ওর যাওয়া হবে না, বলে দাও।

রামজনম একটা খাম লীলার হাতে দিয়া বলিলেন—তোমার চিঠি। এটা সকালেই কাছারিতে পেয়েছি—দিতে ভুলেছিলাম।

লীলা চিঠি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন।

বেলা চরকা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া বলিল—একবার দাদামশায়ের কাছে যেতে হবে।

লীলা বলিয়া উঠিলেন—আচ্ছা লোক ত তুমি! এতবড় একটা সুখবর এতক্ষণ পকেটে চেপে রেখে দিয়েছিলে!

রামজনম জিজ্ঞাসিলেন—কি বল ত?

লীলা বলিলেন—এত সহজে তোমায় বল্‌ছি আর কি! তুমি এখন যাও, বেলার ভাইকে নিয়ে গল্প করগে। গাড়ী ছেড়ে দাও। এখানে চা খেয়ে আমরা দাদামশাইএর কাছে যাব। তাঁকে একটা খবর পাঠিয়ে দাও।

রামজনম ফিরিয়া যাইতেছিলেন, লীলা ডাকিয়া বলিলেন—ওগো, শুন্‌ছো? তোমাদের মত কথা চেপে রেখে আমরা হজম করতে পারি নে—শুনেই যাও। বেলার যে বিয়ে—এই শনিবারে।

মাথা নাড়িয়া রামজনম বিজ্ঞের মত কহিলেন—হাঁ, জয়করণের সঙ্গে ত!

লীলা হাসিয়া উত্তর করিলেন না, ছাপরার এক ডেপুটি, নতুন বোধ হয়। নামটি বড় চমৎকার, বল্ না ভাই বেলা। এখনই বলে নে, এর পরে আর উচ্চারণ করতে নেই, ইষ্টমন্ত্রেরও বাড়া! কি কড়া নিয়ম ভাই ওদের, আমাদের বেলা?

বেলা উত্তর দিবে কি; লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিতেছিল!

* * * *

লাহিড়ী তখন বাহিরের ঘরে নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া একটা মোটা কেতাব পড়িতেছিলেন।

পদশব্দে মুখ তুলিয়া চশমার ফাঁক দিয়া দেখিয়া বলিলেন—এস, এস, সব। আরে, এ যে বেলা! বিয়ের কনে এমন করে ঘুরে বেড়ায়!

সকলে আসন গ্রহণ করিলে লীলা বলিলেন—বেলা যে আপনাকে নেমতন্ন কর্ত্তে এসেছে!

ডাক্তার বিষণ্ণমুখে বলিলেন—তার মানে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। সকালে চিঠি পেয়ে অবধি মন একদম খারাপ হয়ে গেছে। বইটই পড়ে কোন রকমে মন ভোলাচ্ছি। নাঃ, বড় আশা হয়েছিল যে জয়করণ যখন বিতাড়িত হয়েছে, তখন এবার আমার ভাগ্যই বুঝি সুপ্রসন্ন!

বেলা মুখে কাপড় দিয়া হাসিতেছিল। লীলা বলিয়া উঠিলেন—এখনও চেষ্টা করে দেখুন না, হাতের কাছে ত পেয়েছেন!

ডাক্তার কহিলেন—ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্র পাবার পর? না ভাই, শেষে নারীহরণ মামলায় পড়ে যাব!···বলিয়া রামজনমের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন।

রামজনম কথাটা চাপা দিয়া বলিলেন—এদিকে যে জয়করণ বলে বেড়ায়, তার বিয়ের সব ঠিক।

ডাক্তার বলিলেন—তাই ছিল, ধামনে বটে। কিন্তু আজকের খবর সেখানেও ফস্‌কে গেছে।

লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন—তাই নাকি? আপনি কোথায় শুনলেন?

ডাক্তার বলিলেন—আজ সকালেই যে আমি ধামন গিয়েছিলাম। সে অনেক কথা—থাক্। এখন বেলার বিষয় শোনা যাক্—কি বল?

বেলা সুযোগ পাইয়া বলিতে লাগিল—দাদামশাই, আপনার কাছে এসেছি—যদি আপনার মনে কোন কষ্ট দিয়ে থাকি—

দুই হাত তুলিয়া লাহিড়ী বলিলেন—আর কথায় কাজ কি! গোড়া কেটে আগায় জল ঢেলে কি লাভ?

তাহার পর উঠিয়া গিয়া বেলার মাথায় ডান হাতখানি রাখিয়া লাহিড়ী গদ্‌গদস্বরে বলিলেন—আশীর্ব্বাদ করি দিদি, সুখী হও!

পাচক আসিয়া সংবাদ দিল, সব প্রস্তুত।

লাহিড়ী হাসিয়া বলিলেন—আমার অভিজ্ঞতা ত কম হ'ল না!

রামজনম কহিলেন—কি রকম শুনি?

ডাক্তার বলিলেন—আগে আহারাদি হয়ে যাক্। তার পর নিজের কথা সকলে একে একে বলা যাবে। মোক্তার সাহেবের কাহিনী বোধ হয় সবচেয়ে করুণ!

লীলা বলিলেন—আর আমার?

বেলা বলিয়া উঠিল—আমার কিন্তু বড়ই মর্ম্মান্তিক!

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন—আজ আমাদের মধ্যে একজন নেই, তার কথা যতদূর জানি, আমিই বলবো। ভগবানের কাছে প্রার্থনা, কিশোরী যেন অচিরে পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করেন। যার কাহিনী যতই করুণ মর্ম্মন্তুদ হোক না কেন, এই কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা চাই যে বিনামূল্যে শিক্ষালাভ সহজে বড় একটা হয় না এবং যত কিছুই না দুঃখকষ্ট পেয়ে থাকি, জীবনে বৃথা কিছুই যাবে না।

সমাপ্ত

গান

শ্রীবীরেন্দ্রলাল রায়

নিভ্‌ল রে ওই দিনের আলো
উঠ্‌ল ফুটে রাতের হাসি।
তুই কি ভোলা বাঁধন-খোলা
শুন্‌তে না পাস্ পাগল বাঁশী?
তোর তো এ ঘর নয় রে আপন
তুই যে ভোলা পরবাসী॥

ঘুমের মাঝে বোনা স্বপন
ভাঙ্‌বে যবে জাগ্‌বে তপন
মিথ্যে মায়ার এ বীজ বপন
মন-ভোলান কথার রাশি—

স্মৃতি-তর্পণ

শ্রীজলধর সেন

আজ যাঁর স্মৃতি তর্পণ করব, জগতের শিক্ষিত জনগণের কাছে তাঁর পরিচয় দেওয়া নিতান্তই অনাবশ্যক। তিনি সর্ব্বজনপরিচিত ছিলেন, এবং এখনও অসংখ্য জনগণের পূজা গ্রহণ করছেন।—তিনি সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় যুগমানব—মহামানব (superman), ভারতের উজ্জ্বলরত্ন স্বামী বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দের কথা মনে হলেই আমার হিমালয়ের কথা মনে পড়ে। নগরাজ হিমালয়ের যেমন তুলনা নেই—মানবশ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দও তেমনই তুলনার অতীত।

উনবিংশ শতাব্দের শেষার্দ্ধে যে কয়টি জ্যোতিষ্ক ভারত-গগন আলোকিত ও উদ্ভাসিত করেছিলেন—সুধু ভারতবর্ষ কেন—সমগ্র সভ্যজগত যাঁদের অবদানে উন্নতশীর্ষ হয়েছিল—স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের অন্যতম। নিতান্ত অযোগ্য ভক্ত হলেও আজ বহুদিন পরে তাঁর স্মৃতির তর্পণ করতে বসেছি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যিনি নরলোকে আমাকে ভাই বলে আলিঙ্গন করেছিলেন, আজ ত্রিদিবধামে অবস্থিত হলেও তাকে তিনি ভুলতে পারেন নি, তার শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য তিনি গ্রহণ করবেনই।

আমার বন্ধুগণের অনেকের ধারণা—নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) আমার সহপাঠী ছিলেন।—তা ঠিক নয়। আমি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৭৯ অব্দে এপ্রিল কি মে মাসে জেনারেল এ্যাসেম্‌ব্লিজ্ (অধুনা স্কটীশ চার্চ্চেস) কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবেশলাভ করি। আমার সহপাঠী ছিলেন—বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়। আর কে কে আমার সহপাঠী ছিলেন তাহা এখন আর মনে নাই। এতকাল পরে তাঁদের মধ্যে আর এক জনের নামই আমার মনে পড়ছে—তিনি বর্দ্ধমান রাজষ্টেটের সহযোগী ম্যানেজার ছিলেন—নাম হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়। আমার সেই কলেজ সময়ের বন্ধু হৃষীকেশ আজ কয়েক মাস হল পরলোকগত হয়েছেন।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৭৯ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮০ অব্দে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবেশলাভ করেন। কয়েক মাস অধ্যয়নের পরই শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ ত্যাগ করেন। সে বৎসরটি তাঁর বৃথা যায়। ১৮৮১ অব্দে তিনি জেনারেল এ্যাসেমব্লীজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। ১৮৮০ অব্দের শেষে এফ্, এ, পরীক্ষা দিয়ে আমি কলেজ থেকে বের হই। ১৮৮১ অব্দে আমি ঐ কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করি। সুতরাং নরেন্দ্রনাথ আমার সহপাঠী ছিলেন না। আমার কলেজ ত্যাগের পর-বৎসর তিনি কলেজে প্রবেশ করেন। স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ তখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।

নরেন্দ্রনাথ যখন কলেজে পড়েন, তখন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি, হবার সম্ভাবনাও ছিল না; তবে তাঁকে আমি অনেক দিন দেখেছি এবং তিনিই যে নরেন্দ্রনাথ দত্ত তাও জানতাম।

বাল্যকাল থেকেই আমি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতাম। আমাদের গ্রামে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের আমলে আমাদের গ্রামের ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের অন্তর্ভুক্ত হয়; তার পর যখন সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আমাদের ব্রাহ্মসমাজও "সাধারণ"-দল-ভুক্ত হয়। স্কুলে পাঠের সময় থেকে কলেজের পাঠ-সমাপ্তি পর্য্যন্ত আমি যথানিয়মে ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনায় যোগ দিতাম। কলেজ ত্যাগের পরও যখনই কলকাতায় আসতাম তখনই কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের রবি-বাসরীয় উপাসনায় যোগদান করতাম এবং সে সময় যাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাঁদের সকলের সঙ্গেই আমার পরিচয় হয়েছিল। তাঁরা প্রায় সকলেই আমাদের গ্রামের সমাজের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করতে যেতেন। সেই সূত্রে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তার-পর কলিকাতাতেও তাঁরা আমাকে যথেষ্ট ভালবাসতেন। ব্রাহ্ম-সমাজের এই রবি-বাসরীয় উপাসনা উপলক্ষে একটি

যুবক মধ্যে মধ্যে ব্রহ্ম-সঙ্গীত গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করতেন। আমার ব্রাহ্ম বন্ধুদের কাছে তাঁর পরিচয় পেয়েছিলাম। তিনি নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি তখন ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নি, কিন্তু ঐ ধর্ম্মমতের প্রতি তাঁর আস্থা জন্মেছিল।

বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত। আমি তাঁর গান শুনেছিলাম—তাঁর পরিচয়ও পেয়েছিলাম—কিন্তু সে সময় তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার কথাও আমার মনে হয় নি এবং তিনি যে ভবিষ্যতে স্বামী বিবেকানন্দ হবেন, এ কথাও তাঁর হাবভাবে আমি বুঝতে পারি নি। কথাবার্ত্তা হলেও না হয়, হয় তো কিছু জানতে পারতাম, কিন্তু তাও তো হয় নি। আমার তখনকার স্মৃতি একটি সুন্দর-কায় আয়ত-চক্ষু সু-গায়ক নবীন যুবকেই পর্য্যবসিত হয়েছিল।

তারপর দীর্ঘ একযুগ চলে গেল। সংসার-নাট্যমঞ্চে কত নাটকের কত ভূমিকাই গ্রহণ করলাম। কত ঝড়-ঝঞ্ঝা মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেল। কত আশা আকাঙ্ক্ষা আকাশ-কুসুমের মত আকাশেই বিলীন হয়ে গেল। কত ক্ষণস্থায়ী সুখ জীবনান্ত-স্থায়ী গভীর মর্ম্ম-বেদনায় পরিণত হয়ে রইল। কত আনন্দের সংসার গড়তে গেলাম। দেখতে দেখতে সে সকল শ্মশান-ভস্মে পরিণত হয়ে গেল। আমার জীবনের এই ১২ বৎসরের কাহিনী—কি হবে আর সে সকলের আলোচনা করে?

সংবাদপত্রাদিতে শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে নানা কথা পড়তে লাগলাম। দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাড়ীতে অনেক জ্ঞানী গুণী মনীষী যাতায়াত আরম্ভ করলেন। পরমহংসদেবের কৃপা অনেকে লাভ করে ধন্য হয়ে গেলেন। আমিও দু' একবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম। কত সাধু, কত ভক্তের সমাগম দেখেছিলাম। আমি দুয়োরের কাছ থেকে প্রণাম করেই বিদায় নিয়েছিলাম। কোন দিন তাঁর দৃষ্টি আমার ওপর পড়েছিল কি না সন্দেহ—কৃপা-দৃষ্টি তো মোটেই নয়।

সেই সময় শুনতে পেতাম—নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে খুব বেশী যাতায়াত করছেন। লোকের মুখে আর খবরের কাগজে এই সব সংবাদ পেতাম এবং নরেন্দ্রনাথ দত্ত যে পরমহংসদেবের পরম ভক্ত হয়েছেন এবং কিছুদিন পরে সংসার ত্যাগ করে স্বামী বিবেকানন্দ নাম ধারণ করেছেন, এ সংবাদও বন্ধুবান্ধবগণের মুখে অথবা সংবাদপত্রের মারফত পেয়েছিলাম। সাক্ষাৎ পরিচয় কিন্তু তখনও হয় নি, হবার কোন সম্ভাবনাও ছিল না।

তারপর এক অভাবনীয় ঘটনায় আমি স্বামী বিবেকানন্দের (নরেন্দ্রনাথ দত্তের নহে) দর্শন লাভ করি। দর্শন-লাভ মাত্র; পরিচয় হয় নি, আর তখন পরিচয় হবার অবস্থাও তাঁর ছিল না।

এ কিন্তু প্রায় ১২ বৎসর পরের কথা। আমি তখন হিমালয়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তখনো আমি বদরিকাশ্রমের দিকে যাই নি। যাবার কল্পনাও মনে হয় নি। কালীকান্ত সেন নামে বরিশাল জেলাবাসী—এক শিক্ষিত ভদ্রলোক ডেরাডুনে এক ইংরাজী স্কুল খুলেছিলেন। আমি ঘুরতে ঘুরতে হিমালয়ের মধ্যে গিয়ে সর্ব্বপ্রথম ডেরাডুনে এই মাষ্টারজীর আশ্রয় লাভ করি।

মাষ্টারজী আমাকে পেয়ে বসলেন। তিনি বললেন—হিমালয়ে বেড়াতে হয় বেড়াবেন, যখন যেখানে ইচ্ছা যাবেন—একটা আড্ডার তো দরকার! যখন আমার এখানে এসেছেন, হিমালয়-ভ্রমণে ক্লান্ত হয়ে এইখানে এসেই বিশ্রাম করবেন এবং সেই বিশ্রামসময়ে আমার স্কুলে ছেলেদের পড়াবেন!

ওরে বাবা!—সেই মাষ্টারী! এই যে দেশ ত্যাগ করে এলাম—তুমি কিনা বিনা-টিকিটে আমার সঙ্গে সঙ্গে এসে এই হিমালয়ের সানুদেশে ডেরাডুনেও উপস্থিত! কি করি—ভদ্রলোক খেতে দেবেন, কাপড় ছিঁড়ে গেলে কাপড় কিনে দেবেন, শীতবস্ত্র দেবেন—তার পরিবর্ত্তে যখন ডেরাডুনে থাকব তখন তাঁর স্কুলের ছেলেদের অঙ্কশাস্ত্রে গাধা বানাব।

অবান্তর হলেও, সেই সময়ে ডেরাডুনের করণপুরে যে বাঙ্গালী উপনিবেশ ছিল—সেই উপনিবেশের কয়েক জন বাঙ্গালীর নাম উল্লেখ করছি। পাঁচ সাত দিন এই উপনিবেশের বাঙ্গালীদের গৃহে যাতায়াত করে আমি একটা জিনিষ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। হিমালয়ের বক্ষে ডেরাডুনের ক্ষুদ্র এক পল্লীতে এতগুলি "কালী"র সমাবেশ আমার কাছে আশ্চর্য্য ঠেকেছিল।

সর্ব্বপ্রথম নাম করতে হয়—কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের। ইনি জি টি সার্ভে অফিসের প্রধান কম্পিউটার ছিলেন এবং আমি যতদূর জানি, গণিতে অত বড় বিশেষজ্ঞ সে

সময়ে বাঙ্গালীর মধ্যে কেহ ছিলেন না। পারি তো তাঁর কথা অন্য সময়ে বলব।

দ্বিতীয় "কালী"—কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়। ইনি কালীমোহন বাবুর সহকারী ছিলেন। আর এক "কালী"—কালীকান্ত কর। ইনি ফরেষ্ট আফিসের "বড়বাবু" ছিলেন। আর "কালী"—আমার মাষ্টারজী—কালীকান্ত সেন। পঞ্চম "কালী" ছিলেন কালীপদবাবু। ইনি খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

এই পাঁচ "কালী"তেই পর্য্যাপ্ত হয় নি—সেই সময়ে যিনি বৎসরে ছয় মাসের অধিক ডেরাডুনে থাকতেন—তিনি কলিকাতার প্রথিতনামা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়।

এ ছাড়া আরও অনেকে ছিলেন, তাঁদের নাম করতে গেলে তালিকা বিস্তৃত হয়ে পড়ে। তার মধ্যে দুইটি নাম বিশেষভাবে আমার মনে পড়ছে—শশিভূষণ সোম মহাশয় ও রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র দেব। সেই সময়ের এক জন মাত্র এখনও বেঁচে আছেন। তিনি আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ সোম। আমাদের সময়ের তিনিই এখন বেঁচে আছেন এবং তিনি সেখানকারই অধিবাসী হয়েছেন। এখন ডেরাডুনে যাঁরা বেড়াতে যান বন্ধুবর বিমলাচরণ তাঁদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা ও সাহায্য করেন।

ও কথায় আর কাজ নেই। আমি মাষ্টারজীর স্কুলে পড়াই, খাই-দাই থাকি। প্রায় শনিবারেই অপরাহ্ণ দু'টার সময় স্কুল থেকে ফিরে এসে জুতা, পায়জামা, লম্বা কোট এবং প্রকাণ্ড পাগড়ী—আমাদের বিশ্বস্ত ভৃত্য দেবানন্দের জিম্মা করে দিয়ে একখানি কম্বল ও লাঠি নিয়ে মাষ্টারজীকে নমস্কার করে মহানন্দে বেরিয়ে পড়তাম। দুই তিন দিন বনে জঙ্গলে ঘুরে আবার ফিরে এসে পাগড়ী মাথায় দিয়ে ছেলেদের মাথার ভেতর সাইমাল্‌টেনিয়াস্ ইকোয়েশন্ ঢোকাতে আরম্ভ করতাম।

এই সময়ে এক শনিবারে বেলা একটা কি দুটোর সময় লাঠি আর কম্বল নিয়ে নগ্নপদে বেরিয়ে পড়ি। সে দিন আমার লক্ষ্যস্থান ছিল—হৃষীকেশ।

আমার আর কিছু যোগ্যতা থাকুক আর না-ই থাকুক—সে সময়, এখনকার মত, যদি হাঁটার প্রতিযোগিতা থাকত—তাহলে আমি গর্ব্ব করে বলতে পারি যে, সব প্রতিযোগিতায় ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট হতাম। পথে নামলে আমার পা দুখানিতে কে যেন পাখা বেঁধে দিত।

আমি সেদিন এমন হেঁটেছিলাম যে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই হৃষীকেশে পৌঁছাই। অবশ্য তখন গ্রীষ্মকালের দিন—কাযেই খুব বড়।

হৃষীকেশে তখন সন্ন্যাসীদের আহার যোগাবার জন্য গুটি দুই তিন সদাব্রত ছিল। এখন কি হয়েছে জানি নে। সেই সদাব্রতের লোকরা হৃষীকেশের গঙ্গার চড়ার ওপর ঘাস পাতা বাঁশ খড় দিয়ে ছোট ছোট কুটীর তৈরি করে রাখতো। সন্ন্যাসীরা এসে সেই সব কুটীরে বাস করতেন। কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসাও করতে হ'ত না। প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে সন্ন্যাসীরা সদাব্রতের সুমুখে গিয়ে উপস্থিত হতেন। সদাব্রতের লোকরা দুখানি মোটা রুটী, আর খোসা সুদ্ধু কলায়ের ডাল—আর কখন কখন বা তার সঙ্গে একটু নুণ আর লঙ্কাও দিতেন। সন্ন্যাসীরা তাই নিয়ে গিয়ে গঙ্গার ধারে বসে আহার করতেন, তারপর অঞ্জলিপুরে জল পান করতেন। রুটি দুই খানিই বটে—কিন্তু সেই দুই খানিই তৈরী করতে আধ সের তিন পোয়া আটা লাগতো। সুতরাং সদাব্রতওয়ালাদের আর সন্ধ্যা-বেলার আহার জোগাতে হ'ত না, আর তার প্রয়োজনও হ'ত না।

আমার যদিও তখন লম্বা চুল ও দাড়ী, কম্বল ও লাঠিমাত্র সম্বল, তা হলেও আমি কখনও হৃষীকেশের কোন কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করি নি। সন্ন্যাসীর আসন আমি অধিকার করব কেন?

আমি একটা সদাব্রতের বারান্দাতেই কি শীত কি গ্রীষ্ম পড়ে থাকতাম।

আমার তো আশ্রয়স্থানের ভাবনা ছিল না—কাযেই সন্ধ্যার প্রাক্কালে হৃষীকেশে পৌঁছে আমি সন্ন্যাসীদের কুটীরগুলি দেখতে গেলাম। সেইখানে ঘুরতে ঘুরতে একটি কুটীরের সম্মুখে দেখি—জন তিন চার বাঙ্গালী সন্ন্যাসী সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের মুখে প্রবল উৎকণ্ঠা দেখে আমি হিন্দীতেই জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে। তাঁরা বল্লেন—স্বামী বিবেকানন্দ নামে এক জন সন্ন্যাসী মৃত্যুশয্যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ! হৃষীকেশের গঙ্গাতীরে এই ক্ষুদ্র কুটীরে পরমহংসদেবের পরম স্নেহপাত্র স্বামী বিবেকানন্দ! আমি সন্ন্যাসীদের অনুমতি নিয়ে সেই কুটীরের মধ্যে প্রবেশ

করলাম। কুটীর-মধ্যস্থ ধুনীর অস্পষ্ট আলোকে স্বামী বিবেকানন্দকে দেখলাম। তিনি তখন সংজ্ঞাশূন্য।

হিমালয়ের বনজঙ্গলের মধ্যে অনেক অসাধু সন্ন্যাসীও দেখেছি, আবার অনেক সাধু সন্ন্যাসীরও দর্শনলাভ হয়েছে। তাঁদের কারো কারো বিশেষ ক্ষমতাও দেখেছি। এমনও দেখেছি, কোন সন্ন্যাসী কোন একটা গাছের পাতা দিয়ে মুমূর্ষু রোগীর জীবন ফিরিয়ে এনেছেন। তাঁর কাছে সে পাতার সন্ধানও নিয়েছি। সে দিন স্বামী বিবেকানন্দকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখে এবং তাঁর চিকিৎসার কোন সুবিধাই নাই দেখে আমার সে গাছের কথা মনে হ'য়েছিল। আমি তখন তাড়াতাড়ি কুটীর থেকে বেরিয়ে এসে সেই প্রায়ান্ধকারে গঙ্গার বালুকাময় চড়ায় সেই গাছের অনুসন্ধান করে সৌভাগ্যক্রমে অনতিদূরেই সেই গাছ পাই। তারি ২।৩টি পাতা এনে হাতে রগড়ে রস বের করে স্বামীজীর মুখে দিলাম। দেখিই না কেন—সন্ন্যাসীর এ গাছ ফলপ্রদ হয় কি না। তারপর ঔষধের ফলাফল দেখবার জন্য কুটীরের বাইরে বালুকার আসনে বসে রইলাম।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে স্বামীজী চৈতন্য লাভ করলেন। তাঁর সঙ্গীরা তখন কুটীরের ভিতরে ছিলেন। স্বামীজী ধীরে ধীরে বল্লেন—তোরা ভয় পাচ্ছিস কেন। আমি মরব না—আমার অনেক কায আছে। আমি দুয়ারের কাছ থেকে এই কথা শুনে, ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে আমার সদাব্রতে এসে উপস্থিত হলাম।

স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনলাভের, বোধ হয়, ১০।১৫ দিন পরে সংবাদ পেলাম, সানুচর বিবেকানন্দ স্বামী ডেরাডুনে এসে সেখানকার কালীবাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। সেই কথা শুনে আমি, শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ এবং তাঁর খুল্লতাত সায়ভে অফিসের এক জন প্রধান কর্ম্মচারী বন্ধুবর শশিভূষণ সোম—এই তিন জন কালীবাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেই রাত্রিতেই তাঁদের করণপুরে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম, তাঁরা পরদিন প্রাতঃকালে আসতে স্বীকার করলেন।

শশিভূষণ সোম মহাশয়ের বাড়ী খুব বড় ও সুন্দর। সেইখানেই তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা করলাম। শশীবাবুদের সকলেরই অফিস ছিল। কাযেই সন্ন্যাসীদের পরিচর্য্যার ভার—বাইরে আমি এবং ভিতরে শশীবাবুর বাড়ীর মেয়েরা গ্রহণ করলেন।

স্বামীজী এবং তাঁর সহচরবর্গকে আমরা কয়েকদিন আটকে রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু স্বামীজী অস্বীকার করলেন। তিনি বল্লেন—দ্বিতীয় তিথি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে নেই—সেই জন্যই নাম "অতিথি"। তার পরদিন প্রত্যূষে তাঁরা চলে গেলেন। স্বামীজী বলে গেলেন, তিনি উত্তরাপথ ত্যাগ করে এই বার দক্ষিণাপথে যাবেন।

সেই যে এক দিন তাঁদের সঙ্গে কাটিয়েছিলাম, সে কথা আজও মনে আছে। গভীর ধর্ম্মচর্চ্চা, শাস্ত্রালোচনা, তর্ক-বিতর্ক, সারা দিনরাতের মধ্যে তাঁর মুখে শুনতে পেলাম না। সুধু গান, সুধু আনন্দ, সুধু স্ফূর্ত্তি, সুধু রহস্যজনক গল্পগুজব। তিনি সেই দিনও রাতটা আমাদের একেবারে আনন্দের হিল্লোলে আপ্লুত করে রেখেছিলেন। এ স্মৃতি কি ভুলবার!

এই যে আমাদের সেদিনকার এত আনন্দ—এর মধ্যে কিন্তু ঘুণাক্ষরেও হৃষীকেশে আমার সেই অভাবনীয় বা অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামীজীর দর্শনলাভের কথার উল্লেখ করি নি। স্বামিজী ত ন'নই, তাঁর সঙ্গীরাও ডেরাডুনে আমাকে চিনতে পারেন নি—পারবার কথাও নয়; তখন আমি নগ্নপদ কম্বল-সম্বল সন্ন্যাসী, আর ডেরাডুনে আমি ভদ্রবেশী, প্রকাণ্ড পাগড়ীধারী মাষ্টারজী। তা ছাড়া হৃষীকেশের গঙ্গাতীরে প্রায়ান্ধকারে মানুষ চেনাও শক্ত; সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়ে স্বামীজীর পরলোকগমন উপলক্ষে একদিন মাত্র টাউনহলের শোক-সভায় হৃদয়ের আবেগ সংবরণ করতে না পেরে হৃষীকেশের ঘটনার সামান্য উল্লেখ মাত্র করেছিলাম। আজ তাঁর স্মৃতির তর্পণ-প্রসঙ্গে কথাটা এতদিন পরে উল্লেখ না ক'রে থাকতে পারলাম না।

অপত্য-স্নেহ

শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার

(৬)

ভো-ভো-ভো করে' বিকট নিনাদে কলের বাঁশী গম্ভীরভাবে দীর্ঘক্ষণ ধরে বাজে। শ্রমিকদল অলস শয্যা ছেড়ে উঠে। নিমের ডাল ভেঙ্গে দাঁতন করে, হাত মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি সস্তা নিলামী জামা কাপড় পরে, পাগড়ী বাঁধে বা টুপী পরে, নিলামী জুতা পায় দেয়, মধ্যাহ্ন ভোজনের খাদ্য—লোহার বা পেতলের কৌটায় ভরে হাতে ঝুলায়, দল করে ঊর্দ্ধমুখে মিলে ছুটে যায়। ছুটছে, কেমন করে ছুটছে! ওদের চলার ভঙ্গিমাটাই আলাদা। দুপুর রোদে বা বৃষ্টিতে এবং যখন খাবার জন্য বাড়ী ফেরে তখন এদের দেখতে খুব আশ্চর্য্য বোধ হয়। কী ভীষণ ভিড়! রাস্তা ভরে যায়, পাশ কেটে বের হওয়া খুব কঠিন। শাঁ-শাঁ বেগে ধেয়ে চলে। ভারত মহাশ্মশানে যে এত বড় একটা সজীব জাতি জীবিত আছে তা চাক্ষুষ না দেখলে কল্পনা করা যায় না। এরা যখন মিলে কর্ম্মরত থাকে তখন এদের কোন ব্যক্তিত্ব থাকে না, সজীব বলে বুঝা যায় না, কল-কব্জার একটা অঙ্গ বলে মনে হয়; বাইরে, বিশেষতঃ যখন এক ঘণ্টার ছুটীতে বাড়ী যায় তখন এদের দেখে মনে হয় এরা অন্য কিছু, মহা সজীব প্রাণী। এদের সঙ্গে অপর ভারতবাসীর মিল আছে শুধু দেহের কাঠামোতে। এদের গতি যেন দুর্ধর্ষ, অপ্রতিহত, অপরাজেয়। সুপ্ত কামানের গোলাগুলী যেমন উত্তাপ পেলে ভীষণভাবে দুর্দ্ধর্ষ রূপ নিয়ে ছুটে, ঠিক তেমনি। ঝড়ো ঝঞ্ঝা, উত্তপ্ত সূর্য্যভাতি, সান-ষ্ট্রোক, নির্জ্জীব শীতের ভয় নেই। গট্-গট্-গট্ করে রুদ্র ছন্দে চলে যায়। এদের সজীবতা দেখে নির্জ্জীব, জড়ের প্রাণেও বুঝি সজীব হ'বার স্পৃহা-কর্ম্মস্পৃহা প্রবলভাবে জেগে উঠে।...

শ্রমিকদল মিলের সরু গেটের পাশে এসে দাঁড়ায়; বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, রাস্তার ধারে বসে। সরু দ্বার লোহার পাত দিয়ে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, উদ্দেশ্য কুলি মজুররা যদি কোন জিনিষ লুকিয়ে নেয়—তবে লোহার পাতে লেগে বেজে উঠবে। দ্বারে তিন চার জন নেপালী বা ভুটিয়া দারোয়ান দুর্দ্ধর্ষ ভীষণাকৃতি চেহারা নিয়ে বসে থাকে। শ্রমিকদল এক এক জন করে হাতে বা কোমরে ঝুলানো তাম্রখণ্ডে মিলের ক্রমিক নম্বর দেখিয়ে ভেতরে ঢুকে। দিন-মজুররা রোজ কাজ পায় না, কিন্তু রোজ মিলে এসে হাজিরা দিতে হয়। রোজ হাজিরা না দিলে অন্য দিন কাজ পাবার আশা থাকে না। কে কবে কখন কাজ পাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই, তাই বহু দূর থেকেও রোজ দেখা দিয়ে যায়। যদিও জানে যে সে কাজ পাবে না, তবুও আসে যদি দুঃখ, অভাব জানিয়ে কাজ পায়। যারা কাজ পায় তারা ব্যস্তভাবে কাজে লেগে যায়, আর যারা কাজ পায় না গেটের বাইরে হল্লা করে, যাকে খুশী অভিসম্পাত করে, পেটের ক্ষুধায় ক্রোড়পতিদের মুণ্ডপাত করে; অপরকে গালাগাল দিয়ে গায়ের ঝাল মিটায়, তারপর অন্য পথে চলে। ফেরার পথে এদের আর সজীব জাতি বলে মনে হয় না, আলাদা একটা জাত বলে মনে হয় না—ভারতবাসী বলেই মনে হবে। এদের প্রাণে নেই আশা, নেই ভরসা, হাওয়ার কোলে নিজকে ছেড়ে দেয়, জানে না পরিণতি, জানে না কোথায় নিয়ে যাবে ঝড়ো-হাওয়া? শূন্যেই লয় পাবে—না অতল গর্ভে নিমজ্জিত হবে, না কোন উর্ব্বর ক্ষেত্রে শিকড় গাড়বে? দেহে যেন প্রাণ নেই, মনে বল নেই, বিবেকে বিচারবুদ্ধি জ্ঞান নেই, চরিত্রে দৃঢ়তা নেই; দারিদ্র্যের ভয়ঙ্কর ক্রূর মূর্ত্তিকে দেখে প্রাণ অব্যক্ত ভীতিতে, বেদনায় করে ডিব্-ডিব্, মন হয় অসাড়, জড়; শক্তি যায় হারিয়ে, শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হয়ে পড়ে শিথিল। এবার চলার পথে জীবন্ত প্রতীক মূর্ত্তি ফুটে উঠে না, জুতার ঠক্ ঠক্ ঠক্ একতারায়, রাস্তার নির্জ্জীব লোকদের আর চেতনার সাড়া জাগিয়ে দেয় না; ওদের চলার ভঙ্গীতে শুধু ভেসে উঠে—ব্যর্থতার, অভাবের, অনাচারের মর্ম্মান্তিক চিত্র, চলার শিথিল শব্দে জানায় হাহাকারের করুণ বেদনা। এদের দেখে কে বলিবে যে এরাই খানিক আগে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে জানিয়ে গিয়েছিলো—ভারত মহাশ্মশান নয়,

আজো সব নির্জ্জীব, জড় হয়ে পড়ে নি। শ্রমিক দল এখনো ভারতের বুক থেকে মুছে যায় নি, জেগে আছে, এখনো বুকের হিম-শীতল পাংশে রক্ত ঢেলে দিচ্ছে অত্যাচারীদের জন্য। বুকের রক্ত দিচ্ছে কি-না বুঝে না, বুঝলেও কেন দিচ্ছে তা বুঝে না—তাই যারা অজ্ঞানের রক্তশোষণ করে নে'য়—তারা অত্যাচারী, ভয়ঙ্কর। হিংস্র জন্তু হিংস্র প্রকৃতির জন্য ভয়ঙ্কর, কিন্তু যারা সাধুবেশে হিংস্র, নিজের সর্ব্বনাশ যাতে বুঝতে না পারে তা'র পথ বন্ধ করে রাখে, তারা যে কি—তার ভাষা, তার উপযুক্ত বিশেষণ আমার জানা নেই! যাক্ সে কথা—শ্রমিকদল—যারা কাজ পেলে না—তারা যদিও ঘরের কথা মনে করে মাথায় হাত দিয়ে বসে, তবু আশা রাখে রাত্তিরে হয়ত কাজ পাবে, তখন এমনি ভাবে চলবে না; আবার চলবে বেগে, আশা ভরসা, কল্পনার উজ্জ্বল ছবি মুখে এঁকে দপ্-দপ্ পা ফেলে। যাবে এ পথেই, তখন চলবে না টলতে টলতে। হয়ত দেহ মন লেপটিয়ে পড়বে না। এদের যাওয়া ও আসার মাঝে কত বড় সমস্যা, কত বড় উত্থান পতন। হয় ত আপনারা কেউ ভাবতে পারেন এমন কি বড় সমস্যা—বড় উত্থান পতন? নয় একদিন কাজ নাই বা পেলে, এক একটা কুলি মজুর কি কম টাকা রোজগার করে! আমি বলি—স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—যে, কোন জাতি বা শ্রেণীকে বিচার করতে হলে ওদের মন ও চোখ নিয়ে বিচার করা উচিত। প্রায় প্রত্যেক কুলি মজুর মাসে চল্লিশ, পঞ্চাশ টাকা রোজগার করে, অবশ্য কেউ পনের টাকা, কেউ সত্তোর আশী টাকাও রোজগার করে। অবসর, বিশ্রাম, আমোদ, উৎসব—হীন, এককথায় বৈচিত্র্যহীন জীবনে মিলের অত্যধিক পরিশ্রমের পর যখন কুলি মজুর স্ত্রীপুরুষরা হপ্তা শেষে মাইনে পায়, তখন ক্ষণিক আমোদের লোভ সংবরণ করতে পারে না। অশিক্ষিত স্ত্রীপুরুষ মজুররা বোতলের পর বোতল মদ খায়, হল্লা করে। এর চেয়ে বড় উৎসব, স্ফুর্ত্তি এদের আর জানা নেই। অদৃশ্য দৈহিক দুর্ব্বলতা এমনিভাবে এদের সর্ব্বনাশ করে। তাই এদের রোজ কাজ পাওয়া চাই, নইলে ভুক্ত-অভুক্তর মস্ত বড় প্রশ্ন উঠে।···এরা যে প্রাণ দিতেই জন্মে, অন্যমনস্কের খেয়াল কতক্ষণ থাকতে পারে? তা হলে জাগরণের সাড়া জানাবে কে, মরণ মন্ত্র গেয়ে গেয়ে মাতাল হবে কে. ভারী ভারী লোকদের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা মেটাবে কে? এরা জগৎ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, এরাই শ্রোতা, এরাই গায়ক, এরাই জাগায়, এরাই চিরদিনের জন্য ঘুম পাড়ায়। এরা অপরকে বাঁচিয়ে রাখে, অপরকে জাগায়; নিজেরা কি বাঁচতে শিখবে না, নিজেদের কি জাগাবে না? শুধু কি দেবেই নিজেরা—নেবে না কিছু সম্পদ? অমৃত বিলায়ে কি শুধু বিষই পান করবে? ফটকের ভেতর—ধপ্-ধপ্-ধপ্, ঘ্যান্-ঘ্যান্-ঘ্যান্, কড়্-কড়্-কড়্, কত কি বহু স্বরে এন্‌জিন্ চলছে, ছোট, বড়—কত শত যন্ত্রপাতি চলছে। বিরাট ব্যাপার! অনভ্যস্ত চোখ উঠে টাটিয়ে, কাণ যায় বিকল হয়ে।

এক দিকে তূলা দিচ্ছে, অন্য দিক দিয়ে সূতা বের হয়ে আসছে। মোটা, সরু, মাঝারি, কত রকম! ঠাস্-ঠাস্-ঠাস্ করে মাকু চলছে; হাজার হাজার কাপড় তৈরি হয়ে বেরুচ্ছে। দরজা, জানালা দিয়ে বাতাস ঢুকে সূতা ছিঁড়ে দেবে বলে সব বন্ধ, বাতাসের চলাচল স্বাভাবিক নেই, লোকের শ্বাসপ্রশ্বাসে, সজীব জীবের চলাচলে ঘরের বাতাস হয়ে যায় ভীষণ গরম, বিষাক্ত। শীতের সময় সূতা শক্ত হয়ে যায়--তাই ক্ষণে ক্ষণে Steam (উত্তপ্ত জলের ভাপ) ছাড়া হয়। মাঘ মাসেও শ্রমিকদের গা থেকে টপ্ টপ্ করে ঘাম পড়ে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না; পা টন্ টন্ করে, শরীর ঝিমিয়ে আসে, বিশ্রামের জন্য অস্থির হয়ে পড়ে। তবু দাঁড়িয়ে থাকে, কাজ করে, বেশী করে কাজ করতে চায়; ঘরের ভাবনা যে হৃদয়ে অত্যাচার করে।···

চামড়ার কারখানা। গাড়ী ভরে ভরে কাঁচা চামড়া, শুক্‌নো দুর্গন্ধময় চামড়া আসে। চামড়াগুলি চুণের জলে পচানো হয়, পচানো চামড়া কাঠের ওপর ফেলে ছুরি দিয়ে ঘসে ঘসে লোম ও মাংস পরিষ্কার করে। যেমনি দুর্গন্ধ, তেমনি নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর। সে চামড়া গাছের ছাল বা রসায়ন দ্রব্য দিয়ে ট্যান্ করা হয় (Vegetable and chrome tanned leather); সে চামড়া থেকে হয় বাক্স, জুতা, মনি ব্যাগ্, কত কি জিনিস। সে সব জিনিস বাক্সে বোঝাই করে দেশ বিদেশে চালান হয়। দু'কথায় ত চামড়ার কলের কথা শেষ করলাম; তাতে কুলি মজুরের দুর্দ্দশার কথা মোটেই বোঝা যায় না—বরঞ্চ গতর খেটে ভাল করে জীবন চালাতে পারে। কিন্তু হয় না। মিলের বর্ণনা

করা এখানে সুবিধে হবে না—তাই একটু বলে রাখি যে চামড়ার কলে কাপড়ের কলের মত অহরহ য়্যাক্‌সিডেণ্ট হয় এবং খুব বলিষ্ঠ লোক (কুলি মজুর) দশ ঘণ্টা কাজ করে দশ আনার বেশী রোজগার করতে পারে না।

লোহার কারখানা—এটা আরো ভয়ঙ্কর। এখানে টাকা উৎপন্ন হয় শ্রমিকদের তেজে। খনিজ লোহা (iron ore) গাড়ী গাড়ী বোঝাই হয়ে আসে, চুল্লীতে (furnace) গলানো হয়, গলিত লোহা নল বয়ে বেরিয়ে আসে। লোহা গুণ অনুসারে তিন প্রকার হয়, এক এক প্রকার লোহা দিয়ে হাজার হাজার রকম জিনিষ তৈরি হয়। লোহার গুণ বলে শেষ করা যায় না। একজনের স্মরণ শক্তিতে লোহার এতগুলো গুণ একসঙ্গে থাকতে পারে না। লোহা না থাকলে মানুষ ও পশুতে বিশেষ পার্থক্য থাকত কি-না সন্দেহ। লোহা যদি না থাকতো, হতো না কৃষিকার্য্য, হতো না এন্‌জিনিয়ার, হতো না কর্ম্মকার (লোহার), হতো না সুখশান্তির পথ, হতো না সভ্যতা; অতি আদি কালের মত মানুষে মানুষ খেতো, ঝগড়াঝাটি বর্ব্বরতা দিয়েই জীবন চালাতো। লোহা যদি না থাকতো, তবে উর্ব্বর মস্তিষ্কের ঘি বৃথাই শুকিয়ে যেতো। এই লোহা—যার গুণ শত শত মুখে গেয়ে শেষ করা যায় না, যার প্রয়োজন নিত্য পদে পদে—অথচ এত শ্রেষ্ঠ অমূল্য লোহা দৈনিক কত সহস্র লোকের রক্ত চুষে নিচ্ছে যে, তা লিখে শেষ করা যায় না। যদি চিন্তা করা যায় তবে দেখা যায় কত মহা-উপকারী, অথচ কত সর্ব্বনাশী। লোহা নিজে লাখো লাখো কোটি কোটি লোকের রক্ত পান করে না। কিন্তু লোহার জন্যই শ্রমিকদলের রক্ত দিতে হয়। ক্ষমতা-শালী লোক লোহার পূজায় কোটি কোটি শ্রমিকের জীবন ছল-চাতুরীতে বলিদান করে। ছেলেদের রূপকথার বইতে থাকে—ডাইনীরা ছদ্মবেশ ধরে লোক ভুলায়, রাত্তিরে শত্রুর রক্ত চুষে খায় নল লাগিয়ে। একদিনে মরে না, শুকাতে শুকাতে ধীরে ধীরে ঝরে পড়ে। এর নাম স্বাভাবিক মৃত্যু, হত্যা নয় কারণ ভগবান ভিন্ন অন্য কাউকে মৃত্যুর জন্য জবাবদিহি করা চলে না। লোহ কারখানায়ও তাই, একেবারে মরে না, নরহত্যার দায় এড়াবার জন্য তিলে তিলে ধ্বংস করে। তার অনবরত জ্বলন্ত চুল্লীতে কাউকে তিলে তিলে ভাজে, কাউকে আংশিকভাবে, কাউকে সম্পূর্ণ ভেজে দেয়—আবার কাউকে সেদ্ধ করে দেয়। ব্যাপার গুরুতর নয়, দৈব-দুর্ঘটনা (য়্যাক্‌সিডেণ্ট)। য়্যাক্‌সিডেণ্ট কথাটা তুলে দিয়ে, স্বাভাবিক কথাটা ব্যবহার করলে অবস্থার সঙ্গে বেশ মিল খাবে।

খনি ও সমুদ্রের তল কি প্রকার জানি নে, নাম শুনলেই পিলে উঠে চম্‌কে, সংক্ষিপ্ত আয়ু যায় আরো কমে। সাপের মাথার মণি নেবার মত। সাত রাজার ধন পাবে না, কিন্তু আনতে হবে সাত-রাজার,ধন, প্রতিদান—পাবে যৎসামান্য মজুরী, নয় প্রতিকারহীন সাপের বিষ। সমুদ্র মন্থন করে আনবে চুণি, পান্না, পাবে সামান্য মজুরী—দিতে হবে প্রাণ কুমীর হাঙ্গর কত কি ভয়ঙ্কর জলজন্তুর নিকট। নামতে হবে খনিতে, মরতে হবে বিষাক্ত গ্যাসে, জ্বলন্ত খনিজ আগুনে, কখন বা নিষ্পেষিত হবে ধসে-পড়া পাড়ের নীচে পড়ে। সর্ব্বত্রই দৈব-দুর্ঘটনা। ক্রোড়পতিরা টাকার জোরে সর্ব্বশক্তিমান, তাই তারা তিলে তিলে মারেন, হঠাৎ মারেন, কোন জবাবদিহি হতে হয় না। দিলেই কি সে প্রাণগুলি ফিরে আসবে—না যাদের মারবার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন তাদের রক্ষা করা হবে। পায়ের নীচে পড়ে পোকা পিঁপড়ে কত মরে, কে তার খোঁজ রাখে, কি-ই বা তার প্রতিকার করা যেতে পারে, কোন জবাব দিতে হয় না কারো নিকট, মনের নিকটও নয়। এরা মানুষ, তাই দৈব-দুর্ঘটনা শব্দ তৈরি হয়েছে। প্রথম থেকে কি স্বাভাবিক, অবিসম্ভাবী কথাগুলি তৈরি হয় নি? এখনও আছে, চক্ষুলজ্জা আর কেন? সকলেই বুঝি মানেটা এবং চাইচিও—অতএব ব্যবহার করিলে কিছু সততার পরিচয়ই দেওয়া হবে। কুলিমজুররা অল্পই বুঝে! বুঝলেই বা কি, আসতে বাধ্য। প্রকৃতি তাদের এনে দেবে নিজস্ব-হীন করে দিয়ে।

শ্রমিক দল নয় মরলই, মরবার জন্য যখন সৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু এরা ভোগ করতে পারবে না কেন? পূর্ব্বকালের দাসদের (slave) চেয়ে এরা কোন্ অংশে ভাল? পূর্ব্বকালে দাস নাম ছিলো, এখন তাদেরই নাম হয়েছে শ্রমিক। পার্থক্য কোথায়? এরাই তৈরি করে, উৎপন্ন করে এরাই হাতে তুলে দেয় কিন্তু ব্যবহার করে অপরে, ভোগ করে অপরে, টাকা নেয় ক্রোড়পতিরা। এরা থাকে

অর্দ্ধ-উলঙ্গ, উলঙ্গ অবস্থায়—অনশনে, অর্দ্ধাশনে—অথচ এদের হাতে গড়া জিনিষ ব্যবহার করে, অপব্যবহার করে অপর লোক; এদের শরীরের রক্ত কেড়ে নিয়ে বলীয়ান হয়ে—এদেরই তুচ্ছ করে, ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে, জুতার নীচে ফেলে পদদলিত করে। কে রাজা? কে মানুষ? কে সভ্য? কে উচ্চ, মহৎ লোক? যদি ভেবে থাক, তবে এর উত্তর দাও, পরখ হোক তোমার ক্ষমতার, তোমার মনুষ্যত্বের, তোমার সভ্যতার, তোমার মহত্ত্বের। কেউ নেই, কেউ নেই; যদি কেউ থাকে—সে বারি-বিন্দু মাত্র, শীতের হাঁড়িমুখো আকাশের ঝরে-পড়া মুক্তার মত শিশিরকণা, অরুণালোকে সহজেই শুকিয়ে যায়, কেউ বুঝতে পারে না, জানতে পারে না, জাতির উপকার হতে পারে না।

এদের জন্ম ত' অপমৃত্যু, দুঃখ, দুর্দ্দশা, যন্ত্রণা, অপঘাত ও অত্যাচারের সঙ্গে যুঝবার জন্য; এমনি সভ্য দুনিয়ার মজার লীলা যে এরা চায় বাঁচতে, তাই যুঝে প্রাণপণ মৃত্যুর দুয়ার আশ্রয় করে, অদৃশ্য শত্রুদের (ক্রোড়পতিরা) তৈরি পিছল পথে পা পিছলে মৃত্যুর দিকে যে এগিয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে পারে না, পারলেই বা প্রতিকার কি? গলায় ফাঁস লাগানো আছে, যে দিকে ঢাল সেদিকেই যেতে হয়। এরা জন্মেই ফাঁসি গ্রন্থিতে গলা বাড়িয়ে রাখে, জ্ঞানের সঙ্গে মৃত্যুর করালগ্রাসে ভয় পেয়ে পলাতে চায়, প্রতিকারের জন্যে যুঝে। যুঝাটা মনকে চোখ ঠারার মত।

আশ্চর্য্য হ'বার কিছু নেই, চমকে ওঠবার মত কিছু নেই, ভয় পাবার মতও নয়, ভাবনা চিন্তারও নয়, সভ্য জগতের সমস্যাও নয়। প্রায়ই উঠে চেঁচিয়ে, পাশের লোক যায় ছুটে, ধরাধরি করে মূর্চ্ছিত বা মৃত বা জখমযুক্ত শ্রমিকদের বাইরে নিয়ে আসে। কখনো কখনো কুলিমজুর টুকরো টুকরো হয়ে যায়, কখনো হয় নিষ্পেষিত। কী পাষাণভেদী আর্ত্তনাদ! কেউ কেউ আর্ত্তনাদ করবার অবসর পায় না, কেউ মরমে মরমে অনুভব করে প্রকাশ করবার শক্তি হারিয়ে ফেলে, কেউ কেউ গোঁঙায়—গোঁ গোঁ করে, কেউ মরণ আর্ত্তনাদ করে অচেতন হয়, কখনো ভাঙ্গে ঘুম—কখনো আর ভাঙ্গে না। কী ভয়াবহ ব্যাপার। শুনলে আঁতকে উঠে প্রাণ, সে দৃশ্য দেখা যে কি, বলা কঠিন; ভাষা হারিয়ে ফেলতে হয়। বেল্টে জড়িয়ে ঘুরতে লাগলো, বাড়ী খেতে খেতে টুকরো টুকরো হয়ে পড়লো, মানুষকে মানুষ বলে চেনা যায় না। পড়ে গিয়ে, মালের চাপায় পড়ে, হাড় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো—বিষাক্ত গ্যাসে দলকে দল মরে গেলো, খনির চাপে জীবন্ত সমাধি পেলে, আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো, সমুদ্রের তলে জনমের মত আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। বলা সহজ, লেখা সহজ, ধ্বংস করাও সহজ—কিন্তু তারা? যারা অহরহ যাচ্ছে, যাদের লোক যাচ্ছে—তাদের কথা কি সহজ? বড় কঠিন, বড় অভিশাপ!···এতে না আছে অনুতাপ, না আছে শোক, না পড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস, না দেয় আন্তরিক সান্ত্বনা, না দেখায় সহানুভূতি; অবশ্য যমরাজ্যে এরূপ প্রত্যাশা করা অনুচিত। এদের লোক দেখানো 'আহাঃ!' 'উঃ!' করার মূল্য আছে? যারা ধ্বংস হলো তারা কি ফিরে আসবে ও তাদের অসহায়, দুর্দ্দশাগ্রস্ত পরিবারের কি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে? এই ছলনাময় সহানুভূতি বা নরহত্যার মূল্য কি যৎকিঞ্চিৎ অর্থ দানে হয়? আইনে অনেক কিছু লেখা থাকে—কিন্তু কটা পরিবার আদালত ঘুরে এসে নিয়মমত মূল্য পায়? যে লোকই য়্যাক্সিডেন্টে মারা যায়, তারা নিজের দোষে মারা যায় বলে আদালতে প্রমাণ হয় কেন? কারণ এরা অসহায়, গরীব, সাহেবের দল চাকরীর মায়ায় সত্য কথা বলতে সাহস পায় না। কী ভয়ঙ্কর অবিচার! কি নির্ম্মম অত্যাচার! এই সহানুভূতি—প্রাণের মূল্য যে যৎসামান্য অর্থে দেওয়া হয়—এর চেয়ে ভণ্ডামী—খারাপ কাজ আর কি হতে পারে! লোভ দেখিয়ে বঁড়সীতে মাছ গাঁথা কি সভ্যতা? অর্থ লোভ না দেখাইলে চলে, এদের ভুলাতে যে অর্থ দিতে হয় তাতে অন্য আমোদ চলতে পারে, এদের টাকা দিলেই কি—না দিলেই কি—আসবে, আসতে বাধ্য। একজন মরে গিয়ে যে স্থান খালি করবে, সে স্থানে শত শত লোক এসে দাঁড়াবে। যাদের পেট খালি তারা মৃত্যুর কথা কমই ভাবে, ভাবলেই বা প্রতিকার কি! এঁরা যেন লজেঞ্চুস খান, কখনো চুষে চুষে; কখনো চিবিয়ে। আমরা সভ্য—তাই এর নাম গতর-খাটা, মৃত্যুর নতুন নাম দৈব-দুর্ঘটনা।···

কারখানায় ডাক্তার সাহেব আছেন, ডিস্‌পেন্‌সারি আছে। ডাক্তার সাহেব কাটা চেরা করেন, ক্ষতস্থান বাঁধেন, হাড় যোড়া লাগাতে চেষ্টা করেন, ওষুধ-পত্তর দেন।

রোগীরা বস্তি হাসপাতালে আশ্রয় পায়। ব্যাপার গুরুতর নয়, জখম হয় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পড়ে, ওষুধ পড়ে, হাসপাতালে বিশ্রাম নেয়। দীর্ঘ কঠিন কাজের পর পরিবর্ত্তন—অবসর। ব্যাপার আজগুবি নয়, মারাত্মক নয়, আলোচনা করবার মত নয়, পত্রিকায় লিখবার মত দরকারী খবর নয়। নিত্তি হচ্ছে, আদিকাল থেকে হয়ে আসছে, হবেও! যতদিন থেকে একদল লোক সভ্য হয়েছে ততদিন যাবৎ চলে আসছে এবং যতদিন এমনি সভ্য, ক্ষমতাশালী থাকবে ততদিন এমনি চলবে। চিরন্তনী ব্যাপার।··· কারো গেলো হাত ভেঙ্গে, কারো গেলো পা ভেঙ্গে, কারো মাথা কেটে চৌচির। ছোট খাটো জখম যে নিত্তি কত হচ্ছে তা কে খবর রাখতে পারে। অভিশপ্ত শ্রমিক দলও দু'দিন বাদে ভুলে যেতে বাধ্য হয়। অতীতকে মনে রেখে অনুবে—মরবে—না বর্ত্তমানকে সামলাবে? অফিসাররা সহানুভূতি দেখিয়ে বলেন 'জখম গুরুতর নয়। রক্ষে যে প্রাণটা যায় নি; ঈস্ সেদিন যখন টাটকা মানুষটা মরে গেলো।' ব্যাপার গুরুতর নয় তা ত' পূর্ব্বেই বলেচি। কি হচ্ছে? প্রাণ ত যায় নি! মাত্র ত' গেলো—নয় এক পা, নয় হাত, নয় চক্ষু, নয় বা শক্তিহীন জড় পঙ্গু হয়ে পড়লো, মারা যায় নি তো! এই অভিশপ্তের বংশ যখন ধ্বংস হবে না, তখন ভয় কি? একজনের স্থানে শত শত লোক এসে দাঁড়াবে। হায় অভিশপ্তের দল! হায় মন্ত্রে বশীভূত, জড়, চেতনাহীন জাতি!

কুলি মজুরদের কিন্তু হাসপাতাল আছে! টালির ঘর, নোংরা ছোট ছোট কোঠা, তাতে নেই আলো, নেই স্বচ্ছ নির্ম্মল হাওয়া, বর্ষাতে পড়ে চুণ ধোয়া জল। রোগীদের শোবার মেলে ঠাঁই, বিনা খরচে ওষুধ পত্তরও মেলে। কুলি মজুরদের জন্য 'সেবা' কথা সৃষ্টি হয় নি, তাই এদের কোন অবস্থায় শুশ্রূষা করবার প্রয়োজন হয় না। ডাক্তার সাহেব খুশীমত চোখ বুলালেন—কম্পাউণ্ডার সুবিধে মত দেখাশোনা করে। রোগীর পথ্য হাসপাতাল থেকে দেওয়া হয় না, রোগীর অশিক্ষিত আত্মীয়স্বজন খেয়াল মত লুকিয়ে অপথ্য, কুপথ্য রোগীকে খাওয়ায়।

ছটায় আবার কলের বাঁশী বাজে। কুলি মজুররা হুড়মুড় করে গুদামখানা থেকে বের হয়ে আসে। গেটে দারোয়ান থাকে, জামার পকেট, কাপড়ের প্যাঁচ অনুসন্ধান করে দেখে—কোন জিনিষ চুরি গেলো কি-না। এবার চলার গতিতে জোর নেই, স্বাচ্ছন্দ্য নেই, সজীবতা নেই, যুঝিবার শক্তি নেই, দৃঢ় বিজিগীষা নেই, জীবনেচ্ছুও যেন নয়। টলতে টলতে চলে, কথা বলবার মত শক্তি থাকে না। সর্ব্বাঙ্গে কালিধূলি, এটা সেটা কত কি! অসাড় দেহ, রুক্ষ শুকনো মলিন বদন, স্তিমিত নয়নযুগল। কেউ খুঁড়িয়ে চলে, কেউ জখম স্থান চেপে ধরে চলে। চলে, এমনি করেই চলে, চলুক, কোনভাবে বস্তিতে পৌঁছতে পারলেই হলো। ভাবনা দু'দিকেরই। ঘরে ভাবে স্ত্রী ছেলেমেয়ে, আশায় আশায় আসার পথপানে চেয়ে থাকে; কৈ আসে না ত, অসহ্য হয়, তবু আশা রাখে। মিলে বসে ভাবে শ্রমিক, থামবার উপায় নেই, চালাতে হবে, অপ্রতিহত গতিতে চলতে হবে, মজুরী নিতে হবে ··থেমে আসে গতি, ঝিমিয়ে আসে নয়ন—ঘরের কথা হঠাৎ এসে মনকে চাবুক মারে, তাই আবার পূর্ণ গতিতে চলে।···

কুলি মজুরদের গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত সকল ঋতুই সমান। দুঃখ, কষ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। রোগ একটা না একটা লেগেই আছে, গ্রীষ্মে সানষ্ট্রোক্ (Sun or heat stroke), মেনইন্‌জাইটিজ (meningitis), কলেরা, প্লেগ; বর্ষাতে কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, বহুরূপী জ্বর; শীত কালটা একটু ভাল যায়—তবে বসন্ত, রক্ত আমাশয় নিষ্কৃতি দেয় না, যক্ষ্মা রোগ ত ঘরে ঘরে আছে।

গ্রীষ্মকালে জল নেই, সব পুড়ে যেতে থাকে, ঝাঁ ঝাঁ করা আগুনের হলকা চারিদিকে হোলী খেলে। কোন কোন স্থানের রাস্তায় বেরোমিটারে ১২০ ডিগ্রি টেম্‌পারেচার ওঠে, পিচের রাস্তাগুলি যেন উনুন। এই রাস্তার ওপর মানুষই কাজ করে। একদল বদ্ধঘরে বৈদ্যুতিক পাখার নীচে বসে বাতাস খায়, জলে সিক্ত খস্‌খসের ভেতরে গরম হাওয়া ঢুকে বাবুদের গায় শীতল হাওয়া দেয়, অপর দল উনুন তুল্য রাস্তায় বোঝা বয়ে চলে। অবশ্য কুলি মজুরদের জন্ম এরি জন্য, ওদের সব সয়ে যায়। কয়লা কাঠের জন্ম ভস্মীভূত হ'বার জন্য, কাঠের ধীরে ধীরে পুড়ে যাওয়া সয়! কাঠের যদি ভাষা থাকত তবে বলতো এই সয়ে যাওয়াটা কি? কেন অসহনীয় বাস্তবে সহনীয় হয়!! বর্ষাকালটা আরো ভয়ঙ্কর। কুলি-মজুর পাড়ার চারিদিকে বন জঙ্গলে

অপরিষ্কার ডোবা। কাঁচা রাস্তায় হাঁটু পর্য্যন্ত জলকাদা জমে। বাড়ীর ঘর-দোরে আশে পাশে যাবতীয় আবর্জ্জনা জমে—পচে নরকতুল্য করে তোলে। আবাল বৃদ্ধ নর-নারীর পাইখানা নেই; সাঁজের আঁধারে পুরুষ রমণী খোলা মাঠে ঝোপের আড়ালে পাইখানার কাজ চালায়। এদের লজ্জা-সরম শুধু অবস্থা বিশেষে। দুর্গন্ধ, অতি দুর্গন্ধ, হাড়-পচা, চামড়া-পচা, জীবজন্তু-পচা—কত কি পচে ভয়াবহ করে রাখে! মুক্ত স্বাধীন বাতাস সঙ্কুচিত হয়ে যায়, জমে যায়, থেমে যায়; এখানে সেখানে মরণ বীজাণু; বাতাসের প্রতি স্তরে বিষাক্ত বিষ ছড়িয়ে বেড়ায় রোগ-বীজাণু! কুকুর, বেড়াল, গরু কত কি বস্তির ধারে, বস্তির বুকের ওপর মরে থাকে; শিয়াল গৃধিনী এসে আরো ভয়াবহ বিকট রূপ গড়ে তোলে। খোলার ঘর, মাটির দেয়াল, অবিরাম বর্ষার জল পড়ছে, নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে না, কাপড়-চোপড় বালিস, কাঁথা, ছেলে-পিলেকে নিয়ে জড় হয়ে বসে থাকে; এক কোণ থেকে অন্য কোণে যায়। শীতে কাঁপে, করুণ নয়নে ঊর্দ্ধে তাকায়। শীতকালে শীতের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না, ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখবার খরচ কি করে যোগাবে! তবে মিলের কুলি বস্তিগুলি একটু ভাল, অত মারাত্মক নয়, যেমন শহরের বাইরের বস্তিগুলি।

(৭)

কানাই মিলের কাজ একেবারে ছেড়ে দিয়ে গঙ্গাবতীর বাড়ীতে এসে স্থান নিলে। কোথায়ও মজুরী খাটে না, গঙ্গাবতীর রোজগারের ওপর জীবন চালাতে আরম্ভ করলে। গতর খাটাবার প্রবৃত্তি আর নেই। জানে, ভাল করে বুঝেও যে গঙ্গাবতী নিজের জন্য না হোক অন্তত সন্তানের জন্য গতরে খেটে রোজগার করবে, অতএব তার বিনা পরিশ্রমে দু'বেলা আহার যুটবেই। এত অধঃপতনে গিয়েছে যে কারো উপদেশ মানবে না, শুনবে না, চটে উঠে পাঁচ কথা শুনিয়ে দেয়; স্ত্রী যদি কোন কথা বলে তবে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, এমনি ভাবে দাঁত খিঁচিয়ে বকাবকি করে যে ভয় হয়—আর একটি কথার প্রতিবাদ করলেই মারধর আরম্ভ করবে। দারিদ্র্যের কশাঘাতে গঙ্গাবতী চুপ করে থাকতে পারে না, স্বামীকে বোঝাতে চায়, চোখে আঙ্গুল দিয়ে অভাব অভিযোগ দেখিয়ে দেয়, বোঝাতে চেষ্টা করে—স্বামী বুঝতে চায় না, স্বামিত্বের দাবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, আস্ফালন করে। গঙ্গাবতী থামে না স্ত্রীর কর্ত্তব্য হতে, প্রাণপণে অতীত সুখের ইতিহাস নয়নের পাশে এনে স্তরে স্তরে সাজায়, হৃদয়ের দুর্ব্বল তন্ত্রীতে মৃদু ঘা দিয়ে মূর্চ্ছনা জাগাতে চায়, দেখিয়ে দিতে চায় অতীত ও বর্ত্তমানের ব্যবধান, পরিবর্ত্তন, ভবিষ্যতের বিভীষিকা—দৃষ্টিহীন নয়ন দেখতে পারে না, পাষাণে গড়া হৃদয়-দোর খুলে না।

এমনি ভাবে বেশীদিন চললো না। সংসার অচল, আর জোর জবরদস্তি করেও সংসারের খরচ চলে না। অনাহারে, অখাদ্যে ছেলেপিলে সব রুগ্ন হয়ে যাচ্ছে, ক্রমাগত অসুখবিসুখে সব জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছে; অসুখবিসুখ বাড়ীতে লেগেই আছে। ছেলেপিলেগুলি মরণ-পথে এগিয়ে চলেছে; কানাইর কোন চৈতন্য নেই। সে সংসারের কোন ধার ধারে না। আসে, যায়, দু'বেলা পেট ভরে খায়, আপন মনে ঘুমায়, ঝগড়াঝাটি করে, রাগের মাথায় সব্বাইকে মারধর করে, জোর করে গঙ্গাবতীর রোজগারের টাকা নিয়ে মদ খায়, কুপল্লীতে আমোদ করে। বেকার হয়ে স্ত্রীর কষ্টার্জ্জিত টাকায় জীবন চালিয়ে, জোর জবরদস্তি করে—টাকা ছিনিয়ে নিয়ে কুপল্লীতে কুৎসিত আমোদ আহ্লাদ করতে একটুকুও দ্বিধাবোধ করে না, লজ্জা-বোধ করে না। অভুক্ত ছেলেমেয়ের, স্ত্রীর মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে বলে একটু সঙ্কোচ বোধ করে না। চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছে যে, স্ত্রী প্রাণপণ খেটে সংসার চালাচ্ছে, এত পরিশ্রম করছে শুধু সন্তানদের বাঁচাবার জন্য—আর সে পুরুষ হয়ে, পিতা হয়ে, স্বামী হয়ে, সক্ষম, বলিষ্ঠ যুবক হয়ে—সন্তানদের ওপর করছে অত্যাচার, স্ত্রীর ওপর করছে নির্ম্মম অত্যাচার অবিচার। এতে তার পুরুষত্বে ঘা পড়ে না; মনুষত্বে বাজে না, বরঞ্চ আনন্দিত হয়। গঙ্গাবতী পারে না, নারী দেহ ও মন নিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না, দেহ গুরু-পরিশ্রমে এলে পড়ে, বুকে ব্যথা বাজে, পারে না সময় মত সন্তানদের মুখে খাবার দিতে, যাও দেয় তাতে সন্তানদের পেট ভরে না—তাই মাথা ঠুকে স্বামী-দেবতার চরণে—মিনতি করে চোখ-ফাটা অশ্রুজলে। কানাই লাথি মেরে সরে যায়, এতেও প্রতিদান দেওয়া হয় না, একটি একটি করে ছিনিয়ে নেয় স্ত্রীর শরীরের যৎসামান্য অলঙ্কার।

একটি একটি করে তিনটি সন্তান মারা গেল—অনাহারে, দুর্ব্বলতায়। কঠিন রোগে মারা গেলে সান্ত্বনা থাকে, মনকে প্রবোধ দেওয়া যায়, অদৃশ্য দেবতার ওপর দোষারোপ করে মনের রুচি অনুসারে অভিযোগ, গালাগাল দিয়ে পাগলা মনকে শান্ত করা যায়। কিন্তু এমন অপমৃত্যুর সান্ত্বনা খুঁজবে কি করে, কোন যুক্তিতে, কোন স্পর্দ্ধায়? জননীর চোখের ওপর একটি নয়, দু'টি নয়, তিনটি সন্তান না খেতে পেয়ে মারা গেল—দড়ির মত শুকিয়ে শুকিয়ে। মাংস ছিল কি-না বুঝা যেতো না, মলিন চামড়ায় ঢাকা কতকগুলি হাড় শুধু ছিল। উঃ! কী ভীষণ সে দৃশ্য! বলেছিল 'ওগো! বাঁচাও আমি যাবো না, থাকবো এই সুন্দর ধরণীর কোলে, থাকবো আমি করুণাময় ভগবানের সাম্যের শ্রেষ্ঠ রাজ্যে। ভগবান এত সুন্দর, এত ঐশ্বর্য্য ভরে পৃথিবী তৈরি করেছেন, জগৎপিতা হয়ে সব্বাইকে প্রীতির চোখে দেখছেন, পালন করছেন, এদেশ ছেড়ে যাবো না'—তারপর চেঁচালে খাবারের জন্য। কে খাবার দিয়েছিল এই অভুক্ত, মৃত্যুমুখী সন্তানদের মুখে। জননী? জননী তখন জীবন উৎসর্গ করে গতর খাটাচ্ছে অর্থের জন্য। পিতা? পিতা তখন কু-পল্লীতে। কেউ দেয় নি, করুণাময় ভগবানও দেন নি, জগতের অসভ্য স্বার্থপর পাষণ্ডগুলিও দেয় নি। কিন্তু গঙ্গাবতী জননী হয়ে কি করে পারলে? জীর্ণ, শীর্ণ, রুগ্ন ছেলেকে আফিম্-গোলা বিষাক্ত দুধ পান করিয়ে এমনি ঘুম পাড়ালে যে, সে ঘুম আর ভাঙ্গলো না। কাজ থেকে সন্ধ্যায় মজুরী হতে ফিরে এলো, খাবার হাতে ছুটে গিয়ে জাগাতে চাইলে সন্তানের ঘুম, অভিমানী আর জাগলে না, আর খেলে না। অভিমানী চিরকালের ঘুম ঘুমিয়ে মার গতর খাটাবার সুবিধে করে দিলে! অপর দু'টি সন্তান দুর্ব্বল, রুগ্ন শরীরে রীতিমত খাদ্য খেতে না পেয়ে, আফিম্ সেবনে ধীরে ধীরে জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলে, তারপর একদিন করুণাময় ভগবানের মহত্ত্ব বুঝতে পেরে—তাঁর শ্রেষ্ঠ জগত থেকে বিদায় নিলে, শ্রেষ্ঠ জীব মানব জাতিকে অভিশাপ দিতে দিতে। আমি জানি—ওরা প্রাণপণ চেষ্টা করবে—মৃত্যুর পর যদি অন্য কোথাও আশ্রয় নিতে হয়, তবে ভগবানের অধীন রাজ্যের ত্রিসীমানার ধার দিয়েও যাবে না। আপনাদের যদি হৃদয় থাকে তবে আপনারা অন্তত দুঃখ করুন বা না করুন—ওদের উপদেশ দেবেন না যে, ভগবানের রাজ্যে আশ্রয় নিতে—এ আমার বিশ্বাস আছে; বিশেষতঃ যেখানে ভগবানের অন্ধবিশ্বাস ভিন্ন অস্তিত্ব নেই এবং সভ্য ও অসভ্য, মানব ও মহামানবের বাস।...

হায় জননী! এর পরও কি তুমি বাঁচবে, হাসি কান্না নিয়ে সংসার করবে? তোমার হৃদয় কি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় নি? তোমার মাথা কি এখন ঠিক আছে, মাথার কল কি এত বড় আঘাতেও বিকল হয়ে যায় নি? তোমার বুকে যে অগ্নিগিরি সৃষ্টি হয়েছে—তারপরও বাঁচবে কি করে? আরও একটি মেয়ে আছে, শেষ সম্বলকেও কি মহাপ্রস্থানের পথে এগিয়ে দেবার জন্য তৈরি কচ্ছো?

কানাইএর হলো মহাস্ফূর্ত্তি? একটি একটি করে সন্তান মরে—আর কানাইএর আনন্দ যায় আরো বেড়ে। সংসারের খরচ কমে যাবে, অতএব তার সেচ্ছাচারিতা করবার পক্ষে মহা-সুযোগ। যে আয়ে ছ'জনের খরচ চলতো সেখানে মাত্র বাকি আছে তিনজন, রোগীর পথ্যও যোগাতে হবে না, তারপর আর একটিও যাবার মুখে, এটি গেলেই সব শেষ। তখন স্বামী স্ত্রী। গঙ্গাবতী যা রোজগার করবে, তাতে বেশ দিন চলে যাবে। বাকি সন্তানটা গেলেই হয়, আপদ মরেও না! কানাই শেষ সন্তানটির শীঘ্র মরণ কামনা করে। এদিকে গঙ্গাবতী তিনটি সন্তান হারিয়ে বড় কঠিন হয়ে গেছে। স্বামীর সঙ্গে একটি কথার আদান-প্রদান করে না, স্বামী আসে যায় কোন ভ্রূক্ষেপ করে না, নীরবে কাঁদে, অশ্রু দর্ দর্ বেগে ঝরে, মলিন আঁচলে অতি দুঃখের অশ্রুগুলি মুছে ফেলে। অশ্রু মুছে মুছে হায়রাণ হয়ে পড়ে, অশ্রুর ওপর হাত দেয় না, ছেড়ে দেয় আপন মনে বইতে। স্বামী আসে, খাবার চাইলে খেতে দেয়, যদি খাবার না থাকে তবে চুপ করে থাকে, স্বামীর নির্ম্মম গালাগালি ও অত্যাচারের কোন প্রতিবাদ করে না; এখন আর পূর্ব্বের মত পাড়াপড়শীর নিকট ধার করে আটা, ছাতু এনে স্বামীদেবতাকে ভোজন করিয়ে পুণ্য করে না। খাবার থাকলে খেতে দেয়, না থাকলে দেয় না; নির্জ্জীবের মত কোলের শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকে। দিন-মজুরের মত যে দিন ইচ্ছা কাজে যায়, মজুরী আনে; হাতে পয়সা থাকলে কাজে

যায় না, দিনরাত সন্তানকে কোলে নিয়ে ভাবে—ভাবতে ভাবতে কখনো কাঁদে, কখনো শিহরে উঠে, কখনো রোষবহ্নিতে উদীপ্ত হয়ে উঠে। দিন দিন যেন অশ্রু শুকিয়ে যাচ্ছে; ভাবনায় প্রাণ হাঁপিয়ে উঠে, নির্ম্মম জ্বালা প্রকাশ করতে পারে না, পুরুষের মত জ্বালা, হাহাকার বুকে চেপে গাম্ভীর্য্যের মুখোস পরে অস্থির হয়ে পড়ে, প্রাণভরে অভিশাপ দিতে পারে না, চেঁচিয়ে কাঁদতে পারে না, কান্না পায়, খুব বেশীই কান্না পায়, কিন্তু কাঁদতে পারে না। দিন কারো বসে থাকে না, কেউ বসেও থাকতে পারে না দিনের জন্য—একদিন, দু'দিন—কিছুদিন চলতে পারে, বেশী দিন চলে না। থেমে থাকা যায় না, চলতেই হয় চলতি জগতে। গঙ্গাবতীকে আবার উঠতে হল, আবার রীতিমত সংসারে নামতে হল, নিয়ম মত মিলে যেতে হল। টাকা রোজগার করতে হবে, ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রেখে সাবধানে চলতে হবে। একটি মাত্র অবশিষ্ট সন্তান—তাকে সুখী করতে হবে, বাঁচাতে হবে, ঝড়োঝঞ্ঝার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। গঙ্গাবতী নিজের দেহের প্রতি বেশী দিন অত্যাচার করতে পারলে না, নিজেকে জোর করে খাওয়াতে হচ্ছে—মুখে খাবার উঠতে চায় না, মুখের গ্রাস পড়ে যায়, হু হু করে অশ্রু আসে মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দেখে, তবু সয়ে সয়ে খেতে হচ্ছে। কর্ম্মপ্রেরণা জাগাতে হচ্ছে জড় মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে।

সন্তানগুলির মৃত্যুতে কানাই মহা প্রফুল্ল হয়েছিল। কিন্তু গঙ্গাবতীর হিমালয় সদৃশ উদাসীনতায় রীতিমত ভড়কে গেল। তার আশা যে নির্ম্মূল হয়—গঙ্গাবতী পুত্রশোকে দিন কতক কান্না-কাটি করে আবার সকলের মত সংসার করুক, শেষ সন্তানকে নিয়ে আমোদ করুক, পাড়াপড়সীর সঙ্গে গল্প-গুজব করে বেড়াক; খুশী হোক বা না হোক, আমোদ আহ্লাদ করুক বা না করুক, কানাইর তাতে কিছু মাত্র আসে যায় না। কিন্তু গঙ্গাবতীর গতর খাটাতে না যাওয়া যে ভীষণ ব্যাপার। গঙ্গাবতী রোজগার না করলে যে তার মহা ক্ষতি; অনুনয়, বিনয় করে প্রেমের ভান করে টাকা না আদায় করতে পারুক, জোর করে ছলনা করে ত' টাকা নিতে পারতো! পূর্ব্বে যদিও স্ত্রীর অনুরোধে কাতর প্রার্থনায় চটে উঠে বলতো—টাকা নেই, আটা ছাতু কেনা যাচ্ছে না, আমি করবো কি? সাধ করে গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলে জন্মিয়েছো, এখন পার তো খাওয়াও, না পারো গলা টিপে শেষ করে দাও। আপদ মরলেই তো বাঁচা যায়। সন্তান কে চায়? আটকানো যায় না—হয়ে পড়ে। রাক্ষস-গুলি খেয়ে খেয়ে সব শেষ করে দিলে। তবু গঙ্গাবতীর রোজগারের টাকা ছল চাতুরী জোর করে নিতে পারতো; এখন যে ছেলে-পিলেগুলি মরে গিয়ে মহা সর্ব্বনাশ করে ফেলেছে, খরচ যদিও কমেছে কিন্তু টাকা যে আর আসে না। এদের শোকে গঙ্গাবতী মিলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। মিলের লোকগুলি সাধারণত খুব খারাপ—কিন্তু গঙ্গাবতীকে চাকরী যাবার ভয় দেখিয়ে শাসালে না, মিলে যেতে আদেশ দিলে না। দরদ দেখে কানাইএর হাড় জ্বলে। কানাই গঙ্গাবতীর বিসদৃশ হাবভাবে বড় বিপন্ন হয়ে পড়লে—যদিও সে গঙ্গাবতীর জন্য একটুও দরদের, প্রেমের, অতীত দাম্পত্য জীবনের কিঞ্চিৎ আকর্ষণ অনুভব করে না—তবু এমার করতে হল। সত্যকার আকর্ষণ নয়, প্রাণের অনুভূতি নয়, গঙ্গাবতীর রূপ, যৌবন, নারী দেহের জন্যও নয়, ছলনা—বদমায়েসী। কানাইএর গঙ্গাবতীর দেহের ওপর লোভ নেই, যদি একটু থাকতো তবে অত অত্যাচার করতে পারতো না, স্বার্থের জন্য অন্ততঃ তোষামোদ করতো। চরিত্রহীন, মাতাল পুরুষ মানুষ অতি সুন্দরী স্ত্রীর আকর্ষণে ভুলে না, বিশেষতঃ যে স্ত্রী নিরীহ, সাধ্বী, সতী। তারা বুঝতে পারে, কার্য্যক্ষেত্রে দেখতে পায়, যে স্ত্রীর দেহ পেতে কোন বাধা আসে না, জোর অত্যাচার চলতে পারে, যে ভাবে ইচ্ছা চালানো যায়, ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায়, অপেক্ষা করতে হয় না; কষ্ট করতে হয় না। অবলা নারী! পুরুষ যে ভাবে চালায় সেই ভাবে চলতেই বাধ্য। প্রগতি যুগের নারীরা আপত্তি করতে পারেন যে গঙ্গাবতীর মত স্বাবলম্বী তেজস্বী স্বাধীন নারীকে দুর্বৃত্ত হীন মাতাল কানাই কি করে শুধু নারী-দেহ নিয়ে ইন্দ্রিয়লালসা পূরণ করে। হয়, হচ্ছেও অনাদি কাল থেকে। শরৎ চ্যাটার্জ্জি যতদিন থেকে কলম ধরেছেন তারপর থেকে এ সব কথা আর না লিখলেও চলে। নারীর বন্ধু, হিতাকাঙ্ক্ষী, পথ-প্রদর্শক—তাঁর মত আর কেউ আছেন কিনা আমার জানা নেই। 'নারীর মূল্য' স্বার্থের খাতিরে এক শত ভাল পুস্তকের তালিকায় স্থান না পেতে পারে, কিন্তু নারীদের নিকট যে শ্রেষ্ঠ পুস্তক—তা কি অস্বীকার করা চলে?

কানাই স্বার্থের খাতিরে দরদী হল, কৃত অপরাধের জন্য পাপের জন্য অনুতপ্ত হল। কাঁদার ভাণ করে স্ত্রীর চোখের জল মুছিয়ে দিলে। গঙ্গাবতী দুর্ব্বৃত্তের ছলনায় ভুলে গেল, অনুতপ্ত স্বামীকে ক্ষমা করে পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে চোখের জলে হৃদয়ের ভারী বোঝা নামালে।···গঙ্গাবতী বড় আশা করে আবার ভাঙ্গা ঘর যোড়া দিলে। যদিও সে যোড়া দিতে বাধ্য হতো, মাতৃত্ব তাকে সংসারে নামাতে বাধ্য করতো; কি করে যে সে পাকা সংসারী হয়ে যেতো তা বুঝতেও পারতো না; কিন্তু স্বামীকে লাভ করে নিজেই আবার সংসারে নামলে। চির-বিষাদ-করুণ মুখে যদিও হাসি আর ফুটে না, তবু যেন একটু আশার ছায়াপাতে বিষাদ-করুণ মুখখানাকে বেশ সুন্দর করে তুললে। ধীরে ধীরে মৃত সন্তানের পিছে দিয়ে দেওয়া জীবনীশক্তি, মনের সজীবতা, কার্য্য-ক্ষমতা, জিজীবিষা ফিরিয়ে আনতে লাগলে; জড়তা, ক্লীবত্ব দূর হতে লাগলো। রীতিমত সংসারী হল, দৈব ঘাতপ্রতিঘাতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য, ঠেকিয়ে রাখবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো। তাকে বাঁচতে হবে, স্বামীকে আবার মানুষ করতে হবে, মেয়েকে রক্ষা করতে হবে, মাতা পিতার স্নেহে বড় করে ভাল ঘরে বিয়ে দিতে হবে, তবে না তার ছুটি, মুক্তি, বিদায় নেবার সময় হবে। দুনিয়াতে যে তার মস্ত বড় কাজ রয়ে গেছে। স্ত্রী সে, বিধবা নয়, কুমারী নয়, কন্যার জননী; স্বামী ফিরে এসেছে, মস্ত বড় বোঝা তার মাথায়! সে জননী! মাতৃত্ব ত' ছেলে-খেলা নয়, মেয়ে বড় হবে—আসন্ন যুবতী মেয়েকে কুলোকের হাত থেকে, কুনজর থেকে রক্ষা করতে হবে, ভাল করে বিয়ে দিতে হবে, একি সহজ কথা! যারা চলে গেছে—যে অবস্থায়ই যাক—বাস্তবপক্ষে যখন চলে গেছে, তাদের শোকে ত' যে আছে তাকে মারতে পারে না, যেমনি হোক বাঁচাতে হবেই! মন ত' মানে না—প্রাণ উঠে কেঁদে, শক্তি ফেলে হারিয়ে, হাতের কাজ যায় তলিয়ে। উঃ! একটি একটি করে তিনটি সন্তান গেল জনমের মত চলে; ফাঁকি দিয়ে নয়, লুকিয়ে নয়, জোর করে নয়, নিয়তির ডাকে নয়, কালের ক্রুর অভিশাপে নয়, স্রোতে ভেসে চলে গেল চোখের ওপর দিয়ে; তারা তো যেতে চায় নি, কাল প্রহরী ত' মৃত্যু দণ্ড নিয়ে হানা দেয় নি, তারা ত' স্পষ্ট ধরে রাখবার জন্য কেঁদে খুন হয়েছিলো, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ধরে রাখবার পথ বলে দিয়েছিল বারবার, সতত। সেই তো জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছে, মৃত্যু দূতকে অভিনন্দন দিয়ে ডেকে এনেছে। অনাহারে তিনটি সন্তান শুকিয়ে মরলো। এ 'ত' জমিদার বাবুর বাড়ী। সারা বাড়ীময় হাহাকার অভাব। একটি পুত্রমুখ দেখবার জন্য কত হাজার হাজার টাকা উৎসর্গ করছে—পায় নি, তারপর টাকা দিয়ে কিনে আনে পরের ছেলে! নিজের রক্তে গড়া সন্তান—আর পরের সন্তান! আকাশ পাতাল ব্যবধান! আর সে চারটি সন্তান পেয়ে তিনটিকে হত্যা করলে! যার সন্তান নেই সে কত তপস্যা করে সন্তানের জন্য, কত দুঃখে বলে অমুকের অতগুলি সন্তানকে খাওয়াতে পারে না; সন্তান আর চায় না; আর আমার একটি হয় না!' দীর্ঘনিঃশ্বাস কেবলি ক্ষণে ক্ষণে পড়ে।

কানাই ভাল মানুষ সেজে দু'দিনে হাঁপিয়ে উঠলো। মদ খেতে পাচ্ছে না; চরিত্রহীন মাতাল বন্ধুদের সঙ্গে বারবনিতা গৃহে গিয়ে আমোদ করতে পাচ্ছে না। বন্ধুরা রোজই ডাকতে আসে, সে অর্থের অভাবে তাদের দলে যেতে পারছে না। কানাই প্রথম প্রথম গঙ্গাবতীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য গতরে খেটে রোজগারের টাকা এনে দিতো; যখন দেখলে গঙ্গাবতী তার ছলনায় ভুলে গেছে, তাকে পূর্ব্বের মত আদর যত্ন করছে, ভালবাসছে, দাম্পত্য জীবনের মাঝে যে দুষ্টগ্রহের আবির্ভাব হয়েছিল তার স্মৃতি—তার হৃদয়-বিদারক গভীর ক্ষতচিহ্নগুলি ভুলে যেতে চেষ্টা করছে—এমনি সুযোগে কানাই আবার বেঁকে বসলে। কাজে যাবার ভাণ করে বন্ধুদের মজলিসে যায়, মদ খেয়ে মাতাল হয়, রাত্তিরে ঘরে ফিরে। রোজ একটা না একটা নতুন মিছে কথা তৈরি করে বলে। কোন দিন বলে কাজ পায় নি, কোন দিন বলে এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়েছিল; কি এক ওজুহাতে মস্ত বড় খাওয়া দাওয়া ছিল—কিছুতেই ছাড়েনি। কোন দিন গম্ভীরভাবে বলে—বোঝা বইতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যায়, বহুক্ষণ অচেতন ছিল। এমনি ভাবে গা মোচড় দিয়ে কাতর শব্দ করে যে, গঙ্গাবতী করুণ নয়ন তুলে খুঁটে খুঁটে সব কথা জিজ্ঞেস করে, কোমল হাতে গা টিপে দেয়।

এমনি ভাবে দিন চললো ওদের। গঙ্গাবতী যদিও কানাইএর চাতুরী ক্রমে ভাল করে বুঝতে পারলে—তবু কোন প্রতিকারের চেষ্টা করতে পারলে না। কানাই প্রতিকারের

বাইরে চলে গেছে। অর্থের অভাবে বাধ্য হয়েছিলো ভাল মানুষ সাজতে, যখন অর্থের আমদানী হল—তখন আবার কুপথে নেমে গেলো। গঙ্গাবতী কি প্রতিকার করতে পারে? কোন যাদুমন্ত্রে কানাইকে ভাল করতে পারে? কানাই পাষাণের চেয়ে দৃঢ়, পশুর চেয়ে হিংস্র, বাতাসের চেয়ে চঞ্চল, পিশাচের চেয়ে হীন, অসুরের চেয়ে দুর্বৃত্ত, মাতালের অধম, পশুর চেয়ে কামুক। পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদবে? কানাই বধির, চেতনাবিহীন। মান অভিমানের পালা সুরু করবে? এদের জন্য মান অভিমান সৃষ্টি হয় নি। বিবাহিত জীবনের সুরুতে যে নির্ম্মল, গভীর প্রেমের সূচনা হয়েছিল তা ভুলে গেছে, অনুভূতির বাইরে। নারীদেহ শুধু নারী দেহ বলে পরিচয় দেবে না? গঙ্গাবতী নারী মাত্র, অবলা, স্ত্রী, সংস্কার-বদ্ধ; কানাই চূড়ান্ত মাতাল, শক্তিশালী পুরুষ, স্বামীর দাবী লালসার দিক থেকে পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখতে ভাল করে জানে। নরবলি দিয়ে পূজো দেবে? একটি নয় তিনটি সন্তানকে দিয়েছে। নিজেকে উৎসর্গ করবে ফাঁসির গ্রন্থিতে? নিজের উত্তপ্ত, জ্বালাপোড়া রক্তের ফোয়ারায় স্নাত করে দেবে! তাই দেবে! স্বামীর কল্যাণে আত্মহত্যা! তাই করবে। না-না-না? সে ত পারে না, শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। সে যে জননী। বক্ষে জড়িয়ে আছে যে সন্তান। বারেবারে কেঁদে উঠে 'মা! মা!' বলে।···

গঙ্গাবতী ভাল করেই বুঝতে পারলে—বৃথা তার জীবন-যৌবন, আশা ভরসা, সুখশান্তি, ব্যর্থই হল মনুষ্য জীবন। মনুষ্য-জন্ম না হলে হয়তো ভালই হতো, কে জানে, কে বুঝে পশুপক্ষীর ভাষা, ওরা শাসন করে না অপর জাতকে, —সর্দ্দারী করে না ঠিক, কিন্তু আত্মদাহ যে না আছে কে বলতে পারে? সন্তান-সুখ কে ছিনাতে পারে—ওদের সমাজ নেই, কিন্তু মাতা-সন্তানের সম্পর্ক কত সুন্দর, কত বড় অচ্ছেদ্য। হোক না ক্ষণস্থায়ী, মানুষের মত ত' মানুষের বুক থেকে সন্তান ছিনিয়ে নেয় না, স্বামী ছিনিয়ে নেয় না, স্বামী ত' স্ত্রীর বুকে কাঁটা হয়ে সারা জীবন জ্বালায় না। গঙ্গাবতী জীবতত্ত্ব জানে না, তাই অন্য জীব হতে চায়। কেন চাইবে না—চাওয়াটাই ত' স্বাভাবিক। চিন্তিত মুখে যখন ঐ বিশাল বট গাছটায় তাকায়--দেখে কত পাখীর নীড়। যে যাহার মত আছে। স্ত্রীপাখী সংসার দেখে, সন্তানকে রক্ষা করে, পুরুষ পাখী রোজগার করতে বের হয়। ঐ গাছটায় কত পাখীর নীড় ডালে ডালে, কৈ পাড়াপড়্সীর সঙ্গে ত' দ্বন্দ্ব হয় না; সামাজিক ব্যভিচার নেই, কুৎসাও নেই, দারিদ্র্যে কেউ সাহায্য করে বলে মনে হয় না, কিন্তু শত্রু এলে সব্বাই দল বেঁধে শত্রুর সঙ্গে যুঝে। না অনেক পাখী ত' অপরকে খাদ্য দেয়, যেখানে খাবার প্রচুর পরিমাণ থাকে পাখীর দলকে সংবাদ দেয়। মানুষ এমন করে না কেন? গঙ্গাবতী ভাবে, রাজ্যের কথা ভাবে, যুক্তি তর্কে বিচার করতে চায়, অবশেষে মনুষ্যজন্মের জন্য ধিক্কার দেয়। নিজের কথা ভাবতে ভাবতে অপরের কথায় যায়, বিভ্রান্ত হয়, ঘুরে ফিরে আবার নিজের কথায় আসে। তার জীবনে আর চাঁদ হাসবে না, জোছনার স্নিগ্ধ আলো তার গায়ের ওপর এলিয়ে পড়বে না. রজনীর হান্নাহানা, রজনীগন্ধা গভীর রাতে বিকসিত হয়ে চুপি চুপি প্রিয়াকে ডেকে অভিসারের কথা মনে করিয়ে দেবে না; যৌবন মধুমাস কোকিল জড়িত হয়ে মাতাল মূর্চ্ছনা জাগাবে না; সে কাল ফুরিয়ে গেছে তার, অকালে ঝরে গেছে। সে যে নারী, দাম্পত্য জীবনটাকে স্বর্গীয়, দেবতার আশীর্ব্বাদ বলে জেনে এসেছে—বাস্তবে অভিশাপ বলে মানবে কেন? যদিও মানতে বাধ্য হচ্ছে তবু স্বীকার করবে কি নিয়মে, বিদ্রোহ যে জাগে? না মানতে চায়, না মানুক, কিন্তু বিদ্রোহ যখন পদে পদে জাগে—সকলি ব্যর্থ, বৃথা, শুধু জ্বালা, কল্পনার মরুমায়া বলে—তখন, তখন কি বলে ভাবতে পারে সেও মানুষ; সেও জীবশ্রেষ্ঠ নর-নারীর একজন?··· মুমূর্ষু রোগী যখন আশা পায় যে সে বাঁচবে, নিশ্চিত মৃত্যুতে একটু সন্দেহ জাগে—তখন তার মুখে হাসি না ফুটলেও, অন্তরালে আশার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ফুটন্ত হাসির চেয়ে পাণ্ডুর মুখখানা উজ্জ্বল করে তোলে। কানাইএর প্রত্যাবর্ত্তন গঙ্গাবতীর সারাদেহ মনপ্রাণ আশার আলোকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল; আসন্ন বিবাহের বাঁধনে বাঁধা পড়বার মুখে যেমনি যুবতী নারী উত্তেজিত (excited) হয় তেমনি উত্তেজিত হয়েছিল—মুহূর্ত্তে, অতি সংক্ষেপে, সূচনাতেই আবার মিলিয়ে গেল। বাতি নিভবার পূর্ব্বে যে উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

গঙ্গাবতী মিলে কাজ করতে যায়, রোজগারের টাকা হাতে রাখে না, বাজার সদা ক'রে বাড়ীতে আনে।

কানাই টাকা চায়, গঙ্গাবতী কোন উত্তর দেয় না; কানাই চুপি চুপি সারা ঘর দোর কোণ কোণাচ খুঁজে, জিনিষ-পত্তর হাতড়ায়, কোথাও একটি পয়সা বের করতে পারে না। ছল চাতুরী করে, ভয় দেখায়, জোর জবরদস্তি করে, কখনো টাকা নিতে সমর্থ হয় না, কখনো ছিনিয়ে নিতে সমর্থ হয় না। গঙ্গাবতী কানাইএর ভয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকে, সর্ব্বদা সতর্ক হয়েও পারে না, কানাই পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। গঙ্গাবতী নারী মাত্র! তাই কানাই যখন কাকুতি মিনতি করে, টাকার জন্য হত্যে দিয়ে পড়ে, 'আজ শেষ, কাল থেকে যদি বদ খেয়াল না ছাড়ি' এই বলে কঠিন প্রতিজ্ঞা করে—যে সে মানুষের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেনি, সে কুকুর, গাধা—যা খুশী বলে বসে, তখন গঙ্গাবতী নিজেকে আর সামলাতে পারে না, মদের টাকা কানাইকে দেয়। এমনি ভাবে রোজ প্রতিজ্ঞা করে—আবার পরদিন কি দু'দিন বাদে আবার টাকা চায়, প্রতিজ্ঞা করে। গঙ্গাবতী বাধ্য হয়ে দৃঢ় হল, কানাইর কথায় কর্ণপাতও করে না। কানাই গঙ্গাবতীর ওপর অত্যাচার আরম্ভ করলে, টাকা চেয়ে যখন পায় না তখন ঘুসি, লাথি, চাবুক, লাঠি যা হাতে যুটে তাই দিয়েই মার চালায়। গঙ্গাবতী নিশ্চল, নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে থেকে অত্যাচার সহ্য করে, একটি কথাও বলে না, একটি পয়সাও দেয় না।

কানাই এতদিন শুধু মদ, বন্ধু, গণিকা নিয়ে মত্ত ছিল, এখন একবারে নিম্নে নামলে। স্ত্রীর ওপর অত্যাচার, জুলুম, ছল চাতুরী করে সুবিধে হচ্ছে না। গঙ্গাবতী রোজগার করে অল্প, তা দিয়ে কায়ক্লিষ্টে সংসার খরচ চালায়, তার ওপর পুত্রশোকে এবং ঠেকে ঠেকে হয়েছে বড় চতুর, ধূর্ত্ত যেন রসশূন্য শুকনো ইক্ষু—হাজার নিষ্পেষিত করলেও এক তিল রস বের হতে চায় না। হতাশ হল না, দমলো না—বন্ধুদের পরামর্শে, শ্যামজীর অনুচরের ইঙ্গিতে ঠিক করলে—স্ত্রীর সুন্দর দেহ দিয়ে রোজগার করবে। মহাস্ফূর্ত্তিতে শ্যামজীর সঙ্গে করলে এক চুক্তি। এমন মহাসুযোগ, সৌভাগ্য হাতে পেয়ে কানাই উঠে পড়ে লাগলে স্ত্রীকে উপঢৌকন দেবার জন্য। শ্যামজীর টাকায় কানাই মদ খায় আর মতলব আঁটে, জল্পনা করে—ঈস্—রাজি করাতে পারলেই পাঁচ শত টাকা নগদ, তার ওপর গঙ্গাবতী শত শত টাকা রোজগার করবে—তখন ত' বড়লোক হয়ে পড়বে। ভয় দেখিয়ে নানা ছলে শ্যামজীর নিকট থেকে কত টাকা আমিই বের করবো! শ্যামজী বড় কঞ্জুস, প্রথম প্রথম বেশ টাকা দেয়, অলঙ্কার দেয়—তার পর রূপ হারালে অলঙ্কারগুলো কেড়ে রাখে; তাড়িয়ে দেয়। শালা—এ চলছে না—আমি বাবা পিছে আছি, গঙ্গাবতী আমার স্ত্রী, আমার চেয়ে পাকা খেলোয়াড়, টাকাটি হাতে দেবে ত' গা ছুঁতে পারবে।·' হঠাৎ ভয় হয়, চম্‌কে উঠে গঙ্গাবতী রাজি হবে কি না; জোর করে—স্বার্থের খাতিরে বলে—রাজি হবে না, কেন রাজরাণী হওয়ার কথা শুনলে রাজি হবে না? ওর গোষ্ঠীশুদ্ধ রাজি হবে। যা মুখে আসে বলে, কিন্তু মাতালের মনেও দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে গঙ্গাবতী—প্রাণ গেলেও রাজি হবে না।

কানাই গঙ্গাবতীকে মারধর করে না, বাড়ী থেকে বেশী বের হয় না, ঘুরে ঘুরে গঙ্গাবতীর সঙ্গে সেধে আলাপ করে। শ্যামজীর নিকট যে টাকা আগামী পেয়েছিল তা থেকে ভাল ভাল খাবার কিনে এনে গঙ্গাবতীকে দেয়, প্রেমের খেলা খেলে জোর করে গঙ্গাবতীকে খাওয়ায়, মেয়ের জন্যে খেলনা কিনে এনে আদর যত্ন করে। গঙ্গাবতীর দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে নানা বিষয় বক্তৃতা দেয় যে—কেউ কারো নয়, বোঝাতে চায় সতীত্ব কিছু নয় সমাজের ফাঁকি গলদ—ঈশ্বর বলে কেউ নেই। থাকলেও তাঁকে অস্বীকার করলে মানুষের কিছু যায় আসে না। গঙ্গাবতী যে সতীত্বের দোহাই দিয়ে অযাচিত সৌভাগ্য পায়ে ঠেলে চলে এলো, কি লাভ হলো? কোন পুণ্য হলো কি, না ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়েছেন? যদি হতেন—তবে তার এত দুঃখ, দুর্দ্দশা, লাঞ্ছনা কেন? ভাল লক্ষণ কি তিনটি সন্তানকে অনাহারে শুকিয়ে মারা?···গঙ্গাবতী কানাইএর হাবভাবে, কথার প্যাঁচে বেশ বুঝতে পারলে যে এবার একটা মস্ত বড় দুর্দ্দশার সৃষ্টি হবে, কানাইএর মনে একটা ভয়ঙ্কর দুষ্ট অভিসন্ধি আছে। বাহিরের প্রলোভনে পড়ে এবার একটা মারাত্মক খেলা খেলবে। গঙ্গাবতী ভবিষ্যতের ভয়ে কানাইকে এড়িয়ে চলে, সর্ব্বদা গম্ভীরভাবে থাকে, কোন কথায় হাঁ বা না বলে না, যেন সে কিছু বুঝেও না, শুনেও না, ভালবাসেও না। কানাই অর্থের মোহে নাছোড়বান্দা হয়ে পিছ ধরে রইলো। গঙ্গাবতীকে সে ভাল করেই জানে, চিনে, তাই আর ছলনা চাতুরীতে রইতে পারলে না, ধৈর্য্যও নাই—সোজা পথে নামলে।

স্বামীর কুপ্রস্তাবে গঙ্গাবতী শিউরে উঠে, ভয়ে জড় সড় হয়ে যায়। নারীত্বের উজ্জ্বল দীপ্তি মলিন হয়, চেতনা নির্জ্জীব হয়, অচেতন হয়, দাম্পত্য-ছবি ভয়াবহ হয়, নির্ম্মম অভিশাপ হয়, দেহ মন শিথিল হয়ে পড়ে। গঙ্গাবতী জড় মনে এই কথাটাই ভাবে—মানুষ পারে কি নিজের স্ত্রীকে লম্পটের কাম অনলে আহুতি দিতে? মানুষের কি এত শক্তি থাকতে পারে?

কানাই পাতালপুরীর মত ভয়ঙ্কর নীরবতায় জ্বলে উঠে, রুক্ষস্বরে বলে 'হ'য়েছে, রাখ্ বাবা! সতীপণা আমার নিকট মারতে হবে না। লোকে চলে পাতায় পাতায়, আমি চলি বাতাসে বাতাসে। কোন শালীকে আমি চিনি নে, বলুক ত' এসে আমার সামনে, দিন ক্ষণ শুদ্ধ বলে দিতে পারি।'

'সকলেই তোমাদের মত চরিত্রহীন নয়, আর হলেই যে আমাকে হতে হবে—' 'রাখ্-রাখ্, আর বক্তিমের কাজ নেই। আমি সব মাগীকে চিনি। বলবো—বলবো নাকি? তোমাকে পাড়ার কোন লোকটা বাকি রেখেছে—' 'চুপ্। নিজেকে দিয়ে সবাইকে বিচার করো না। তুমি চরিত্রহীন, মাতাল, নির্দ্দয়, কিন্তু স্বামী। স্বামী হয়ে অত বড় মিথ্যা কথা বলতে একটু দ্বিধা হয় না!' রাখ্ রাখ্ বাবা! বহু সতী দেখেচি! সতী নিয়েই আমাদের কারবার, এখন হাড়ে ঘুন ধরে গেছে। প্রকাশ্যে গেলে চক্ষুলজ্জা হয়, রাত্তিরে গেলেই হয়। যেমনি করে আমায় ফাঁকি দিয়ে রাতে মজা ক'রো। এ পাড়ার যত সব সতী দেখো—সব্বাই রাত্তিরে অভিসারে গিয়েছেন, এখন তোমার পালা। তুমি বর্ত্তমানে বন্ধ্যা কি-না—রূপ যৌবন উছলে পড়ছে শ্যামজী বলেন; তাই রোজগার খুব বেশী হবে। টাকাকড়ি, দাসদাসী, বাড়ী, অলঙ্কার কত কি? ঈস্—!

গঙ্গাবতীর গায় আগুন জ্বলে উঠে। উপায় নেই, প্রতিকার নেই। কথা কাটাকাটিতে শুধু জঞ্জাল বেড়েই চলে—নোংরা হয় বেশী, নারীত্ব বুকে চেপে ভয়ে ভয়ে সরে পড়ে, টল্‌তে টল্‌তে যায় বহু দূর। কানাই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে—বাবা! আমার চোখে ধূলো! চোখ দেখলে নাড়ী নক্ষত্র পর্য্যন্ত টের পাই। ডুবে ডুবে জল খাওয়া হচ্ছে। শ্যামজী বাড়ী মেরামত করে দেয়, এটা সেটা পাঠায়; আমি অত বোকা নই যে সুন্দরীর মুখে না শুনে বিশ্বাস করবো। সব খবর রাখি, সবই বুঝি। মিছে কেন সাধুগিরি মারা হচ্ছে।'

গঙ্গাবতীর নামে কুৎসা বহুদিন রটেছিল, দিন দিন আরো খারাপ রূপে প্রকাশ্যে ভাসতে লাগল। পূর্ব্বে অলক্ষ্যে নানা গুজব আলোচনা হতো, এখন প্রকাশ্যে সর্ব্বত্র, সর্ব্বস্থানে আলোচনা হয়। এমনি ভাবে এরা কুৎসা আলোচনা করে যে—গঙ্গাবতী যেন বস্তির কলঙ্ক, বস্তির বুকে বসে ব্যভিচার করছে, তার ব্যভিচারে ঘরের মেয়ে-ছেলেরা নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব এর প্রতিকারের প্রয়োজন। এরা এমনি ভাবে গঙ্গাবতীকে কথা শোনায়—যেন এরা সকলি অতি সৎ চরিত্রবান—এ বস্তিতে একটিও অসতী মেয়ে নেই, যারা প্রলোভনে পড়ে পা বাড়িয়েছিল মাত্র বা পা বাড়াতে যাচ্ছিল, সমাজের মাতব্বর নরনারীদের কঠিন শাসনে অসতী হতে পারে নি; মাঝে মাঝে ভাত দেখায় যে শ্যামজীকে ওরা আর মানবে না, চুলের মুঠি ধরে গঙ্গাবতীকে বস্তি থেকে তাড়িয়ে দেবে, বস্তির বাজায় বাসা বেঁধে পাপ ব্যবসা করতে দেবে না।

গঙ্গাবতীর নামে কুৎসা এত অশ্লীল হতো না, বস্তির দুষ্টলোকদের ও অসতী নারীদের মনেপ্রাণে গঙ্গাবতী জীবন মরণ সমস্যার মত হয়ে উঠতো না। এক বস্তির অসতী নারীরা নিজের কলঙ্ক পুরাণো করবার জন্য অপরের কলঙ্ক খোঁজে, তার ওপর গঙ্গাবতীর ওপর শ্যামজীর মত টাকাওয়ালা লোকের নজর পড়াতে হিংসা হলো খুব বেশী; এতদিন আত্মদাহের মত জ্বালা গোপনে বলাবলি করতো—এখন কানাইএর সাহায্য পেয়ে বেশ সুযোগ ও জোর পেলে। এসবের একটা মজা—যে গুজব খুব ভাল করে রটে, লোকে এমনি ভাবে বলাবলি করে যেন বক্তা প্রত্যক্ষদর্শী, কিন্তু যখনি জিজ্ঞাসা করা হয়—সে নিজে দেখেছে কি-না বা শুনেছে কি-না—তখনি বল্‌বে যে সে দেখেনি বা শুনেনি—তবে ওমুকের নিকট শুনেছে। ওমুককে জিজ্ঞেস করলে সেও অপর একজনের নাম বলে, কেউ প্রত্যক্ষদর্শী হয় না, বিশেষতঃ যেখানে একটু ভয়ের কারণ থাকে। আরো একটু মজা যে চালাকচতুর লোকরা বোকা লোকদের মুখ দিয়ে এসব কুৎসা রটায়, এরাও তোষামোদে সন্দেহকে নিশ্চয় সত্য বলে লোকের নিকট বলে।

কানাই গম্ভীরভাবে লোকের নিকট বলে বেড়ায় যে, সে নিজে গঙ্গাবতীকে শ্যামজীর বাগান-বাড়ীতে দেখেছে। প্রায় রাত্তিরে শ্যামজীর মোটর আসে, গঙ্গাবতী লুকিয়ে পালিয়ে যায়, আবার শেষ রাত্তিরে বাড়ী ফেরে। যেদিন সে বাড়ী থাকে না, শেষ রাত্রের দিকে ঘরে ফিরে দেখেছে—তার শয্যায় শ্যামজী ও গঙ্গাবতী আমোদে নিশি কাটাচ্ছে, এই নিয়ে কত ঝগড়া। শ্যামজী এর জন্য তাকে টাকা দিয়েছিলেন। সে বাধা দেয় বলেই তার সঙ্গে গঙ্গাবতীর রাত্তির দিন ঝগড়া বিবাদ হয়। গঙ্গাবতী নাকি শিগ্‌গিরই শ্যামজীর কেনা নতুন বাড়ীতে চলে যাবে, একটা মোটর গাড়ী পাবে, টাকা পয়সার ত' কথাই নেই।···

কানাই দুর্ণাম করে—মাতাল হয়ে, ক্রুদ্ধ হয়ে, পাষণ্ড চরিত্রহীন বলে নয় শুধু, তার একটা গূঢ় কূট অভিসন্ধি আছে। অসতী বলতে বলতে, সমস্ত লোকের নিকট থেকে নির্য্যাতন, অপমান পেতে পেতে একদিন আপনি বাধ্য হবে—মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রকাশ করতে। পাগল করা জ্বালাতনে কতদিন সতী রইতে পারবে, ধিক্কারে স্বেচ্ছায় অসতীর পথ নেবে—আত্ম-সমর্পণ করতেই হবে। আত্ম-সমর্পণ করে যে প্রতিশোধ নিতেই হবে। মানুষ যখন শ্রেষ্ঠ, সৎ, ভাল জিনিষে আত্ম-উৎসর্গ করে পায় না বা ধরে রাখতে পারে না—অদৃশ্য শত্রুর অক্লান্ত আঘাতে—তখন ঠিক তার উল্টোটাকে আশ্রয় করে। কানাইও ঠিক বুঝেছে যে গঙ্গাবতীকে ক্ষিপ্তা করতে হবে, তার মনে ধিক্কার জন্মাতে হবে, তাহ'লেই তার অভিষ্ট সিদ্ধ হবে। গঙ্গাবতীর মত নারীকে যদি একবার আসরে নামাতে পারে—তবে সে মনের সুখে রাজার হালে গণিকা, মদ ও বন্ধু নিয়ে দিন কাটাতে পারবে।

গঙ্গাবতী অচল, অটল, মূক, বধির, চেতনাবিহীন। যেন সে হিমালয়—প্রাণও নেই, চেতনাও নেই। ঘরে ও বাইরে কোন দুষ্ট হাওয়া তাকে কাবু করতে পারে না, পারলে না। আপন মনে কাজে যায়, গম্ভীরভাবে কাজ করে, সন্ধ্যার সময় দ্রুত হেঁটে বাড়ী আসে। রাস্তায় কারো সঙ্গে বাক্যালাপও সহজে করে না। গেটের নিকট কানাই লুকিয়ে থাকে, হঠাৎ গঙ্গাবতীকে আক্রমণ করে, গঙ্গাবতীর মজুরী কেড়ে নিয়ে ছুটে পালায়। কাকুতি মিনতি শোনে না, কোলের শিশু ভয়ে চেঁচিয়ে উঠে, শিশুর জন্য ভিক্ষে চায় কিছু স্বার্জ্জিত পয়সা, কানাই দাঁত খিঁচিয়ে বকে, ছুটে যায় বন্ধুদের সঙ্গে কুপল্লীতে। এ সকল দুর্বৃত্তরা রাস্তায় হিসেব করে—কোন বন্ধু কত ছিনিয়ে আনতে পারলে। এপ্রকার নির্য্যাতিতা নারীরা ভয়ে মজুরীর পয়সা সঙ্গে আনে না, সঙ্গীদের নিকট রেখে দেয়। ওদের পাষণ্ড স্বামীরা যেদিন স্ত্রীর নিকট মজুরী পায় না, সেদিন নির্দ্দয়ভাবে মারধর করে, রাস্তার মাঝে বিবস্ত্রা করে পয়সা অনুসন্ধান করে। কুলি রমণীরা যত চতুর হয় দৈহিক অত্যাচার তত আরো বাড়ে। রাস্তার লোক দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখে। পুলিস বা ভাল লোকের নজরে পড়লে এসব হতভাগা নারী রক্ষা পায়, অবশ্য এর সব নারীই আবার স্বামীকে পুলিসের হাত থেকে বাঁচায়, অন্য কোনদিন এমন কাজ করবে না বলে নিজেরা জামীন হয়।

(ক্রমশঃ)

—ঠাকুরমা—

শ্রীসুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(Victor Hugo রচিত "The Grand-Mother"এর অনুসরণে)

হ্যাঁগা ঠাকুরমা ? আচ্ছা তোমার ঘুম ! সারা দুপুর ঘুরছি মোরা একলা হেথা।
ঘড়িতে যে বাজ্‌লো ক'টা—নেইক খেয়াল দেখিইনিকো মোরা ;
ওঠো, ওঠো, শুন্‌ছো ঠাকুরমা ! নেইক কেন মুখে কোন কথা !
ঠোঁট দু'খানি ঠাণ্ডা এমন কেন ? তোমার ঘুমে, তোমার মুখে
আমরা দেখি বিশ্বমায়ের স্বর্গ-রূপের ধারা।
ঘুমও তোমার ঢের দেখেছি—ঠাকুর-ডাকা সেও দেখেছি—
কিন্তু তুমি এমন কেন হলে ?
যখন তুমি করতে তোমার পূজা-আরাধনা, শান্তিভরা বিশ্রামেরি ক্ষণে ;
তার মাঝেও শুভ্র আশীষবাণী, আমাদেরি মঙ্গলেরি তরে—শুনেছিগো
তোমার ঠোঁটের কোণে !
এ'ন তুমি এমন কেন হলে ?

* * * * *

চোখ দুটিতে পলক নাহি পড়ে, মাথাখানি ঢল্‌ছে নীচের দিকে ;—
বুড়ো মানুষ ! হিমের পরশ অঙ্গে বাজে বড়, ঘরের কোণে আগুন
জ্বালা আছে—পড়ছে তা'তে ছাই।
ঘরের প্রদীপ শীঘ্র যাবে নিবে—কি ঘুম তোমার আজকে এলো চোখে ?
রাগ করেছো ? হ্যাঁগা ঠাকুরমা ? মনে তোমার দিইছি কোন ব্যথা ?
সেই কথাটা বলেই ফেল তাই !
একি হলো ! এমন কেন হলে ! হাত দু'খানি ঠাণ্ডা তোমার কেন !
আচ্ছা এসো, আমরা মোদের তপ্তরাঙা জীবন-কণা দিয়ে—
তোমার দেহে জাগাই জীবন-জ্যোতি।
তা'হলে তো গাইবে তুমি মোদের কাছে প্রাচীনকালের গীতি ?
বলবে তুমি তো ? পুরাকালের বীরপুরুষের মহৎজনের কথা ?
ভয়ঙ্করী রাক্ষসীদের কথা ? লুকিয়ে যারা থাক্‌তো শুয়ে—
ধরতো মানুষ ঝড়ের মত এসে ?
বলবে কোন রাজকুমারীর কথা ? গাইবে তাহার প্রেমাস্পদের
ভালবাসার সহজ সুখের গাথা ?
শিখিয়ে দেবে যত্ন করে শুদ্ধ নীতি-কথা ? স্মরণ পথে পড়লে
পরে যাহা—মনের যত ময়লা যাবে চলে ;—
পড়লে পরে মনে—দূরে যাবে অশরীরী প্রেতাত্মাদের ভয়—ভুলবো
নাকো ভগবানের ব্যাথার-মালার কথা, বিশ্বজনে ত্রাণ করিবার কালে।
কিম্বা তুমি পড়বে মোদের কাছে তোমার-চির-জীবন-আলো-করা
ধর্ম্ম পুঁথিখানি ?—

যাহার পাতায় পাতায়—সোণার মত শুদ্ধ আলোক-রেখায় লেখা
আছে সাধুর জীবন-কথা, ধর্ম্ম যা'দের মর্ম্ম-কথার মত।
সেই পুঁথিটি পড়তে তুমি সঘন আনন্দেতে—যাহার শ্লোকের মাঝে
সুরটি মেলে—কেমন করে পতিতদের তরে চিন্তা করে দেবদূতেরা যত !
আচ্ছা ঠাকুরমা ! এত কথা বলছি মোরা !—
তোমার মুখের ভাষা কোথায় গেলো !
কণ্ঠ নীরব কেন ?
ওরে ও ভাই দেখরে তোরা সব ! আলোয় যেন পড়ছে আবরণ—
লাগছে যেন সবই এলোমেলো—
ঘরের দেওয়াল মৌন দুঃখে যেন !

* * * * * *

জাগো, জাগো, ঘুমের থেকে ওঠো—দূর করে দাও দুষ্ট প্রেতের ছায়া—
তোমার ঘরের পবিত্রতা গ্রাসে ;—
ঐ দেখা যায় শীর্ণ-হাতের কৃষ্ণ ঘন ছায়া—ওঠো, ওঠো, উঠে বসো,
ভয় যে বড় পাচ্ছে মোদের, শুন্‌ছো ঠাকুরমা !
ঘরের আলো কখন গ্যাছে নিবে—জ্বাল্‌লে পরে হয়—মনের মাঝে
এই বারেতে কি হারানোর ভয় যে ওঠে ভেসে।
আজকে মোদের পড়ছে মনে তোমার কথা—
বাবা ও মা মরণ-পরশ পেয়ে—
নিরালা ঐ গীর্জ্জা কোণের মাটির মায়ায় ঢাকা
হঠাৎ একি হলো ? তোমার চোখের নাইক কোন গতি—
মুখে নাকে নাইকো শ্বাসের লেশ !
দেহ এত হিম ও কঠোর কেন ? কোথাও কোন নাইকো বাঁচার সাড়া !
এই কি তবে শঙ্কাকারী মরণ ?
কিম্বা তোমার বিশ্রামেরি ঘুম ! কিম্বা তোমার আরাধনার ডাকা !

* * * * * *

ক্লান্ত-বিষাদ-চোখে রাত্রি সারা রইলো জেগে তা'রা—
ঠাকু'মার ঐ অসাড় দেহ ঘিরে ;—
স্বর্গ হতে দেবদূতেদের স্নিগ্ধ আলোর রেখা—
মনে হলো পড়লো চারি পাশে।
সারা গ্রামে নামলো শোকের ছায়া—গীর্জ্জা-ঘড়ি বাজলো, উঠে ধীরে ;—
শুদ্ধ-বেশে ধর্ম্ম-যাজক এলেন পুঁথি হাতে—হলেন নতজানু—
করযোড়ে জানিয়ে দিলেন একটি সসীম জীবন—
গেল অসীম দেশে।

ভারতবর্ষের পর্ব্বত ও নদী

শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পিএইচ-ডি

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ হইতে ভারতবর্ষের পর্ব্বত ও নদী সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারা যায় এই প্রবন্ধে তাহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

হিমালয় পর্ব্বত সুলেইমান হইতে আসাম ও আরাকান পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। হিমালয় অথবা হিমাদ্রি পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে ভারতবর্ষ অবস্থিত। গঙ্গা, সিন্ধুনদ, কাবুল এবং সোয়াট্ নদী হিমালয় পর্ব্বত হইতে উত্থিত হইয়াছে। মৎস্য-পুরাণের মতে কৈলাশ পর্ব্বত হিমালয় পর্ব্বতের একটি অংশ। মার্কণ্ডেয়-পুরাণের মতে ইহা একটি সম্পূর্ণ পৃথক পর্ব্বত। মেরু এবং নিসদ হিমালয় পর্ব্বতের অন্তর্গত। গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, শতদ্রু, বিতস্তা, ইরাবতী, কুহু, গোমতী, ধূতপাপা, বাহুদা, দৃষদ্বতী, বিপাশা, দেবিকা, নিশ্চীরা, গণ্ডকী, কৌশিকী এবং রংক্ষু—এই সমস্ত নদীগুলি হিমালয় পর্ব্বত হইতে উত্থিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে গঙ্গা নারায়ণের পাদদেশ হইতে উত্থিত হইয়া সুমেরু পর্ব্বত পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইত। পরে গঙ্গা চারিটি ক্ষুদ্র শাখায় পরিণত হইয়া পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে প্রবাহিত হইত। ইহার দক্ষিণ নদ ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। মহাভারতে ও পুরাণে গঙ্গাকে "ত্রিপথগা" বলা হইয়াছে কারণ এই নদীটি তিনদিকে প্রবাহিত।

সরস্বতী নদীটি যমুনা এবং সাট্‌লেজের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এক সময়ে ইহা একটি খুব বিখ্যাত নদী ছিল, পরে ইহা "বিনসন" নামক মরুভূমিতে পরিণত হয়। ইহা

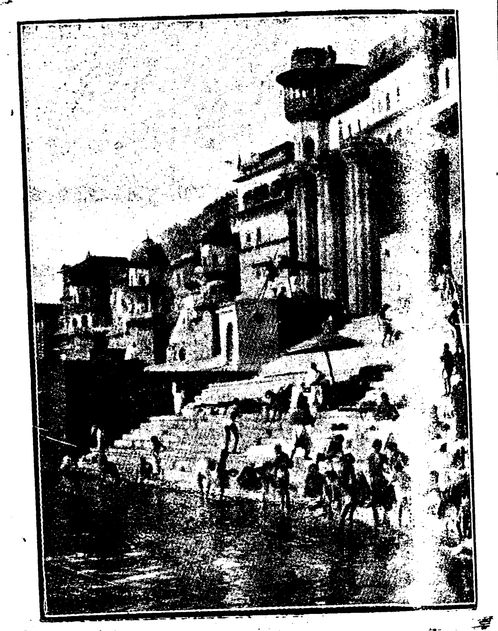

গঙ্গা (বারাণসী)

যমুনা

সিন্ধুনদের একটি শাখা এবং সিন্ধুর পর্ব্বতমালা হইতে উত্থিত। বৈদিক-যুগে সরস্বতী একটি সুপ্রসিদ্ধ নদী ছিল। চালাউর গ্রামে বিলুপ্ত হইয়া ভবানীপুরে ইহা পুনঃ উত্থিত হয়। ঘগ্‌ঘর সরস্বতী নদীর নিম্নভাগের নাম। চমসোদ্ভেদ, শিরোদ্ভেদ এবং নাগোদ্ভেদ এই তিনটি স্থানে সরস্বতী নদী পুনঃ উত্থিত হয়। সুপ্রভা, কাঞ্চনাক্ষী, বিশালা, মনোরমা, ওঘবতী, সুরেণু এবং বিমলোদকা এই সাতটি নদী সরস্বতী নামে পরিচিত ছিল।

সিন্ধুনদ বর্ত্তমানে ইন্দাস্ নামে পরিচিত। পঞ্চনদভাগা নদীর সঙ্গমস্থানের উপরিভাগকে সিন্ধুনদ বলা হইত। ডেরায়াসের বেহিস্তান শিলালিপিতে এই নদীটি হিন্দু নামে পরিচিত।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণের মতে চন্দ্রভাগা নামে দুইটি নদী ছিল। পাঞ্জাবে চেনাব্ এবং চন্দ্রভাগা অভিন্ন। ঝেলাম্ এবং চেনাব্ নদীর সঙ্গম স্থানকেও চন্দ্রভাগা বলে।

বিয়াস্ নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থানকে "বগ্‌গর" বলা হয়। টলেমির জারাড্রস (Zaradros) এবং শতদ্রু অভিন্ন।

বিতস্তা এবং বর্ত্তমান ঝেলাম অভিন্ন। কাশ্মীরে এখনও

নর্ম্মদা নদী

পর্য্যন্ত এই নদটি বিতস্তা নামে পরিচিত এবং এই নদী ও 'হাইডাস্‌পেস্' অভিন্ন। বৈদিক আর্য্য এবং বৌদ্ধদিগের নিকট এই নদী বিতংসা নামে পরিচিত ছিল। ইরাবতী

কৃষ্ণা নদী

যমুনা নদী বর্ত্তমানে তাহার পুরাতন নামে পরিচিত। এবং রাবি অভিন্ন। কুহু নদী এবং বর্ত্তমান কাবুল নদী শতদ্রু নদী এবং বর্ত্তমান সাট্‌লেজ অভিন্ন। সাট্‌লেজ ও অভিন্ন। গোমতী নদী এবং বর্ত্তমান গোমল নদী সম্ভবতঃ

অভিন্ন। সিন্ধু নদের পশ্চিম শাখা গোমল নামে পরিচিত। আমাদের মনে হয় যে গোমতী নদী চম্বল নদীর একটি শাখা। কাহারও কাহারও মতে ধৃতপাপা একটি প্রসিদ্ধ নদী এবং ইহার বর্ত্তমান নাম ধোপাপ। বারাণসীর নিকটস্থ গঙ্গার একটি শাখাবিশেষ ছিল। বাহুদা নদী এবং বর্ত্তমান রামগঙ্গা অভিন্ন। কনোজের নিকটে বামদিকে গঙ্গার সহিত বাহুদা নদী মিলিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে বাহুদা ও ধবলা (বর্ত্তমান ধুমেল কিংবা বুড়োরাপ্তি)

কাবেরী নদী

অভিন্ন। পার্জিটার সাহেব বলেন যে দক্ষিণাপথে বাহুদা নামে আর একটি নদী ছিল। মহাভারতের মতে এই বাহুদা নদীতে স্নান করিয়া "লিখিত" নামে একটি ঋষির খণ্ডিত বাহু জোড়া লাগিয়াছিল। শিবপুরাণের মতে গৌরী নদী বাহুদা নদীতে পরিণত হইয়াছিল।

ব্রহ্মপুত্র নদী

দৃষদ্বতী নদী ব্রহ্মবর্ত্তের দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব সীমানা দিয়া প্রবাহিত হইত এবং পশ্চিম সীমানায় সরস্বতী নদী প্রবাহিত হইত। মহাভারতের মতে এই নদীটি কুরুক্ষেত্রের একটি সীমানা বলিয়া পরিগণিত ছিল। দৃষদ্বতী নদী এবং চিত্রাঙ্গ অভিন্ন। কাহারও কাহারও মতে 'ঘগর' নদী এবং দৃষদ্বতী অভিন্ন।

বিপাশা নদী বর্ত্তমান বিয়াস্ নদী

নামে পরিচিত। ঋষি বশিষ্ঠ পুত্রশোকে অভিভূত হইয়া নিজের হাত পা বাঁধিয়া প্রাণত্যাগ মানসে এই নদীতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। কিন্তু এই নদী তাঁহার প্রাণ বিনাশ করে নাই।

দেবিকা নদী হিমালয় হইতে উত্থিত হইয়াছে এবং দীগ্ নামে রাবী নদীর একটি শাখা এবং দেবিকা অভিন্ন। অগ্নিপুরাণের মতে সৌবীর দেশের মধ্য দিয়া এই নদী প্রবাহিত হইত এবং সিওয়ালিক পর্ব্বতমালার মৈনাক পর্ব্বত হইতে ইহা উত্থিত হইয়াছিল। যুক্তপ্রদেশের দেবা দেবিকা অভিন্ন। সরযূ নদীর দক্ষিণভাগের অপর একটি নাম দেবা এবং উত্তরভাগের নাম কালী নদী। কালিকা-পুরাণের মতে ইহা গোমতী এবং সরযূর মধ্যভাগ দিয়া প্রবাহিত। মহাভারত এবং বরাহপুরাণের মতে গঙ্গা, সরযূ, গণ্ডক এবং দেবিকার সঙ্গমস্থলে কুমীর এবং হস্তীর কলহ হইয়াছিল।

নিশ্চীরা নদী নিশ্বীরা নামে বায়ুপুরাণে পরিচিত। নিশ্চীরা নদী এবং নীলাজন অভিন্ন। ইহার সঙ্গমস্থান ফল্গু নামে পরিচিত। ইহাই বৌদ্ধদিগের নেরঞ্জরা।

গণ্ডকী নদীর বর্ত্তমান নাম গণ্ডক এবং ইহার তীরে বিষ্ণু যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ইহার পুরাতন নাম ছিল শালগ্রামী ও নারায়ণী। কৌশিকী নদীর বর্ত্তমান নাম কুশী। বিহারের অন্তর্গত পূর্ণিয়া জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গঙ্গায় পতিত হইয়াছে।

ত্রিস্রোতার বর্ত্তমান নাম তিস্তা। ইহা ব্রহ্মপুত্র নদে মিশিয়াছে। বাঙ্লাদেশের অন্তর্গত বগুড়া জেলার মধ্য দিয়া করতোয়া নদী প্রবাহিত। আপগা নদী কুরুক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

চিনাব নদী

ভারতবর্ষের সপ্ত-কুলাচলের মধ্যে কলিঙ্গ দেশের মহেন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তাহার পর পাণ্ড্য দেশের মলয় পর্ব্বত, অপরান্তের সহ্য পর্ব্বত, ভল্লাট দেশের শুক্তিমৎ, মাহিষ্মতীর ঋক্ষ, বিন্ধ্য এবং মধ্যভারতের অন্য পার্ব্বত্য দেশ এবং নিষাদদিগের কারিপাত্র। কাব্যমীমাংসার গ্রন্থকার রাজশেখর এই সাতটি কুল পর্ব্বতকে ভারতবর্ষের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে ভারতবর্ষ কুমার-দ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। কাহারও কাহারও মতে মহেন্দ্র পর্ব্বত গঞ্জামের নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বঘাটের অপর একটি নাম। কালিদাসের রঘুবংশে বহুবার মহেন্দ্র পর্ব্বতের উল্লেখ আছে এবং ইহা কলিঙ্গ দেশে অবস্থিত। রামায়ণের মতে মহেন্দ্র

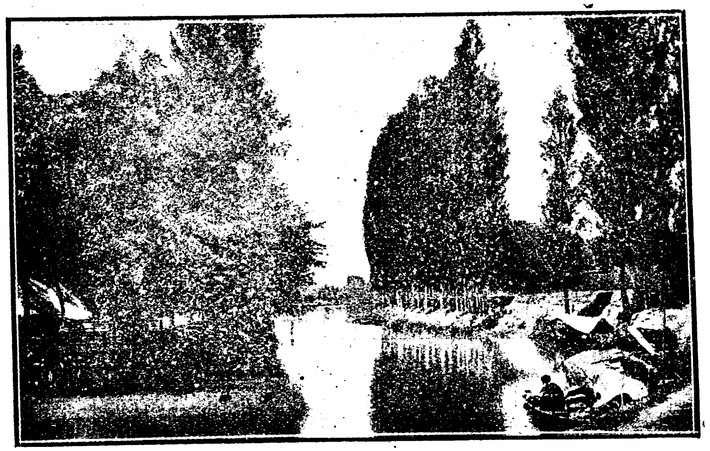

ঝেলম নদী

পর্ব্বত গঞ্জাম হইতে পাণ্ড্যদেশের দক্ষিণ পর্য্যন্ত অবস্থিত। টিনেভেলি জেলায় মহেন্দ্রগিরি নামে একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে। হর্ষচরিত এবং চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ আছে যে

মহেন্দ্র পর্ব্বত মাদুরার দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মহাভারতে এবং পুরাণে কতকগুলি ছোট ছোট পর্ব্বতের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা শ্রীপর্ব্বত এবং পুষ্পগিরি। অগ্নিপুরাণের মতে কাবেরী-সঙ্গমের নিকটে শ্রীপর্ব্বত অবস্থিত। ইহাকে শ্রীপর্ব্বত বলিত কারণ বিষ্ণু শ্রীর উদ্দেশে এই পর্ব্বতকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ভেন্‌কটাদ্রি, অরুণাচল এবং ঋষভ নামে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতের নামোল্লেখ

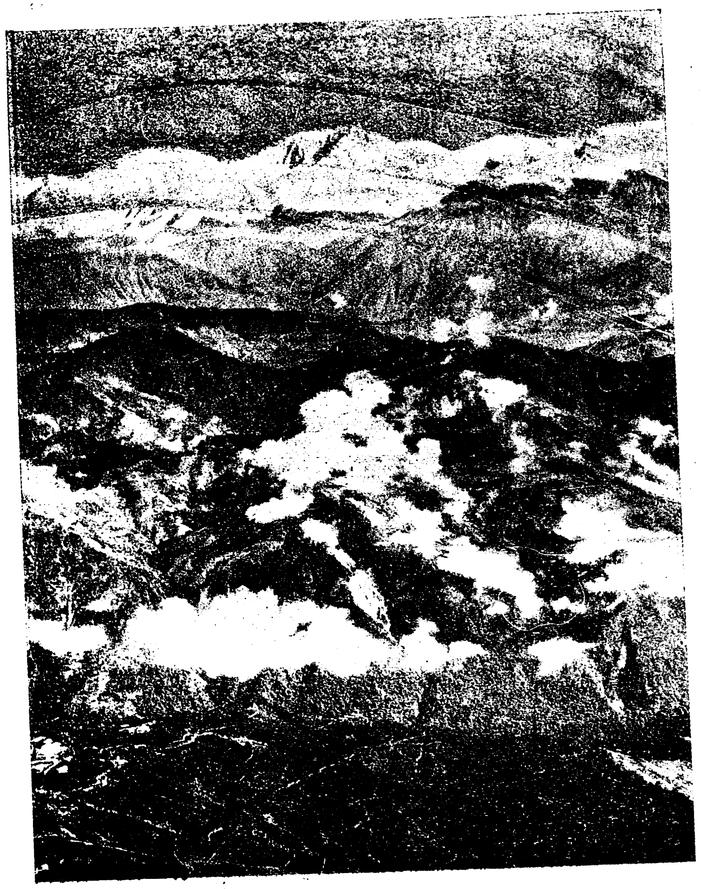

হিমালয় পর্ব্বত

পুরাণে আছে। মহেন্দ্র পর্ব্বতমালা হইতে যে সমস্ত নদী উত্থিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে পিতৃসোমা, ঋষিকুল্যা, ইক্ষুকা, ত্রিদিবা, লাঙ্গুলিনী এবং বংশকরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ত্রিসিমা, ঋষিকা এবং বংশধারিণী শুক্তিমান পর্ব্বতমালা হইতে উত্থিত হইয়াছে। এই ছয়টি নদী ছাড়া মৎস্যপুরাণে আরও তিনটি নদীর নাম পাই—তাম্রপর্ণী, শরবা এবং বিমলা। ঋষিকুল্যা নদী বর্ত্তমানে পুরাতন নামেই পরিচিত এবং গঞ্জাম দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে ত্রিদিবা নদী উত্থিত হইয়াছে। লাঙ্গুলিনী নদী এবং বর্ত্তমান লাঙ্গুলীয় নদী অভিন্ন। এই লাঙ্গুলীয় নদীর তীরস্থ ভিজিয়ানাগ্রাম এবং কলিঙ্গপটমের মধ্যবর্ত্তী স্থানে চিকাকোল নগর অবস্থিত। বংশকরা নদী এবং বর্ত্তমান বংশধরা নদী অভিন্ন। এই বংশধরা নদীটি কলিঙ্গপটমের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। মলয় পর্ব্বতে অগস্ত্য মুনির আশ্রম ছিল। মলয় পর্ব্বতের অপর একটি নাম মলয়কুট। ধোই প্রণীত পবন-দূতে শিখণ্ডাদ্রি নামে এই পর্ব্বত পরিচিত। নিম্নলিখিত নদীগুলি মলয় পর্ব্বত হইতে উত্থিত হইয়াছে; যথা, কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, পুষ্পজা এবং উৎপলাবতী। কৃতমালা এবং বর্ত্তমান বৈগী অভিন্ন। এই নদী মাদুরার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। তাম্রপর্ণী নদী পাণ্ড্য-দেশ দিয়া প্রবাহিত হইত এবং বর্ত্তমানে ইহা তাম্রবরী নামে পরিচিত। পুষ্পজা এবং উৎপলাবতী এই দুইটি নদী বর্ত্তমানে বৈপার এবং অমরাবতী নামে পরিচিত। বৈদূর্য্য পর্ব্বত পশ্চিমঘাটের উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল। গোদাবরী, ভীমরথ, কৃষ্ণবেণ্বা, তুঙ্গ-ভদ্রা, সুপ্রয়োগা, বাহ্যা এবং কাবেরী এই কয়টি নদী সহ্য পর্ব্বত হইতে উত্থিত হইয়াছে। ভীমরথা ও কৃষ্ণা নদীর ভীমা নামে একটি শাখা অভিন্ন। কৃষ্ণবেণ্বা কৃষ্ণা নামে পরিচিত। তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণা নদীর একটি শাখা। সুপ্রয়োগা কৃষ্ণা নদীর পশ্চিমদিকের একটি শাখা। বাহ্যা কিংবা বারদা কৃষ্ণা নদীর একটি শাখা। শুক্তিমৎ পর্ব্বত হইতে নিম্নলিখিত নদীগুলি উত্থিত হইয়াছে—যথা ঋষিকুল্যা, কুমারী, মন্দগা, মন্দবাহিনী, কৃপা এবং পলাশিনী। কাহারও কাহারও মতে হাজারিবাগ জেলার উত্তর দিকে শুক্তিমৎ পর্ব্বত অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন ইহাই কাথিওয়ার পর্ব্বতমালা এবং কাহারও কাহারও মতে ইহাই সুলেইমান পর্ব্বতমালা। গঙ্গার কিউল নামে একটি শাখা ও ঋষিকুল্যা

অভিন্ন। মন্দগা এবং মন্দবাহিনীর অপর একটি নাম মন্দগামিনী এবং গন্ধমন্দগামিনী। জুনাগড় পর্ব্বতমালা হইতে পলাশিনী নদী উত্থিত হইয়াছে।

ঋক্ষবৎ এবং বিন্ধ্য এই দুইটি কুলাচল। বিন্ধ্য এবং পারিপাত্র বিন্ধ্য পর্ব্বতমালার অংশ বিশেষ। ঋক্ষ পর্ব্বত হইতে নর্ম্মদা, শোণ, মহানদ, মন্দাকিনী, দশার্ণা, তমসা, বিপাশা নদীগুলি উত্থিত হইয়াছে। বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে শিপ্রা, পয়োষ্ণী, নির্ব্বিন্ধ্যা, বৈতরণী এই সকল নদী উত্থিত হইয়াছে। টলেমির মতে পুরাণের দশার্ণা এবং দোসরণ অভিন্ন। ঋক্ষপর্ব্বত হইতে দশার্ণা উত্থিত হইয়াছে। বিন্ধ্য-পর্ব্বতের পূর্ব্বভাগ হইতে নর্ম্মদা এবং তাপ্তী উত্থিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত নদীগুলি ঋক্ষ এবং বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে উত্থিত হইয়াছে—(১) শোণ, (২) মহানদ, (৩) নর্ম্মদা, (৪) সুরথা, (৫) অদ্রিজা, (৬) মন্দাকিনী, (৭) দশার্ণা, (৮) চিত্রকূট, (৯) চিত্রোৎপলা, (১০) তমসা, (১১) করমদা, (১২) পিশাচিকা, (১৩) পিপ্পলিশ্রোণী, (১৪) বিপাশা, (১৫) বঞ্জুলা, (১৬) সুমেরুজা, (১৭) শুক্তি-মতী, (১৮) শকুলী, (১৯) ত্রিদিবা, (২০) দেগবাহিনী, (২১) শিপ্রা, (২২) পয়োষ্ণী, (২৩) নির্ব্বিন্ধ্যা, (২৪) তাপী, (২৫) নিষধাবতী, (২৬) বেণ্বা, (২৭) বৈতরণী, (২৮) সিনীবালী, (২৯) কুমুদ্বতী, (৩০) করতোয়া, (৩১) মহাগৌরী, (৩২) দুর্গা এবং (৩৩) অন্তঃশিরা।

শোণ নদী নর্ম্মদার নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে উত্থিত হইয়া গঙ্গায় পতিত হইয়াছে। ইহার পুরাতন নাম ছিল হিরণ্য-বাহ বা হিরণ্যবাহু।

মহানদ কিংবা মহানদী—ইহা বর্ত্তমান মহানদী নহে।

নর্ম্মদা—যে স্থান হইতে শোণ নদী উত্থিত হইয়াছে তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে ইহা উত্থিত হইয়াছে। মৎস্য-পুরাণের মতে যে স্থানে নর্ম্মদা নদী উত্থিত হইয়াছে সেই স্থানটিকে জামদগ্নি তীর্থ বলে।

মন্দাকিনীও বর্ত্তমান মন্দাকিন অভিন্ন। ইহা পৈসুনী নদীতে পতিত হইয়াছে।

দশার্ণা নদী দশার্ণা দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

চিত্রকূট নদী চিত্রকূট পর্ব্বতের সহিত সংশ্লিষ্ট।

তমসা নদী ও তম নদী অভিন্ন। ইহা গঙ্গায় পতিত হইয়াছে।

করমদা—বায়ু এবং বরাহ-পুরাণের মতে ইহার নাম করতোয়া।

বিপাশা নদী এবং বর্ত্তমান বিয়াস্ বিভিন্ন।

শুক্তিমতী নদী শুক্তিমৎ পর্ব্বত হইতে উত্থিত হইয়াছে।

শকুলি এবং শক্রি নদী অভিন্ন। ইহা গঙ্গায় পতিত হইয়াছে।

শিপ্রা নদী পারিপাত্র পর্ব্বতমালা হইতে উত্থিত হইয়াছে।

পয়োষ্ণী এবং বর্ত্তমান পূর্ণ নদী অভিন্ন। পূর্ণ তাপ্তী নদীর একটি শাখা। চৈতন্যচরিতামৃতের মতে দক্ষিণ দিকে

বেভার পর্ব্বত

পয়োষ্ণী নামে একটি নদী ছিল এবং এই নদীটি ও ত্রিবাঙ্কুরের অন্তর্গত পূর্ত্তি নদী অভিন্ন।

নির্ব্বিন্ধ্যা নদী এবং মালওয়ার অন্তর্গত কালীসিন্ধ নদী অভিন্ন।

তাপী বর্ত্তমানে তাপ্তী নামে পরিচিত।

বৈতরণী উৎকলদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

বৌধায়নের ধর্ম্মসূত্রে পারিপাত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাই আর্য্যাবর্ত্তের দক্ষিণ সীমা। যে সকল নদী পারিপাত্র হইতে উত্থিত হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) বেদস্মৃতি, (২) বেদবতী, (৩) বৃত্রঘ্নি, (৪) সিন্ধু, (৫) বেণ্বা, (৬) আনন্দিনী, (৭) সদানীরা,

(৮) মহী, (৯) পারা, (১০) চর্ম্মণ্বতী, (১১) বিদিশা, (১২) বেত্রবতী, (১৩) শিপ্রা এবং (১৪) অবর্ণা।

সিন্ধুনদ এবং কালীসিন্ধু অভিন্ন। চম্বল এবং বেটওয়ার মধ্যস্থিত যমুনা নদীর ইহা একটি শাখা। ইহারই তীরে বিদর্ভরাজার কন্যা লোপামুদ্রার সহিত অগস্ত্যমুনির সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং পরে তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল।

সদানীরা কোশল এবং বিদেহের সীমারূপে বর্ণিত আছে। কাহারও কাহারও মতে সদানীরা ও গণ্ডক অভিন্ন এবং কেহ কেহ বলেন সদানীরা ও রাপ্তী অভিন্ন।

মহী নদী মাল্‌ওয়া দেশ হইতে উত্থিত হইয়া ক্যাম্বে উপসাগরে পতিত হইয়াছে।

পারা ও পার্ব্বতী অভিন্ন। এই পার্ব্বতী নদী ভূপালে উত্থিত হইয়া চম্বলে পতিত হইয়াছে।

চর্ম্মণ্বতী যমুনার একটি শাখা।

বিদিশা বর্ত্তমান ভিল্‌সা।

বেত্রবতী বর্ত্তমান বেট্‌ওয়া, ইহা যমুনায় পতিত হইয়াছে।

অবর্ণী স্থলে বায়ুপুরাণে অবন্তীর উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতের নাম পাওয়া যায় এবং যাহাদের সহিত ঋক্ষ, বিন্ধ্য এবং পারিপাত্রের সম্বন্ধ আছে, তাহাদের মধ্যে উর্জ্জয়ন্ত, অমরকণ্টক, চিত্রকূট, কোলাহল এবং বৈভ্রাজ পর্ব্বতের নাম উল্লেখযোগ্য। উর্জ্জয়ন্ত এবং গিরণার পর্ব্বত অভিন্ন।

অর্ব্বুধ বর্ত্তমানে আবু পর্ব্বত। অমরকণ্টক পর্ব্বত হইতে শোণ, মহানদী ও নর্ম্মদা উত্থিত হইয়াছে। চিত্রকূট পর্ব্বত প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। রাজগৃহের পাঁচটি পর্ব্বতের মধ্যে একটি পর্ব্বতের নাম ছিল বৈভার। বৈভ্রাজ এবং বৈভার অভিন্ন। দক্ষিণ বিহারের অন্তর্গত বাথান এবং বাতস্বন অভিন্ন।

অন্তর্যামী

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

অন্তর্যামী তুমি আজ মন বুদ্ধি চিত্ত লোক
আচ্ছন্ন করেছ একি মোহে,
আমার দর্শন-শক্তি কেন এত সীমাবদ্ধ,
কেন এত অন্ধ পরমাদ ?
ক্রমশুষ্ক জীবনের নীরস রুক্ষতা মাঝে,
কোথা হ'তে আত্ম পরসাদ
বার বার জেগে উঠে অন্তঃসার শূন্য আড়ম্বরে
অর্থহীন সমারোহে।
আত্মারে বঞ্চনা করি উচ্ছৃঙ্খল মত্ততায়
মিথ্যার দংশন জ্বালা সহে
কোন মতে কাটে কাল আত্মন্তরী প্রাণে চাপি,
ঘনীভূত নিত্য নিরাহ্লাদ ;
ওরে মন তাই কিরে, শত কাব্যে, ছন্দে, গানে,
ব্যঙ্গময় ক্রূর দুঃখবাদ
লিখে যাস্ আনমনে ? মৃত্যুহিম কালনদী
নিঃশব্দ কল্লোলে বয় বহে,
প্রিয়ার মধুর হাস্য, সুন্দরী নটীর লাস্য,
দাস্যময় এ নৈরাশ্য মাঝে
নাহি তোলে কোনো সুর, ব্যর্থতা মরুর বুকে
সকরুণ ছায়ানট বাজে।
হে চিত্রাক্ষী চিন্তাসখী অন্তর প্রকৃতি মোর
বহুবর্ণ-ছন্দ-গন্ধময়ী
চিদাকাশে মেঘকন্যা, মুক্তকেশে একি মায়া
সঞ্চারিলে ওগো সর্ব্বনাশী ?
মোর সর্ব্ব প্রাণশক্তি ঢাকিয়াছ ইন্দ্রজালে,
আর কেন ? মুক্ত কর অয়ি,
কাকক্বষ্ণ কেশদামে গ্রন্থি দাও হে সুন্দরী,
আত্মজ্যোতি উঠুক উদ্ভাসি'

ভাই বোন

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

COLOURED ILLUSTRATION

মাটির দেবতা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(৩২)

সংসারের মধ্যে ছোট বড় অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে।

মা মারা গেছেন, সুনির্ম্মল মায়ের মৃত্যুর পর যতটা অসহায় হয়ে পড়বে ভেবেছিল ততটা হতে পারে নি, সে কেবল সুব্রতার জন্যই।

মা ইহলোক ত্যাগ করবার সময় এই আত্মভোলা ছেলেটির জন্যই বিশেষ করে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। সকলেরই উপায় আছে, সকলেরই লক্ষ্য আছে, নাই কেবল এই ছেলেটির।

সুব্রতা স্বয়ং এ ভার গ্রহণ করেছে, মাকে নিশ্চিন্তভাবে পরলোকের পথে যাত্রা করতে দিয়েছে।

আগে সে তবু ভাসুরকে কতকটা এড়িয়ে চলতো—অনেক লেখাপড়া শিখলেও বাঙ্গালীর মেয়ের যা মজ্জাগত সংস্কার, তা সে ছাড়তে পারে নি।

কিন্তু সে সংস্কার আর রাখা চললো না—এ লোকটিকে সম্পূর্ণভাবে তাকে নিজের হাতে তুলে নিতেই হল।

সুবিমল সম্প্রতি বম্বে বেড়াতে চলে গেছে। সুব্রতা তার সঙ্গে যায় নি, ভাসুরকে দেখা শোনা করবার জন্য সে এখানেই থেকে গেছে।

মা মারা যাওয়ার পর বাড়ীর গিন্নির দায়িত্ব সবটা পড়েছে তারই মাথায়। এতদিন যদিও সংসারের সব কাজই সে করেছে, তবু সে আলগাভাবে,—এমন করে জড়িয়ে সে পড়েনি। ভয়ানক অসহ্য মনে হয়, তবু ত ছাড়বার যো নেই।

আত্মভোলা ভাসুর—তাঁকে সর্ব্বদা দেখাশোনা করা চাই। নিজের স্বামীর দিক তবু কতকটা আলগা দেওয়া যেতে পারে, লোকটি পরনির্ভরশীল নয়, কারও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে পারে না। অনেক সময় নিজের সব কাজ নিজেই করে নেয়, স্ত্রী বা দাসদাসী কারও ওপর নির্ভর করে না। কিন্তু এ মানুষটি ঠিক তার উল্টো; অসুখ হলে বলে দিতে হয়, জোর করে ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করতে হয়। ভাল থাকলে তার কাপড় জামা জুতা অবিরত দেখতে হয়, ধমক দিয়ে শোওয়াতে হয়, খাওয়াতে হয়।

শিশুর মত প্রকৃতি, একেবারে সরল; সুব্রতার 'পরে নিজের ভার ছেড়ে দিয়ে পরম নিশ্চিন্ত। মাঝে মাঝে মুখে খুসির হাসি ফুটিয়ে বলে—"সত্য বউমা, ভাগ্যে তুমি ছিলে মা, নইলে আমার উপায় যে কি হত আমি তাই ভেবে পাই নে।"

খানিক চুপ করে থেকে নিজে নিজেই বলে—"কি-ই বা আর হতো,—ভেসে যেতুম, স্থান পেতুম না। না থাকলেও চলে হয় ত, আমি সেটা ধারণা করতে পারি নে এই মাত্র।"

এ রকম লোককে ফেলে যাওয়া বাস্তবিকই চলে না। সুবিমল ও দাদার দিকে চেয়ে বড় যেন উৎকণ্ঠিত হয় না, স্ত্রীকে এ দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে বলে, দাদার দিকে তাকিয়ে সে নিজে অনেকটা ত্যাগ স্বীকার করে চলে।

অথচ দাদার সঙ্গে তার কথাবার্ত্তা চলে খুবই কম—দেখা হলে হঠাৎ সে এক চমৎকার দৃষ্টি তাঁর সারা দেহে বুলিয়ে নেয় মাত্র, দিন দিন সে দৃষ্টিতে উৎকণ্ঠাই বেড়ে ওঠে।

আড়ালে সুব্রতার কাছে তার অনুযোগের সীমা থাকে না—

সে নিশ্চয়ই দাদার দিকে দৃষ্টি দেয় না। আজ যদি মা থাকতেন, দাদাকে দেখার লোক থাকত। দাদা সত্যকার যত্ন পান না বলেই তাঁর এই চেহারা হচ্ছে।

সুব্রতা রাগ করতে যায় কিন্তু পারে না। মনে হয় সত্যই হয় তো তার সেবা যত্নের মধ্যে অনেকখানি ত্রুটি রয়ে গেছে, সে নির্ম্মলকে খুসি করতে পারছে না।

মাঝে মাঝে অতি মলিন মুখে সে নির্ম্মলের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়—

তার মলিন মুখের পানে চেয়ে নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করে, "কি মা, দরকার আছে কিছু?"

"না—"

বলে সুব্রতা ফেরে—

চলতে চলতে আবার সে চমকে দাঁড়ায়, দু-পা এগিয়ে এসে গভীর ব্যগ্রতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে—"আপনার শরীর কেন এত খারাপ হচ্ছে সত্য করে বলুন দেখি? আমি নিশ্চয়ই আপনাকে তেমন ভাবে যত্ন করতে পারি নে—"

নির্ম্মল বাধা দিয়ে বলে ওঠে—"ও কথা বলো না বউমা, তুমি যত্ন না করলে এতদিন আমার যে অস্তিত্বই থাকত না। কোথায় চলে যেতুম—হয়তো লোটা কম্বল নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতেই হতো—"

বলতে বলতে সে হো হো করে হেসে ওঠে—

সুব্রতা করুণ চোখের দৃষ্টি তার ওপর দিয়ে বুলিয়ে নেয়, এ ছাড়া তার আর কিছু করার উপায় নেই।

মেরুকে সংবাদ দেওয়ার কথা মনে হয়। সে এলে জোর করে দাদার যত্ন ঠিক মত করতে পারে, সুব্রতা সে রকম জোর করতে পারে না, পারবেও না।

এরই মধ্যে হঠাৎ সেদিন নির্ম্মল নিজেই প্রস্তাব করলে "দু মাসের জন্য কোথাও গেলে বোধ হয় শরীরটা ভাল হতে পারে—কি বল বউমা? হয় তো কলিকাতায় থেকেই শরীরটা এত খারাপ লাগছে—কি বল?"

সুব্রতা ভারি খুসি হয়ে উঠল।

বললে—"তাই চলুন দিন কত। ওয়ালটেয়ারে চলুন, সমুদ্রের বাতাসে শরীরটা বেশ ভাল হয়ে উঠবে।"

ওয়ালটেয়ারে যাওয়ার ব্যবস্থাই ঠিক হয়ে গেল। বম্বে হতে সুবিমল পত্র লিখলে সে দুই একদিনের মধ্যেই ওয়াল-টেয়ারে যাচ্ছে সব ব্যবস্থা ঠিক করতে; কলকাতা হতে এদের রওনা হতে দিন দশেকের বেশী দেরী যেন না হয়।

আজকের বৃষ্টিটা সত্যই নির্ম্মলের বড় ভাল লেগেছিল। অনেক দিন এমনভাবে বৃষ্টি নামে নি, পৃথিবী তার অনন্ত পিপাসা আজ প্রাণভরে মিটিয়ে নিচ্ছিল। গাছের পাতাগুলোর ওপরে কতদিনকার ধুলো জমে সেগুলোর সত্যকার রূপ ঢেকেছিল, বৃষ্টি ধারা সে সব ধুয়ে নিয়ে তাদের সত্যকার সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে দিয়েছিল।

টপ্, টপ্, টপ্—

গাছের পাতা হতে বৃষ্টি ঝরার শব্দটা শুনতে নির্ম্মলের ভারি ভাল লাগে, আরামে চোখ মুদে আসে—ইজি চেয়ারটায় হেলান দিয়ে বসে সে অবিশ্রান্ত সেই শব্দটাই শুনছিল।

মনে হল—একটা মোটর দরজায় থামল। বৃষ্টির দিনে মোটর থামলে ও থামতে পারে, হয় তো পথে খুব খানিকটা জল জমেছে। পথিকরা হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে কোন-ক্রমে প্রাণের দায়ে পথ হাঁটলেও মোটর চলবে না।

নির্ম্মল আকাশের পানে চাইলে।

স্তরে স্তরে মেঘগুলা সেজে দাঁড়িয়েছিল চমৎকার, ওরই বুকে অতখানি জল যে সঞ্চয় করা আছে তা বোঝা যায় না.—অথচ ওই মেঘগুলা জলেরই সমষ্টি মাত্র। ভারি হয়ে নামতে নামতে গলে পড়ে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে যায়।

এই না আশ্চর্য্য ব্যাপার, বাষ্প উঠছে পৃথিবীর বুক হতেই, আবার জল হয়ে ঝরে পড়ছে পৃথিবীরই বুকে। আকাশ মহৎ—উদার, সে কারও দান নেয় না;—যে যাই পাঠাক, সে সবই আবার ফিরিয়ে দেয়।

খট্ খট্ করে একজোড়া ভারি জুতোর শব্দ শোনা গেল—অস্থির চঞ্চল।—মনে হল দরজার কাছে এসে থেমে গেল—

পরমুহূর্ত্তে আহ্বান শোনা গেল—"বড়দা—"

ত্রস্ত হয়ে নির্ম্মল উত্তর দিলে, "কে—ইন্দ্রনীল? এস —ঘরেই আছি।

পর্দ্দা সরিয়ে ইন্দ্রনীল প্রবেশ করলে।

নির্ম্মল বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে—"এই বৃষ্টিতে এমনভাবে আসার মানেটা কি বুঝতে পারছিনে।"

ইন্দ্রনীল একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল, পকেট হতে রুমাল বার করে মুখ মুছতে মুছতে বললে—"দরকার পড়লেই আসতে হয় বড়দা—বিশেষ দরকারে যে এসেছি তা তো বুঝতেই পারছেন।"

নির্ম্মল আকাশ হতে পড়ল—"মানে? তোমার কথা আমি একটাও বুঝতে পারছিনে ইন্দ্রনীল।"

ইন্দ্রনীল মুহূর্ত্তমাত্র নীরব থেকে হঠাৎ বড়দার একখানা হাত চেপে ধরলে—

আর্দ্রকণ্ঠে বললে—"জীবনে মানুষ অনেক ভুলই করে থাকে বড়দা, সে ভুল সুধরাবার অবকাশ তাকে দিতেও হয়। আমিও অনেক ভুল করেছি, আমায় এই বারটির মত মাপ করুন।"

হাতখানা ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে নির্ম্মল বললে—"তোমার হেঁয়ালি-ভরা কথা কিছু বুঝতে পারছি নে ইন্দ্রনীল—এ রকম করে বলার চেয়ে সাদা-সিদে ভাবে বলাই ভাল বলে মনে করি।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলে ইন্দ্রনীল বললে—"কথা খুবই সোজা;—আপনি একবার সৈকতকে ডেকে দিন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি সত্যই তাকে আইনমতেই হোক—হিন্দুশাস্ত্রমতেই হোক বিয়ে করব।"

"সৈকত—এখানে—?"

নির্ম্মল বিস্ফারিতচোখে ইন্দ্রনীলের পানে চাইলে।

ইন্দ্রনীল উত্তর দিলে "হ্যাঁ, কাল রাত্রে বিয়ে নিয়েই আমাদের মনান্তর হয়েছে, রাত্রিশেষে সে এখানেই চলে এসেছে, আর কোথাও যায় নি। একটা সত্য কথা বলছি বড়দা—"

সে থেমে গেল দেখে নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করলে—"কি সত্য কথা—?

এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে ইন্দ্রনীল বললে—"আমি সৈকতকে যথাশাস্ত্র বিয়ে করতে পারি কি?"

নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করলে, "কেন পারবে না?"

মুখখানা নীচু করে ইন্দ্রনীল বললে, "কেন পারব না? পারব না এই জন্য যে আমি বিবাহিত, আমার স্ত্রী আছে।"

"তোমার স্ত্রী—"

নির্ম্মলের যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

সকল জড়তা কুণ্ঠা ত্যাগ করে ইন্দ্রনীল বললে, "হ্যাঁ, আমার স্ত্রী—বিলেতে যাওয়ার আগে যে মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল, সে আজও আছে।"

নির্ম্মল আড়ষ্টভাবে বসে রইল।

ইন্দ্রনীল বলতে লাগল, "একদিন শিকারে গিয়ে হঠাৎ তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, আমি এতদিন পরেও তাকে দেখে চিনেছিলুম। শুধু সেই জন্যই সৈকতকে বিয়ে করতে পারি নি বড়দা—"

নির্ম্মল অকস্মাৎ গর্জ্জে উঠল—"পাপিষ্ঠ—"

ইন্দ্রনীল সে কথা মেনে নিলে—"হাজার বার—লক্ষবার, আমি স্বীকার করছি। কিন্তু আজ তাই বলে সেই অপরাধে আমায় দূরে রাখবেন না বড়দা, আমি প্রতিজ্ঞা করছি—আমি হিন্দুমতে ওকে বিয়ে করব, হিন্দুমতে আবার বিয়ে করতে পারা যায়।"

নির্ম্মল নিস্তব্ধ—

অত্যন্ত কাতরভাবে ইন্দ্রনীল বললে, "সত্য আমি তাকে সে অধিকার দেব, আইনসঙ্গতভাবে সে আমার 'পরে তার দাবী প্রতিপন্ন করবে, তার সন্তান আমার নামে পরিচিত হবে। তাকে একটিবার ডেকে দিন বড়দা, আমি তাকে বুঝিয়ে সব কথা বলি, সে নিশ্চয়ই বুঝবে—নিশ্চয়ই রাজি হবে।"

নির্ম্মল ধীরকণ্ঠে বললে, "কিন্তু গোড়াতেই যে মস্ত বড় ভুল করছ ইন্দ্রনীল, সৈকত এখানে নেই, সে এখানে আসে নি। আমার কথায় বিশ্বাস কর, সে আসে নি, আসার সাহস ও পায় নি।"

ইন্দ্রনীলের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। সে নির্ম্মলের হাতখানা আস্তে আস্তে ছেড়ে দিলে।

জানালার বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল, তখনও তার ঝর্‌ঝরানি গানের সুর কানে ভেসে আসছিল।

ইন্দ্রনীল বাইরের পানে চেয়ে নিস্তব্ধে বসে রইল।

(৩৩)

নির্ম্মল অনেকক্ষণ কথা বলে নি, দারুণ বিতৃষ্ণায় তার সমস্ত অন্তরটা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল—সে তাই ইন্দ্রনীলের পানে একবার ফিরেও চায় নি। ভেবেছিল—তার বিরাগভাব বুঝতে পেরে ইন্দ্রনীল আপনিই চলে যাবে।

অনেকক্ষণ বাইরের পানে চেয়ে চেয়ে তার চোখ জ্বালা করছিল, সে চোখ ফেরাতেই দৃষ্টি পড়ল ইন্দ্রনীলের ওপর।

সব হারালে মানুষের মুখের অবস্থা এমনই বিবর্ণ হয়ে যায়। নির্ম্মল খানিকক্ষণ তার পানে তাকিয়ে রইল—

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ইন্দ্রনীল মুখ তুললে।

"কিন্তু আমি ঠিকই জেনেছিলুম বড়দা, সে এখানেই এসেছে, আর কোথাও যায় নি। তার মত অবস্থায় কোন মেয়ে অমন নিরাশ্রয়ভাবে পথে বার হতে পারে না। সত্যই আমার ওর জন্য ভারি ভাবনা হচ্ছে বড়দা—"

নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করলে, "তার মত অবস্থা—মানে—?"

ইন্দ্রনীল স্থির-দৃষ্টি তার মুখের পরে রেখে শান্তকণ্ঠে বললে—"দুইটি মাস পরেই সে মা হবে বড়দা—"

উত্তেজিত নির্ম্মল হঠাৎ চেয়ারটা পেছনে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল—

"সে মা হবে—মা হবে—আমাদের সৈকত—"

কথা আর শেষ হল না, উত্তেজনায় তার কেবল কণ্ঠস্বরই নয়—সমস্ত দেহটাই থরথর করে কাঁপতে লাগল।

ইন্দ্রনীল উত্তর দিলে—"হ্যাঁ, সৈকত মা হবে। আমি তার সন্তানের জন্যই তাকে এখন স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে রাজি হয়েছি, কিন্তু—"

"থাক, থাক, যথেষ্ট হয়েছে। তাকে যা অপমান করেছ সেই তার যথেষ্ট অপমান হয়েছে, তার চেয়ে বেশী অপমান আর করতে যেয়ো না তাকে স্ত্রীরূপে এখন গ্রহণ করে।"

নির্ম্মলের কণ্ঠস্বর কাঁপছিল।

ইন্দ্রনীল একটা নিঃশ্বাস ফেললে—

"কিন্তু বড়দা, তার ভবিষ্যৎ, তার সন্তানের ভবিষ্যৎ—"

নির্ম্মল বললে—"সে জন্য তোমার আর ভাব্‌বার দরকার দেখছি নে। ভবিষ্যৎ কেউ কারও কোনদিন নির্দ্দেশ করতে পারে নি—পারবেও না। মানুষ পেছন ফিরে অতীতটাকেই দেখতে পায়, সুমুখ পানে চেয়ে ভবিষ্যৎকে দেখতে পায় না, তার দৃষ্টি সেই অন্ধকারের গায়ে ধাক্কা খেয়ে বার বার ফিরে আসে, মানুষ ওখানে হয়ে যায় একেবারে ব্যর্থ। আমার মা বলতেন—যিনি জীব দিয়েছেন, তিনিই আহার দেবেন—জীবের সামনে পথ দেখাবেন, আমি এ কথাটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি ইন্দ্রনীল, তাই তোমাকেও বলছি তুমি তাদের ভবিষ্যৎ গড়বার ভার হাতে নিতে চেয়ো না, সে হবে তোমার ভীষণ বোকামী।"

খানিক চুপ করে থেকে সে আবার বললে—"তার বুকে সে অপমানের আঘাত দারুণ হয়ে বেজেছে, সেই জন্যই সে তোমার আশ্রয় ত্যাগ করেছে। সে তেজস্বিনী হয়ে অতবড় অপমানটা মানিয়ে নিতে পারলে না, পারত—যদি সে সাধারণ একটি মেয়ে হতো। তবু—তবু তোমায় মিনতি করছি—তুমি আর ও আঘাত তাকে দিতে যেয়ো না এই বিয়ের প্রস্তাব করে।"

ইন্দ্রনীলের মুখে মলিন হাসির একটু রেখা জেগে উঠে তখনই মিলিয়ে গেল—

পকেট হতে একখানা পত্র বার করে সে নির্ম্মলের সামনে রাখলে—"পড়ে দেখুন—"

নির্ম্মল বললে, "কার পত্র—?"

ইন্দ্রনীল উত্তর দিলে—"সৈকত লিখে রেখে গেছে—"

সে কথাটা নির্ম্মল আগেই বুঝেছিল। পত্রখানা পড়বে না ভেবেছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মনের গতি বদলে গেল।

পত্রখানা খুলে ফেলতে দেখা গেল—নেহাৎ ছোট নয়, সৈকত অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে অনেকখানি লিখে গেছে।

সে লিখেছে—

অসীম দয়া তোমার, কিন্তু ধন্যবাদ তোমায়, তোমার দয়া আমি নিতে পারলুম না। ভেবেছিলে—যে অবস্থায় এসেছি তাতে তোমার দয়া নিতে আমি বাধ্য হব—কথাটা এক পক্ষে ঠিক, কিন্তু পারলুম না এ দয়াটুকু নিতে—বড় অসহ্য।

আজ আমার প্রথম হতে বর্ত্তমানকালের—প্রতি দিনটির কথা মনে পড়ছে।

আমার সুখের বাল্যকাল—

তখন জানতুম না ওরই স্মৃতি মনের মধ্যে এমনভাবে এঁকে বসবে। মানুষ কি তা ভাবে? দিন চলে যায়, ভবিষ্যৎ আশার আলোয় পথ দেখায়, কিন্তু ওই পথের শেষ এমন আচমকা হয়ে যায়, এমন আচমকা অন্ধকার আসে—মানুষের সারা জীবনটাই তখন ভরে যায় ব্যর্থতায়।

মানুষ জীবন ভোর পাওয়ার আশাই করে—ওইটাই হচ্ছে তার জীবন ভোর পরাজয়। অথচ তাকে কেবল দিয়েই আসতে হয়—বল, শক্তি, সাহস, সব, এমন কি দেহের রক্তকণা পর্য্যন্ত—তবু তার মনে আশা থাকে—সে পাবে, জীবনের যে কোন ক্ষণে—যে কোন লগ্নে সে তার প্রার্থিত বস্তু পাবে।

কিন্তু পায় কি?

চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে সে যখন পেছন ফিরে চায়—দেখতে পায় ছাইয়ের ওপর দিয়ে সে হেঁটে এসেছে। পেছন দিকে তবু আলো পায়, কিন্তু সামনের দিক নিকষ কাল অন্ধকারে ঢাকা।

কিন্তু না, এ সব কি বলছি? রাতের কল্পনা মাত্র, কতকগুলা অসার চিন্তা মাথার মধ্যে ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে, এক সঙ্গে মালার আকারে গাঁথব—আমার সাধ্য কি? কাজেই এ সব চিন্তা থাক, আমার নিজের কথাই বলি।

কি উদ্দাম জীবন—সুন্দর ছেলেবেলা—বাপের স্নেহ, ভাইয়ের ভালবাসা—ছোটবেলায় মা হারিয়েছি কি না—ওঁদের স্নেহ-যত্নের আর শেষ নেই। মেয়েদের সংস্পর্শে আসি নি, পুরুষদের সাহচর্য্যে আমি জানতুম না আমি মেয়ে—পুরুষ নই।

বোধ হল সেই দিন, যে দিন তোমায় আমি সামনে দেখতে পেলুম।

যৌবন কবে এসেছিল জানি নে, কেউ আমায় এ সম্বন্ধে সচেতন করতে চাইলেও আমার রাগ হতো। কিন্তু সেই দিনই বুঝতে পারলুম আমি মেয়ে, আমার যৌবন এসেছে।

মা গো, তখনও যদি পৌরুষত্ব ভাবটাকে জাগিয়ে রাখতে পারতুম—

কি করেছি, কোথা হতে কোথায় নেমেছি। আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমি নিজের হাতে কাল করে তুলেছি, আমার সরল সহজ পথে নিজের হাতে কাঁটা বিছিয়েছি, চলতে গেলে যা আমারই পায়ে বিঁধে।

আমি চলে যাব, হ্যাঁ, ঠিক চলে যাব। মরব না এ কথা আগেই বলেছি। তোমার মত একজন খেয়ালীর খেয়ালবশে নিজের অমূল্য প্রাণ বিসর্জ্জন দেব না। আমি যা করেছি তার ফল আমিই ভোগ করব, শাস্তি আমি নিজেই বইব। আমার সন্তান—সে জানতে পারবে না তার বাপ কে, আমি তাকে সে পরিচয় দেব না। সে জানবে সে সমাজের বাইরে, দুনিয়ার মধ্যে থেকেও সে দুনিয়ার অপরিচিত।

কাল সকালে তুমি আমায় দেখতে পাবে না—এ ও আমার বড় শান্তি—মুক্তির বিরাট বিপুল আনন্দ। কোথায় যাব জানি নে, কে আমায় আশ্রয় দেবে তা জানি নে—তবু জানি যাব—তবু জানি আশ্রয় কোথাও মিলবে।

খোঁজ করো না—সন্ধান মিলবে না।

জানি—দুনিয়ায় এক বড়দা ছাড়া আর কেউ আমার খোঁজ করবে না, আর যদি কেউ করে—মেজ বউদি।

একদিন ফিরব ওদেরই কাছে—ওরা ছাড়া আর কেউ নেই।

বাবা আছেন, কিন্তু আমার কাছে তিনি মৃত। শুনেছি তিনি সব ছেড়ে দিয়ে হরিদ্বারে গেছেন, সৎগুরুর সন্ধান তাঁর জীবনে মিলেছে, ব্রহ্মকে চিনে তিনি আজ আদর্শ ব্রহ্মজ্ঞানী। আজ তাঁর কাছে গেলেও আমার আশ্রয় মিলবে না, কেন না আমারই দেওয়া আঘাত তাঁর বুক শতধা করে দিয়েছে।

তবু মনে ভাবছি—আজ নয়, একবছর পরে আমার অভাগা শিশু যদি বেঁচে থাকে, তাকে নিয়ে একবার তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে যাব। দোষ আমার—পাপ আমার, নির্দ্দোষ শিশু তো কোন অপরাধই করে নি—ওকে তিনি ক্ষমা করবেন, অভাগা শিশু দুনিয়ার ঘৃণা কুড়ালেও তাঁর কাছে ক্ষমা পাবে, এতটুকু ভালবাসা পাবে।

আর নয় থাক, মনের আবেগে কত কি মাথামুণ্ড যে লিখে যাচ্ছি তার ঠিক নেই। রাত বেড়ে উঠছে, আমায় এখনই বার হতে হবে।

তোমার যা কিছু সবই রেখে গেলুম। আমার পরণে যা আছে কাপড় জামা—তাই রইল।—

বিদায়।

আবার বলে যাই আমার খোঁজ নিয়ো না, আমি শূন্যে মিলাতে চললুম।—

সৈকত

(৩৪)

সকল রকম আমোদ প্রমোদের মাঝখান হতে ইন্দ্রনীলের মত লোকের অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধান হয়ে যাওয়া যেমন আশ্চর্য্যজনক তেমনই অসম্ভব।

আজ কয়টা বছর বিলেত হতে কলকাতায় ফিরে পর্য্যন্ত একটা দিন সে কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বিরত হয় নি। যেখানে যা হয়েছে ইন্দ্রনীল সেখানে যোগ দিয়েছে, নিজের বাড়ীতে প্রায়ই আনন্দ উৎসবের অনুষ্ঠান করেছে। এক কথায় তার মত সদানন্দ, সদালাপী লোক অতি বিরল। সেই জন্যই সে সহজে লোকের মনের মধ্যে স্থায়ী আসন গড়ে নিতে পেরেছিল।

তার অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধানে সকলেই তাই বিশেষ বিচলিত হয়ে উঠেছিল।—

সকলেই বাড়ীতে এসেছিলেন এবং তাকে আবার যে কোন অনুষ্ঠানে যোগদান করতে বার বার টানাটানি করেছিলেন।

এর মধ্যে বিশেষ অগ্রণী ছিল তমসা সিংহ।

আজকালকার মেয়েদের মধ্যে সে আরও খানিক এগিয়ে গেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না।—বিলেতে ডান্‌সে সে খুব নাম করেছিল, অভিভাবকহীন অবস্থায় সেখানে দিনকত একটা থিয়েটারেও ঢুকে পড়েছিল —তবে বেশী-দিন তাকে সেখানে সেভাবে থাকতে হয় নি। একজন ভারতীয় ভদ্রলোক তাকে সেখান হতে উদ্ধার করেন এবং বিয়ে করে একেবারে ভারতে চলে আসেন।

এখানে আসার বছরখানেক পরে মিঃ সিংহ জন্মভূমি পঞ্জাবে মারা গেছেন।—

মিঃ সিংহ বিলেতে গেলেও তিনি ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কার তিনি ত্যাগ করতে পারেন নি। তমসাকে বিয়ে করার আগে পর্য্যন্ত তার সম্বন্ধে তিনি বেশ উঁচু ধারণাই করেছিলেন, বিয়ের পর সংসার ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তিনি বেশ বুঝতে পারলেন—জীবনে তিনি কি মহাভুলই করেছেন।

স্বামী স্ত্রীতে সত্যকার মিলন হয় নি, তাই তমসা রইল কলকাতায়, আর মিঃ সিংহ রইলেন পঞ্জাবে।

মিঃ সিংহ মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তমসা পঞ্জাবে চলে গিয়েছিল তাঁর প্রচুর সম্পত্তি দখল করবার জন্য, কিন্তু গিয়ে শুনতে পেলে—মিঃ সিংহ তার সঙ্গে বড় কম প্রতারণা করেন নি, তাঁর উপযুক্ত দুই ছেলে, পুত্রবধূ এবং এক মেয়ে আছে।

ছেলেমেয়েরা বলেছিল—"আপনাকে আমাদের বাপ যখন ধর্ম্মসঙ্গতভাবে বিয়ে করেছেন তখন আপনাকে আমরা মা বলে মেনে নিতে বাধ্য। আপনি স্বচ্ছন্দে আমাদের এখানে বাস করুন, আপনাকে আলাদা বাড়ী, বাঙ্গালী দাসদাসী দিচ্ছি, কোন কষ্ট হবে না।"

কিন্তু তমসা এ আবেষ্টনীর মধ্যে থাকতে রাজি হয় নি। সে কোর্টের সহায়তায় স্বামীর সম্পত্তি দখল করতে চেয়েছিল, তার দাবী অগ্রাহ্য হল, মাসিক দুইশত টাকা পাওয়ার চুক্তিতে রাজি হয়ে তাকে কলকাতায় ফিরে আসতে হল।—

এখন সে স্বাধীনা।

আজকাল তার বাড়ীতেই যে কোন আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান হয়। বিধবা তমসাকে পত্নীরূপে পাওয়ার আশা অনেকেই করেন, কিন্তু তমসা এ পর্য্যন্ত কারও আশা পূর্ণ করে নি, অথচ হতাশও কাউকে করে না। তার সরল কথাবার্ত্তা, অকুণ্ঠিত মেলামেশা, অটুট স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য সকলকেই তার পানে আকৃষ্ট করে রেখেছে।

ইন্দ্রনীলও দু চার দিন মিসেস সিংহের বাড়ী গেছে, তার পরেই তমসাকে তার সম্বন্ধে কিছু বেশী রকম সচেতন হতে দেখা গেছে। যদিও সে কাউকে আভাসে জানায় নি সে ইন্দ্রনীলের সমস্ত খবরই জানতে চায়—ইন্দ্রনীল তার সান্ধ্য আনন্দোৎসবে যোগ না দিলে তার আনন্দ থাকে না —তবু অনেকেই ইন্দ্রনীলের তার বাড়ী যাতায়াত মোটেই পছন্দ করে নি।—

তমসার রূপের খ্যাতি, তার টেনিসখেলা, নাচ ও গানের প্রশংসা শুনেই ইন্দ্রনীল গিয়েছিল, ভারতীয় মেয়েদের সে যথেষ্ট পরিমাণে খেলালেও সে হয় তো এদের কোন কোন বিষয়ে এতটুকু শ্রদ্ধা করত—তমসাকে দেখে সে ভারতীয়ের আদর্শ এতটুকু তার মধ্যে দেখতে পায় নি।

সৌন্দর্য্য তার অসীম হতে পারে, নাচ গান খেলায় সে যথেষ্ট নাম নিতে পারে, কিন্তু তার অসীম পানাসক্তিই তারপরে ইন্দ্রনীলের ঘৃণা এনে ফেলেছিল।

এ দেশের মেয়েরা এমন নির্লজ্জভাবে মদ খেতে পারে, এমন নির্লজ্জভাবে ধূমপান করতে পারে, সেটা বুঝি সে আগে কোনদিন কল্পনাই করতে পারে নি। তমসার অতিরিক্ত বন্ধুত্ব সে তাই এড়িয়ে এল, আর তমসার দিকেও যায় নি।

এর আগে তমসা কোনদিনই ইন্দ্রনীলের বাড়ীতে আসে নি, তাই প্রথম সে যে দিন এল—সে দিন ইন্দ্রনীল বেশ একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল।—

সে বসতে না বললেও তমসা নিজেই তার পাশের চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসে পড়ল—

"বেশ মানুষ আপনি মিঃ চ্যাটার্জ্জি, দু চার দিন গিয়ে আর ওদিকে যান না। কতদিন ডেকে পাঠিয়েছি—আপনার একটা উত্তর দেওয়ার পর্য্যন্ত অবকাশ হয় না।"

হাতের বইখানা টেবিলের পরে রেখে ইন্দ্রনীল অলসভাবে হাই তুলে আড়ামোড়া ছেড়ে বললে—"অবকাশ সত্যই মেলে না মিসেস সিংহ, অনেকদিনই এমনি মিথ্যে আমোদ প্রমোদ নিয়ে কাটিয়েছি, আজকাল—"

তরল হাসিতে ঠোঁট দুখানা রঞ্জিত করে তমসা বললে—

"এখন পারমার্থিক ধ্যানে মনোনিবেশ করছেন বুঝি? এ বইখানা নিশ্চয়ই আপনাকে পারমার্থিক উপদেশ দিচ্ছে—দেখতে পারি একটু?"

উত্তরের অপেক্ষা না করে বইখানা তুলে নিয়ে সে দেখলে—লেখা আছে—ধর্ম্মতত্ত্ব।

নিতান্ত অবহেলার সঙ্গেই সেখানা সশব্দে টেবলের পরে ফেলে সে বললে—"যত সব রাবিশ বই—আপনার মত লোকও এ বই পড়ে—সত্য এতে আমি ভারি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি মিঃ চ্যাটার্জ্জি। এই সব কঠোর বিষয়ের দিকে মন যায়, না এমনি দেখেই যান?"

ইন্দ্রনীলের মুখখানা হাসিতে ভরে উঠল, সে বললে—"তা যায় বই কি মিসেস সিংহ। মানুষের ওপর দিকটাই দেখে আসছেন, অন্তরের দিকটা আপনার এতখানি বয়সের মধ্যে আপনি দেখতে পান নি—অর্থাৎ দেখতে চান নি।—সাইকোলজি পড়তে হয় না, চোখের সামনে নেচারে ফুটে ওঠে। দেখেছেন শিশু এক রকম থাকে, সেই আবার যুবক অবস্থায় হয় অন্য রকম, আবার বার্দ্ধক্য যখন আসে তখন সেই লোকটিই যায় একেবারে বদলে—"

বাধা দিয়ে তমসা বললে, "আপনি তাহলে বুড়ো হয়েছেন বলতে চান?"

ইন্দ্রনীল গম্ভীর হয়ে বললে, "মানুষের মনটাই হয় তরুণ, শিশু বুড়ো—দেহের বিকৃতি হয়তো না ঘটতেও পারে। নদীর স্রোতও বদলে যায় যখন পৃথিবীর বুকে ভূমিকম্প জাগে, অনেক নদ নদী এমন কি সাগর পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়, আবার নতুন করে জন্মও নেয়। মানুষেরও ঠিক তাই হয় মিসেস সিংহ। আজ যাকে দেখতে পাবেন উচ্ছৃঙ্খল, অত্যাচারী, বিলাসী, কাল হয় তো দেখবেন সে সর্ব্বত্যাগী, জিতেন্দ্রিয়, সন্ন্যাসী। এমন কোন একটা ধাক্কা এসেছে অতর্কিতে—যাতে সে একেবারে বদলে গেছে, তখন সে তার পূর্ব্বজীবনের স্মৃতিটাকে পর্য্যন্ত মুছে ফেলে দিতে পারলে বাঁচে—এমনই হয় অবস্থা। মানুষকে বুঝতে শিখুন মিসেস সিংহ, নিজেকে চিনতে পারবেন।"

তমসা আশ্চর্য্য হয়ে তার পানে চেয়েছিল—ইন্দ্রনীলকে সে যেন বুঝতে পারছিল না—লোকটি বড় জটিল মনে হয়।—

সে বললে, "কিন্তু সম্প্রতি যে আলোড়নটা হয়েছে তাতে আপনার মত লোকের মনের গতি এমনভাবে বদলে যাওয়া যেন অসম্ভব বলেই মনে হয়।"

ইন্দ্রনীল মুখ তুললে—

একটু হেসে বললে, "আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয় বটে। তাই তো বলছি মিসেস সিংহ, মানুষের শুধু বাইরেটাই দেখবেন না, ভেতরটা আগে দেখবেন। মাথার চুল সাদা, গায়ের চামড়া লোল হয়ে যাওয়া, একেই আপনারা বলেন বুড়ো, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। অনেক লোল চামড়া সাঁদা মাথা লোক আছে, তাদের মন অথচ চির নবীন—বসন্ত বার মাস তাদের মনের নিকুঞ্জে বাঁধা; আবার এমন লোকও দেখা যায় মিসেস সিংহ—যাদের যৌবনেই সব উচ্ছ্বাস ফুরিয়ে যায়, যাদের জীবন হয় একেবারে ব্যর্থ—যে কোন মুহূর্ত্তে তারা খসে পড়ার প্রতীক্ষা করে। সে রকম অবস্থায় তাদের জীবনে সান্ত্বনা দেয় এই রকম বই, এই রকম সঙ্গ, আর কিছুই তাদের কাছে প্রীতিপ্রদ হয় না।"

তমসা নীরবে বইখানা তুলে নিয়ে পাতা উল্টাতে লাগল।

অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলে দেখলে ইন্দ্রনীল তার পানেই চেয়ে রয়েছে।

তমসা শান্তকণ্ঠে বললে, "তবু আমি জোর করে বলি মিঃ চ্যাটার্জ্জি, সৈকতের যাওয়াটা আপনাকে এমন কিছু আঘাত দিতে পারে না যাতে আপনার তরুণ মনটা বৃদ্ধ হয়ে পড়ে। সে এসেছিল, কিছুদিন ছিল, তার পর চলে গেছে—এতে আপনার মনে আঘাত পাওয়ার কারণ এমন কিছু নেই। ও সব পাগলামী ছেড়ে দিন—চলুন আমার সঙ্গে—"

আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে ইন্দ্রনীল বললে—"কোথায়?"

তমসা উত্তর দিলে—"আমি একখানা এরোপ্লেন কিন্‌ছি, ইচ্ছা আছে এটায় উঠে আর একবার ইংল্যাণ্ড রওনা হব। জানেন বোধ হয় এরোপ্লেন উড়ানো আমি শিখেছি, এবার নিজেই উড়িয়ে যাব ইচ্ছা আছে। চলুন, সেটা দেখে দর-দাম ঠিক করে কিনে ফেলা যাক"

ইন্দ্রনীল হাসিমুখে বললে—"এ যাত্রায় আপনার সঙ্গী হচ্ছে কে, মিঃ চৌধুরী—না মিঃ পাল—?"

হেসে উঠে তমসা বললে—"ক্ষেপেছেন—ওঁদের সঙ্গী

করব? বাঙ্গালীর মধ্যে এমন কেউ নেই—কেবল আপনি ছাড়া—যে আমার সঙ্গী হতে পারে। না, মিছে কথা বলছিনে মিঃ চ্যাটার্জ্জি, এবার আমার ইংল্যাণ্ড যাত্রার সঙ্গী হবেন আপনিই—রাজি আছেন তো?"

ইন্দ্রনীল হাসলে মাত্র।

(৩৫)

একথা রাষ্ট্র হতে বড় বেশী দেরী হল না।

সুবিমল কিছুদিন আগে ফিরে এসেছে—নির্ম্মল তখনও ডিজাগাপটমে, সঙ্গে রয়েছে সুব্রতা।

নিজের জন্য সুবিমল স্ত্রীকে আটক করে নি, সে দেশে ফিরেই জোর করে সুব্রতাকে সঙ্গে দিয়ে নির্ম্মলকে দেশ-ভ্রমণে পাঠিয়েছে।

কয়েকটা দিন আগে সুব্রতা সুবিমলের পত্রে জেনেছিল—ইন্দ্রনীলের স্বভাব একেবারে বদলে গেছে, সে নাকি আজকাল খুব সাধুভাবে জীবন যাপন করছে।

তারই কয়দিন পরে আবার যে পত্রখানা সে পেলে তাতে জানতে পারলে—ইন্দ্রনীল মিসেস সিংহের সঙ্গী হয়ে ইউরোপ যাবে। প্রতিদিন সে এরোপ্লেনে উড়ছে, মিসেস সিংহ তাঁর বর্ত্তমান সঙ্গীকে এরোপ্লেন উড়ানো শিক্ষা দিচ্ছেন।

সুব্রতা হাসলে মাত্র।

মানুষের প্রবৃত্তি অনুযায়ী সে চলে থাকে, জীবনের ধারা বদলে নেওয়া তাই অসম্ভব বলেই মনে হয়। হাওয়া বিপরীত দিক হতেও বয়, মানুষ চলতে জানে না বলেই হাঁপিয়ে ওঠে, চোখে মুখে ধূলো গিয়ে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ে।

ব্যাপারটা সত্যই তাই—

ইন্দ্রনীল মাস তিন চার মাত্র সংযতভাবে থাকতে পেরেছিল, তমসার সংসর্গে পড়ে সে আবার ভেসে চলেছিল।

এবার হয়েছিল ঠিক সমান, বাধ্য-বাধকতার ভাব এর মধ্যে ছিল না। তমসার হাতে ইন্দ্রনীল নিজেকে ছেড়ে দিয়ে শান্তির নিঃশ্বাস ফেলতে চেয়েছিল, ঠিক এই সময় এসে পড়লেন সস্ত্রীক ডাক্তার সোম।

সেই আত্মভোলা লোকটি, যিনি নিজের পানে তাকাতে চিরদিনই উদাসীন।

সাহা সোম নিজের ভুল বুঝতে পেরে ফিরে গেছেন সেই স্বামীরই কাছে, স্বামীর ভার সম্পূর্ণ নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। আজ সত্যই তিনি স্ত্রী, গৃহিণী, একটি সন্তানের জননী।

"এ কি হচ্ছে মিঃ চ্যাটার্জ্জি, এমন করে নিজেকে ধ্বংসের পথে ভাসিয়ে দেওয়ার মানে তো কিছু বুঝছি নে।"

সাহার কথায় ইন্দ্রনীল কেবল হাসলে।

মিসেস সোম উৎকণ্ঠিতা হয়ে বললেন, "না, আমি বরাবরই এ রকম উচ্ছৃঙ্খলতা পছন্দ করি নে মিঃ চ্যাটার্জ্জি,—এ দেশের বৈশিষ্ট্য দূর করে পরের দেশের অনুকরণ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। কি করছেন বলুন দেখি?"

ইন্দ্রনীল জিজ্ঞাসা করলে, "কি—?"

মিসেস সোম শান্তভাবে বললেন, "দেখুন, অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি, বুঝেছি—যাদের যা তাই ভাল, তার অতিরিক্ত কিছুই ভাল নয়। মনে আছে দার্জ্জিলিংয়ে থাকতে একদিন এই সব বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়েছিল, আপনি সেদিন বিয়েটাকে কিছু নয় বলেই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন, আমি সেটা মানতে চাই নি। আপনি এই যে সৈকতকে দু বছর কাছে রাখলেন, সে চলে গেল—আবার তমসাকে গ্রহণ করেছেন, বলতে চান কি এইটাই সব চেয়ে ভাল? আজ মনে করুন—সৈকতের যে সন্তান এতদিন হয়েছে, যার বয়েস প্রায় এক বছর হয়ে এল—সে কি নামে নিজের পরিচয় দেবে? আদিম যুগটা নাকি সত্য ছিল, আপনারা আজ জোর করে সেই যুগটাকে মেনে নিতে চান—। সে যুগে শিক্ষা ছিল না, সভ্যতা ছিল না, বাপের বংশ ধরে পরিচয় দেবারও দরকার ছিল না। আজ আপনি বা আপনার মত আর দু-চার জন শিক্ষিত বর্ব্বর—মাপ করবেন, কথাগুলো বড় শক্ত হয়ে যাচ্ছে—সেই যুগটাকে ফিরে আনতে চাইলেও আপনাদের ঘিরে যে সমাজ দাঁড়িয়ে আছে—সে তো তাকে মেনে নেবে না। কুমারীর সন্তানরূপে যিশুকে লোকে মেনেছিল—তাও দু হাজার বছর আগে, আজ তা বলে কেউ মানবে না মিঃ চ্যাটার্জ্জি। পূজা করা, উপদেশ শোনা দূরে থাক, পাশে বসাতে পর্য্যন্ত চাইবে না।"

ইন্দ্রনীল অন্যমনস্কভাবে জানালা দিয়ে বাইরের পানে তাকিয়ে রইল।

মিসেস সোম বলতে লাগলেন, "অসভ্য বর্ব্বর যারা তাদের সুন্দর সরল জীবন-যাত্রা প্রণালীকে আমরা অনেক সময় উপহাস করি, আবার অনেক সময় ওদেরই প্রশংসা করি। ধরতে পারি নে কি ভাল, বুঝতেও পারি নে। তবু এইটুকু বলে যেতে পারি—আমাদের দেশের যা, তাই ভাল—এই সুন্দর সরল অনাড়ম্বর জীবন—কি চমৎকার। বাংলার খাঁটি ছবি দেখতে পাবেন যদি পল্লীগ্রামে যান, বাংলার আদর্শ ছবি সেখানে দেখতে পাবেন। ওর সঙ্গে মিলান দেখি ইউরোপের ছবি, ওখানকার একটি মেয়ে আর এখানকার একটি মেয়ের সঙ্গে তুলনা করুন—দেখতে পাবেন কোনটি সুন্দর। আমি নিজের ভুল বুঝেছি মিঃ চ্যাটার্জ্জি—আমি পথ পেয়েছি—আলো পেয়েছি।—আশা করি আপনিও পথ পাবেন—আলো পাবেন, চিরদিন অন্ধকারে আপনাকে থাকতে হবে না।"

বাংলার পল্লী—

ইন্দ্রনীলের মুখখানা দৃপ্ত হয়ে উঠে তখনই অন্ধকার হয়ে গেল।

মিসেস সোম বললেন, "আপনার সামনে আজ যে মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছে, সে একটা ঝড়, সাইক্লোন, অমঙ্গল। দুনিয়ার যত যা কিছু আবর্জ্জনা অমঙ্গল—সব সে গায়ে জড়িয়ে বসে আছে, সে এই সব চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সমাজে সে এনে ফেলেছে বিশৃঙ্খলা—ধ্বংস; সে যে পথে চলবে সে পথ পুড়িয়ে ছারখার করে যাবে। মিনতি করছি মিঃ চ্যাটার্জ্জি, আপনি সরে আসুন—আপনি সৈকতকে খুঁজে আনুন, তাকে বিয়ে করুন, তার ছেলেকে বাপের নামে পরিচয় দিতে দিন। আপনি যে মানুষ, আপনি বর্ব্বর নন, শিক্ষিত, সে পরিচয় দিন।"

ইন্দ্রনীল একটা হালকা নিঃশ্বাস ফেললে—"আপনি ভুল বুঝছেন মিসেস সোম, তাকে পাওয়ার উপায় আর নেই, সে চিরদিনের মতই চলে গেছে। সে বার বার করে বলে গেছে—যেন তার খোঁজ করা না হয়—তার অশান্তি উৎপাদন করা আর না হয়। আমি বিশ্বাস করি মিসেস সোম, কোনদিন না কোনদিন তাকে আমি দেখতে পাব, সে দিন তার কাছে আমি ক্ষমা চাইব।"

মিসেস সোমের ছোট ছেলেটি মেঝেয় হামা দিয়ে বেড়াচ্ছিল, ইন্দ্রনীল তার পানে চেয়ে ভাবছিল সৈকতের সন্তানের কথা।

সে এতদিন আরও বড় হয়েছে, হয় তো হেঁটে বেড়ায়। নাম-হীন, গোত্র-হীন একটি শিশু—

আর যদি সে জন্মেই মারা গিয়ে থাকে—

তা হলে সৈকত বেঁচে গেছে।

গভীর রাত্রে বিছানায় ঘুম ভেঙ্গে ইন্দ্রনীল শুনতে পায় শিশুর কান্না—

মনে হয় সৈকত একটি শিশুকে বুকে করে নিয়ে সমস্ত ঘর পায়চারী করে বেড়াচ্ছে, গুন গুন করে গান গাইছে—"ঘুমো চাঁদ ঘুমো—"

সে স্বপ্ন দেখে খোকাটি নেই, সৈকত মরা ছেলের পাশে উপুড় হয়ে তার মুখের পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। তার চোখে জল যদি আসে সেও ভাল, কিন্তু সে চোখ একেবারে শুষ্ক। মুখে কি অবর্ণনীয় যন্ত্রণার চিহ্ন।

ডাকবে সে কাকে? জগতের সকলের স্নেহবঞ্চিতা সে, ভগবানের পরেও এতটুকু তার বিশ্বাস নেই।

সে বলেছে ভগবানকে ডাকে দুর্ব্বল লোকে। যতক্ষণ মানুষের নিজের শক্তি সামর্থ্য থাকে সে নিজেকেই বিশ্বাস করে, আর কারও শক্তি মানতে চায় না—সবই অগ্রাহ্য করে। মানুষের নিজের শক্তি যখন ফুরিয়ে যায়, সে তখন বাঁচতে চায় আর কারও পরে নির্ভর করে—তখনই সে মানে ভগবানকে—ঘুস দেয় পূজা-নৈবেদ্যের।

সৈকতের যে মুখ স্বপ্নে ইন্দ্রনীল দেখতে পায় দৌর্ব্বল্যের লেসমাত্র তাতে নেই। সে বেদনা পেয়েছে, তবু সে বেদনা সইবার শক্তি তার আছে। সে ভাঙ্গবে, তবু নুইবে না—মরবে, তবু মর্য্যাদা হারাবে না।

জয় করবার আকাঙ্ক্ষা তার ছিল না, সে ইন্দ্রনীলকে ভালবেসে নিজের সব তাকে দিয়েছিল।

আজও রাত্রে একা বিছানায় শুয়ে ইন্দ্রনীল আর্ত্তকণ্ঠে এবার ডাকে—"সৈকত—"

কাল মেয়েটি, তার রূপ ছিল না, ছিল সাহস, ছিল দৃঢ়তা, ছিল প্রেম।

তমসার পাশে তার স্থান হয় তো হবে না, তবু ইন্দ্রনীলের সারা অন্তর মেনে নেয় সে তমসার অনেক ওপরে, তার নাগাল তমসা পেতে পারে না।

সারাদিন—রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত তমসার সাহচর্য্যে কাটিয়ে শ্রান্তদেহে ক্লান্তমনে সে যখন বাড়ীতে ফেরে, তখন তার সারা অন্তর ভরে ওঠে আর্ত্ত-হাহাকারে—আজ যদি সৈকত থাকত।

তমসা এসেছে সৈকত থাকতে, ইন্দ্রনীল তার পানে চায় নি—তার মন ছিল ঘরের দিকে। আজ শূন্য-মনে সে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে, তীরের আকর্ষণে তবুও সে বিচলিত হয়ে সরে আসে।

ঘৃণায় সমস্ত হৃদয়টা ভরে ওঠে—অথচ সৈকত আসার আগে এ রকম ঘৃণার ভাব একটা দিন একটা মুহূর্ত্তের জন্যও তার মনে জাগে নি। আগে যা ছিল তার কাছে আনন্দ আজ তাই হয়েছে দারুণ ঘৃণা।

কিন্তু তমসার কাছে না গিয়েও উপায় নেই, তাকে যেতে হবেই। তমসার আকর্ষণ দুর্নিবার, সকাল হতে না নিজেই মটর নিয়ে আসে, তাকে তুলে নিয়ে দমদমায় চলে যায় এরোপ্লেন চালাতে।

এ যেন একটা নেশা।

নেশা ছুটলে মাতাল মনে ভাবে আর মদ খাবে না, কিন্তু সময় উপস্থিত হলে থাকতে পারে না। ইন্দ্রনীল ভেসে চলেছে—দেখছে—ধ্বংসের মধ্যে আনন্দ পাওয়া যায় কি না।

সৈকতকে বিয়ে না করার মূলে ছিল জিদ, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা, তাতে পরাজয় ছিল না, ছিল জয়ের আনন্দ—

কিন্তু এতে আছে নিরানন্দ—পরাজয়ের দুঃসহ বেদনা, তবু একে এড়ানো যায় না;—ইন্দ্রনীল তাই ভেসে চলেছে, শেষ পর্য্যন্ত দেখতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছে। (ক্রমশঃ)

ফুজি পর্ব্বতের উদ্দেশে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

(নোগুচির 'From the Eastern Sea' হইতে)

তোমার নিঃশ্বাস বায়ু পেয়েছি যে, তাই মোরা বুঝি
মোদের অমর রূপ, হে হিমাদ্রি নগরাগ ফুজি!
নৈঃশব্দ সঙ্গীত তব, যে সঙ্গীতে পূর্ণ সুরলোক।
আছে জ্বালা, মৃত্যুভয় এ মরতে, তাই তুলি চোখ
সেই অমরার পানে, দৃষ্টি যেথা সান্দ্র সুখ ঘন।
স্রষ্টার গৌরবস্তম্ভ, হে ভূধর, প্রশস্তি কীর্ত্তন
করি মোরা জাপানের পুত্রকন্যা তোমার উদ্দেশে,
আমাদের ছায়াগুলি এঁকে দিই বক্ষে তব এসে,
সে উদার বক্ষঃস্থল চিরন্তন সৌরভ নিলয়,
হে অমলকুন্দ-কান্তি, নিখিলের অপূর্ব্ব বিস্ময়!

তুমি প্রতিদ্বন্দ্বী-হীন অনুপম গাম্ভীর্য্যে শোভায়,
অগণন নদী ভালে চিত্র-লেখা সম দীপ্তি পায়
পূত ছায়াখানি তব। গিরিরাজি ঊর্দ্ধে তুলি শির
তোমার আদেশবাণী শুনিবারে করিয়াছে ভিড়।
চৌদিক ঘেরিয়া তব উথলয় নীল অম্বুরাশি;
বুভুক্ষু শার্দ্দূল সম তীক্ষ্ণ দ্রংষ্ট্রাবলি পরকাশি'
গর্জ্জন-মুখর সিন্ধু সহসা হারায় আর্ত্তরব,
নেহারিয়া ছায়াঘন মূর্ত্তি তব মানে পরাভব,
সে জলদ মন্দ্র ধীরে লীন হয় নিদ্রালু মর্ম্মরে,
সুললিত শ্লোক স্বপ্নে শান্তি যেন পেল সে অন্তরে।

মোরা সাগরের তীরে ভুলে যাই মৃত্যুর বারতা।
মরণ মধুর বটে, তদপেক্ষা আছে মধুরতা
বেপথুল এ জীবনে। এ মরতে আমরা অমর,
হে অম্লান, হে শাশ্বত, আমরা তোমার অনুচর।

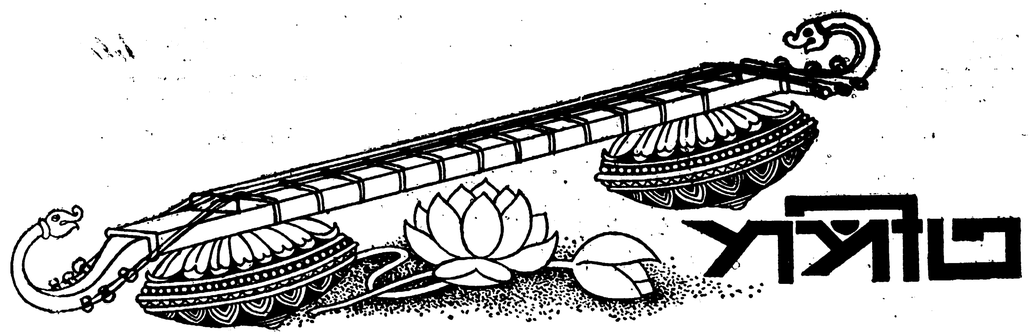

আকৃতি

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা

সুর ঃ—দ্বিজেন্দ্রলাল কথা ও স্বরলিপি ঃ—দিলীপকুমার

"নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো"—দ্বিজেন্দ্রলাল।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আজ মা প্রাণের প্রতি কলি তোর তপনের চায় যে আলো :
আজ মনে হয় : তিমির-ক্ষুধাও শরণ-সুধাই বাসে ভালো।
যত দূরেই হোক্ তোর আকাশ,
আনে তো সে-ই মুক্তি-আভাষ,
বয় যত তোর মলয়-বাতাস
মরে মরণ, ঝরে কালো :
স্বপ্ন-প্রাণের মগ্ন কলি নীল করুণার চায় যে আলো॥

প্রতিপদেই শুনি মা তোর মিলন-মণির নূপুর-ধ্বনি :
হারাই মুখর মেলায় তবু সঙ্গোপনীর আগমনী।
যতই মা তোর সিন্ধু পানে
ধায় হৃদি নদ অকূল-টানে,—
ততই স্ফটিক-ছন্দ বানে
যায় ভেসে হিম বাঁধ নিরালো :
স্বপ্ন প্রাণের মগ্ন কলি নীল করুণার চায় যে আলো॥

প'ড়ে মিছে মায়ার ফেরে কাণ পাতি মা ছায়ার ডাকে :
প্রেম-পুলিনে তাই তো বরণ-ফুল ফোটে না স্মরণ-শাখে।
আজ পিয়াসী জীবনটিরে
ঠাঁই দে মা তোর চরণ-তীরে,
আজ শ্রাবণের অশ্রু-নীরে
নিদাঘ ব্যথা দেখ্ মিলালো :
স্বপ্ন প্রাণের মগ্ন কলি তোর করুণার চায় যে আলো॥

II সা সা সরগমপা | পা পা -া | ধপধা পগা পা | মা মা পমা | গা -া মগা |
আ জ মা প্রা ণে র প্র তি - ক লি - তো র ত

রা সা -া | ন্সা রগমা গরা | গা রা গা | সা -া ন্সরা | রা রা -া |
প নে র চা য় যে আ লো - আ জ ম নে হ য়

গা রগা পা | মা মা পমা | গা রগা রগা | রা সা -া | সা ন্সা রগমা |
তি মি র ক্ষু ধা ও শ র ণ সু ধা ই বা সে -

রগা রা গা | সা পা পা | পা পা -া | ধপা ণধা পা | মা মা পমা |
ভা লো - আ জ মা প্রা ণে র প্র তি - ক লি

গা -া রগা | রা সা -া | ন্সা রগমা গরা | গা রা গা | { মা পা ধা |
তো র ত প নে র চা য় যে আ লো - য ত -
য ত ই
নী ড় প

না না র্সা | র্সা -া র্সা | র্সনা র্রর্সা নর্সা | র্রর্সা র্রণা -া | ধা পা -া |
দূ রে ই হো ক তোর আ কা শ আ নে - তো সে ই
মা তো র সি ন্ ধু পা নে - ধা য় হৃ দি ন দ
যা সী - জী ব ন টি রে - ঠাঁ ই দে মা তো র

পধা পধা র্সা | ণা র্সণা ধপাধ [-া -া] | } পণা -া ধণা | ধা পা ধা | পধা পগা পা |
মুক্ তি - আ ভা ষ ব য় য ত তো র ম ল য়
অ কূ ল টা নে - ত ত ই স্ফ টি ক ছন্ দ -
চ র ণ তী রে - আ জ শ্রা ব ণে র অ শ্রু -

মা গা -া | গা গা মা | পা না -া | র্সা নর্সা নর্সা | ধা ণধা ণপা |
বা তা স ম রে - ম র ণ ঝ রে - কা লো -
বা নে - যা য় ভে সে হি ম বাঁ ধ নি রা লো -
নী রে - বি ষা দ ব্য থা - দেখ্ মি - লা লো -

ধা -া র্সণা | ধা ধা -া | মা -া পধর্সণা | ধা পা ধা | পমা -া রগা |
স্ব প্ ন প্রা ণে র ম গ্ ন ক লি - নী ল ক

রা সা -া | ন্সা রগমা গরা | গা রা গা | সরা গমপা পা | পা পা ধা |
রু ণা র চা য় যে আ লো - আ জ মা প্রা ণে র

পধা পগা পা | মা মা -া | গা -া রগা | রা সা -া | ন্সা রগমা গরা |
প্র তি - ক লি - তো র ত প নে র চা য় যে

গা রা গা | সা সা রা | রা রা -া | রগা মগা রা | রা রা -া |
আ লে - প্র তি - প দে ই শু নি - মা তো র
প ড়ি - মি ছে - মা য়া র ফে রে -

রা গা মা | পা ধপা রা | রগা রগা পা | মা মা পমা | গা রগা রগা |
মি ল ন ম ণি র নূ পু র ধ্ব নি - প্র তি -
কা ন পা তি মা - ছা য়া র ডা কে - প ড়ে -

রা সা রা | রগা মগা রা | রা রা -া | রা গা মা | পা ধা রা |
প দে ই শু নি - মা তো র মি ল ন ম ণি র
মি ছে - মা য়া র ফে রে - কা ন পা তি মা -

রগা রগা পা | মা মা -া | মা গমা পা পা পা -া | পধা পধা র্সা |
নূ পু র ধ্ব নি - হা রা ই মু খ র মে লা য়
ছা য়া র ডা কে - প্রে ম পু লি নে - তাই তো -

ণা ণা -া | ধা পধা পা | মা গরা সা | সা রগা মপা | মা মা -া |
ত বু - সং - গো প নী র আ গ - মং নি -
ব র ণ ফুল্ - ফো টে না - স্ম র ণ শা খে -

এ গানটি দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত "নীল আকাশের" গানটির ছন্দে ও সুরে রচিত। দ্বিজেন্দ্রলাল অভিনব সুরে কী ভাবে ক্ল্যাসিকাল স্বর বৈচিত্র্যের অবকাশ রাখতেন এ গানটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এতে ছায়ানট খাম্বাজ দেশ প্রভৃতির ছোট তান কম্পন মূর্চ্ছনার অবসর প্রচুর। দ্বিজেন্দ্রগীতি-তে "নীল আকাশের" গানটির স্বরলিপির সঙ্গে এর স্বরলিপি তুলনা করলেই প্রতীয়মান হবে এ গানটির প্রতি চরণ কী ভাবে লীলায়িত করা হয়েছে মূল সুর রেখে। বস্তুত ক্ল্যাসিকাল গানের একটি প্রধান রস এইখানেই : অর্থাৎ প্রতি চরণকে নানাভাবে গাওয়া চলে হেলিয়ে দুলিয়ে তালফের ক'রে রাগফের ক'রে। শুধু তানই ক্ল্যাসিকাল ঢঙের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। প্রতি চরণের স্বরবিন্যাস গুণী নিজের প্রেরণা অনুসারে কম বেশি বদলাতে পারেন এখানেই তিনি স্রষ্টা হ'য়ে ওঠেন। এই সুরেই রচিত অনিলবরণের সুন্দর গান "তুই মা আমার হিয়ার হিয়া—তুই মা আমার আঁখির আলো" গানটি সাহানা দেবী সম্প্রতি গ্রামোফোনে দিয়েছেন, তাতে দ্বিজেন্দ্রলালের এই লীলায়িত ভঙ্গির মহিমা কিছু ফুটেছে, অল্প সময়ে যতদূর সম্ভব। ইতি।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

নৈনীতাল—দি লেক্-ল্যাণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া

শ্রীবিনয় ভট্টাচার্য্য

২৬শে সেপ্টেম্বর রাত্রি ১০-৩০। দেরাদুন এক্সপ্রেসে টান পড়লো। 'রিজার্ভ' করা কামরায় আমরা চলেছি ১৯ জন—১৬ জন ছাত্র, প্রফেসার অলোক সেন (ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধর বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র), জগদীন্দ্র বসু, আর Laboratory-in-charge দেবেন। ঘরের মায়া চিরদিনই পিছু ডাকে, তাই মনটা একবার দুলে উঠলো। এই যাবার জন্য দু'দিন ধরে কত সাজ-গোজ, কত আনাগোনা, যাকে ছাড়বার জন্য মনের প্রতি কণা হয়েছে উন্মুখ প্রতিমুহূর্ত্তে—সে আজ বিদায়-ক্ষণে পিছু ডাকে। মনে হলো, এই চলে যাবার পেছনে একটি অনন্ত বেদনার সুর রয়েছে, যে সুর—যাকে ছেড়ে চলে যাই—তাকে বড় করে তোলে, তোলে তাকে মহীয়ান করে।

আমাদের দল—বাঁদিক থেকে উপবিষ্ট—প্রফেসার অলোক সেন, ডাক্তার বি, সি, ঘোষ ও জগদীন্দ্র বসু

[ফটো—খগেন দাস

আর আমাদের যাত্রাপথ করে তোলে সুখময়, সুন্দর। ঘরের প্রতি আমরা যতই বিমুখ হই, সে বিমুখতা কত ক্ষুদ্র, তা বুঝি আমরা যখন তাকে ছাড়ি। যেমন জীবন যে কত বড় বুঝি তখন, যখন মৃত্যুর অদৃশ্যপথ দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

অচল গাড়ী এতক্ষণে বেশ সচল হয়ে উঠেছে। লিলুয়া ষ্টেশনের আলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে মিলিয়ে গেল। দেবেন এতক্ষণে আমাদের 'Luggage' গুলোর একটা সু-ব্যবস্থা করে হাঁপিয়ে উঠেছে। Luggageতো আর কম নয়—১৯ জনের সুটকেশ ১৯টি (আকারে ষ্টীল ট্রাঙ্কের দ্বিগুণ এবং ওজনের কথা বললে রেল কোম্পানীকে ফাঁকি দেবার জন্য আপনারা দুর্নাম দিতে পারেন, এই ভয়ে সেটা উহ্য রেখে গেলুম), ১৯টি 'বেডিং,' Microscope গুটি পাঁচেক, বই গাদা খানেক। রান্নার জিনিষপত্র অলোকবাবুর ওষুধের বাক্স (হোমিওপ্যাথিক থেকে এলোপ্যাথিক), আর আমাদের ধনী বন্ধুদের প্রসাধনের দ্রব্যে ভরা আর একটি করে ছোট সুট্‌কেশ।

এর ভেতরে ১৯ জনের মধ্যে চারটে দল হয়ে গেছে: অলোকবাবুকে নিয়ে জন ছয়েক বসেছে তাস নিয়ে, বন্ধুবর শৈলেন গুপ্ত, রবি মুখার্জ্জী প্রভৃতি জন চারেক আরম্ভ

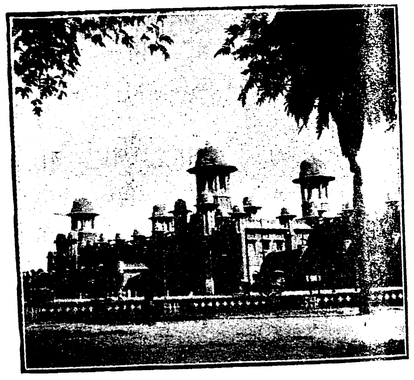

লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনের একাংশ [ফটো—শৈলেন ধর

করছেন বাঁশী এবং গান, ও কোণে চলেছে গভীর Politics আলোচনা···আবিসিনিয়া-মুসোলিনী, সমর—শৈলেন ধর প্রমুখ কয়েকজন করছেন শোবার জোগাড়। আশ্চর্য্য!—মাত্র ১৯ জন—যাদের লক্ষ্য এক, যারা একই উদ্দেশ্যে, একই কামরায় একই সঙ্গে চলেছেন—তাদের মাঝেই যদি চলার পথে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়। তবে এই ভারতবর্ষের মত দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতের সৃষ্টি না হওয়াই আশ্চর্য্য।

সীতাভোগ-মিহিদানার আওয়াজ মিলিয়ে গেল—গেল আসানসোল, কুলটীর লৌহ কোম্পানীর জ্বলন্ত furnace দেখা যেতে লাগল—ওর সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই হয়তো

উদরের অগ্নি জ্বলতে আরম্ভ হয়েছে, হয়তো সমাপ্তি পর্য্যন্ত জ্বলতে থাকবে।

কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী, রাত্রি তার সমস্ত রূপ, সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিয়ে ভরে উঠেছে আজ। রাত্রির এত ঐশ্বর্য্য এমনভাবে কোন দিন দেখবার সুযোগ হয় নি—এত ঐশ্বর্য্য যে সমস্ত পৃথিবীকে তাই দিয়ে মুড়ে ফেলেছে—তবু অজস্র আছে পুঞ্জীত হয়ে এখানে সেখানে। এ দিয়ে সে হয়তো আরো দু'তিনটে পৃথিবীকে মুড়ে ফেলতে পারে। ওর 'নীলাম্বরীর নীল-সায়রেতে' দু'চারটে নক্ষত্র জ্বলছে—যেন কাপড়ের ওপর বসানো হয়েছে জরির ফুল।

'ওরকম ভাবে মুখ বা'র করো না বিনয়, কয়লা পড়বে চোখে'—অলোকবাবুর স্বর শোনা গেল। কবিত্বে পড়ল বাধা শাসনের রূঢ় স্পর্শে, মুখ ভেতরে এনে অলোকবাবুর দলেই যোগ দিলুম—কারণ এ দলটাই এখন পর্য্যন্ত ভারী। খেলা বেশ চলেছে, কিন্তু মুস্কিল সুকেশকে নিয়ে। ওর দোষ হলেই বলে উঠবে: না স্যার, ওটা আপনাদেরই ভুল ; Culbertson এখানে বলেছেন···। অন্য খোরাক ফুরিয়ে এলেও হাসির খোরাক যোগাচ্ছিল বেশ।

তন্দ্রা একটু এসেছিল, হয়তো বা ঘুম। কাণে সুড়সুড়ি লাগাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখি অলোকবাবু হাসছেন।·· এদিকে অন্ধকার মুছে এসেছে, ভোরের আলো জেগে উঠেছে, জেগে উঠেছে আশপাশে পাহাড়ের ওপর পাখীর গান।

'নীলাম্বরীর নীলসায়রেতে রক্ত কমল দু'টি,
প্রথম ভোরের বাতাস পাইয়া করিতেছে ফুটি ফুটি'।

দেবেন রাশি-খানেক খাবার সাজিয়ে বসে বসে ঢুলছে, জন ছয়েক বাদে আর সবাই কুঁকড়ে-মুকড়ে ঘুমোচ্ছে—যেন বারোয়ারী মাঠের ভাঙ্গা যাত্রার আসর।·· চায়ের সঙ্গে হ'ল প্রচুর জলযোগ। সবাইকে আবার বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। দু'পাশে বনময় পাহাড়—তারই ওপর শাল মহুয়ার গাছ। দূরের পাহাড়শ্রেণীর পেছন থেকে সূর্য্যদেব উঁকি মারছেন।

'সুনীল গগন ঘনতর নীল অতিদূর গিরিমালা,
তারি পরপারে রবির উদয় কনক-কিরণ জ্বালা।

মোগলসরাইয়ে ভাত-মাংস খেয়ে আমাদের ১৪জন বন্ধু হতাশ হয়ে পড়লেন। আমাদের পাঁচ জনের হতাশ হতে হল না যেহেতু আমরা খেয়েছিলুম আঙ্গুর, আপেল, আর প্যাঁড়া সন্দেশ।···গঙ্গার ব্রিজের ওপর উঠেছি—এর ওপর থেকে কাশী কি সুন্দর দেখায়, যেন একখানা ছবি। মোটেই মনে হয় না এর ভেতর আছে বড়বাজারের মত ছোট ছোট গলি, আর তার দু' পাশে হাটখোলার গুদামঘরের মত

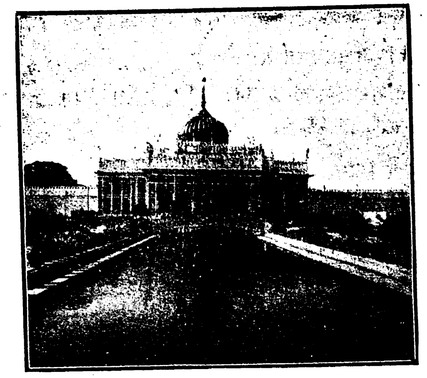

লক্ষ্ণৌ ইমামবাড়ী—ভেতরের অংশ

[ফটো—শৈলেন ধর

অন্ধকার বাড়ী। বিশ্বনাথের মন্দির দেখা গেল—নমস্কার করলুম।

ভোর থেকে চোখে পড়েছে দু-পাশে পাহাড় শ্রেণী—

ইউ-কালিপটস্ গার্ডেন, লক্ষ্ণৌ

[ফটো—রবি চট্টোপাধ্যায়

এবার আবার সমতল ক্ষেত্র, দু-পাশে ধান ও জোয়ারের ক্ষেত। জোয়ার কি জিজ্ঞেস কর্ত্তে অলোকবাবু বললেন—কেন পড়েছ তো—

বেলা দ্বিপ্রহরে—
যে যাহার ঘরে—
সেঁকিছে জোয়ারী রুটী।

মাঝে মাঝে মরুভূমির মধ্যে ওয়েশিসের মত একখানি গ্রাম দেখা যায়—খেজুর, বাবলা, আর আম গাছে ঘেরা। ছেলে-মেয়েরা ছুটে আসে গাড়ীর শব্দ শুনে, মেয়েরা ঘরের পাশ থেকে ঘোমটা তুলে দেখে…

আর সময় কাটতে চায় না। দুপুর বেলা ট্রেণে কাটে ভয়ানক কষ্টে। কেউ বা ঝিমুচ্ছে, কেউ বা বসেছে তাস নিয়ে, বাঁশী নিয়ে, বই নিয়ে, সমর তো সব সময়ই ঘুমুচ্ছে; ওই জন্য অলোকবাবু ওর নাম দিয়েছেন sleeping boy। মাঝে মাঝে দু' একটা হাসির কথা ওঠে বটে, কিন্তু তাতে ভাল জমে না—সেটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে যায়।

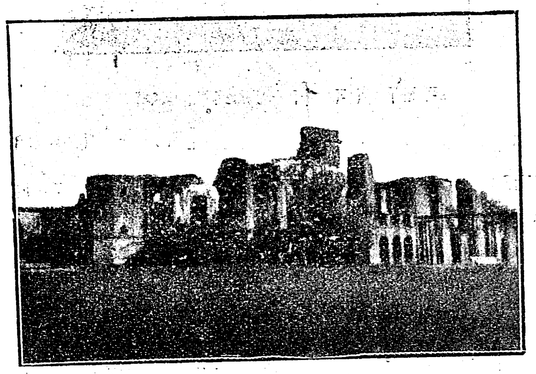

লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সি [ফটো—খগেন দাস

বাঁদরের প্রাচুর্য্য দেখে বোঝা গেল অযোধ্যায় এসেছি। যেমন ধুলা, তেমন বাঁদর। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অনেক পুরাণ ভগ্নবাড়ী পড়ে রয়েছে—দূরে অনেকগুলি মন্দির। মন্দিরের স্বর্ণ-চূড়া জ্বলছে স্থর্য্যের আলোকে।

এই একদিনের Journeyতেই সবার মন হয়েছে স্তিমিত, নিরানন্দ, উৎসাহহীন। তাই ঠিক হল লক্ষ্ণৌতে একদিন Break Journey করা যাক্। কিন্তু লক্ষ্ণৌ যে আর আসে না। কে এর নাম দিয়েছিল দেরাদুন এক্সপ্রেস—এত গরুর গাড়ীর বেহদ্দ। অলোকবাবু ত বলে উঠলেন: আমাদের কি দয়া করকে লে যাতা হ্যায়!" (অলোকবাবু এখন প্রতি কথায় হিন্দী বলেন), ৩৭ মিনিট লেট ক'রে সন্ধ্যার ছায়ায় City of Gardenএ পৌছলুম। রাত্রিটা কাট্‌ল ধর্ম্মশালায়, দিনটা কাট্‌ল টাঙ্গার ওপরে।… ইমামবাড়ী, রেসিডেন্সি, মিউজিয়াম, পশুশালা, বোটানিকেল গার্ডেন, ইউনিভারসিটি প্রভৃতির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া হল মাত্র। লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনটি ভারি চমৎকার। যাক্ সে সব কথা এখন থাক্। সে সম্বন্ধে অনেকেই বলেছেন। কিন্তু একটা কথা না বলে পাচ্ছি না। দুপুর-বেলা ষ্টেশনে গিয়েছিলুম চিঠি 'পোষ্ট' কর্ত্তে, শৈলেন ধর এবং সমর চ্যাটার্জ্জী সহ। হঠাৎ একজন পুলিস এসে আমাদের ষ্টেশনের বাইরে যেতে বললে। জিজ্ঞেস করলুম: ব্যাপার কি? উত্তর এল: I won't hear, you must get out. তার ইংরেজীর স্রোতে ভেসে আমরা ষ্টেশনের বাইরে এলুম। জনকয়েক লালমুখ মোটরে করে চলে গেলেন। হঠাৎ দেখি সেই পুলিশটা এসে বলছে: বাবু, কুছ মনে নেহি কিজিয়ে, পুলিশকমিশনার জী যাতা হো, উসি বাথ হ্যাম আপকো—। জুতা মেরে গরু দান। তবে পুলিশের এই যা। সন্ধ্যায় আবার দেরাদুন এক্সপ্রেস ধরলুম, রাত্রি ১০-৪৮ মিনিটে এল বেরিলী। এখান থেকে আমাদের R. K. R.এর ছোট গাড়ীতে উঠতে হল। খাবার সময় ছিল না বলে খাওয়া হল না, রাত্রি ৪টার সময় ভাঙ্গল ঘুম। কিন্তু কি শীত—এ যে দারুণ! সোয়েটার র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে বসতে বসতেই এল কাঠ-গুদাম, আমাদের Railway Terminus. প্রথম ভোরের অস্পষ্ট আলো, রাত্রিশেষের নক্ষত্রখচিত আকাশ, পর্ব্বত-শ্রেণীর মাঝে মাঝে প্রজ্জলিত দীপমালা, ষ্টেশনের পাশের গলা নদীর ঝিরঝিরে স্রোতের মাঝে এই অজানিত নূতন জায়গাটাকে ভারী ভাল লাগল।

'কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।'

এবার আমাদের ২২ মাইল পথ যেতে হবে বাসে। উঠতে হবে প্রায় ৫০০০ ফিটের কিছু ওপর। ষ্টেশনের গায়েই বাসষ্টাণ্ড, পোষ্ট-অফিস এবং একটি ধর্ম্মশালা। যারা কৈলাস যান, তাঁদের এখান থেকে বাসে যেতে হয় আলমোড়া, তারপর অশ্বপৃষ্ঠে ও পদব্রজে।

দুখানা বাস বোঝাই হয়ে যাত্রা করলুম। রাস্তাটি পিচের, ভারী সুন্দর। দুখানি গাড়ী পাশাপাশি যেতে পারে। পাহাড়ের ওপরের মোটর রাস্তা হিসেবে এটা পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ। গাড়ী ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে শীর্ণকায়া ঝরণা প্রথম সোণার আলোয় চিক্‌মিক্ করছে, নীচে ঝাউ ও বাবলার ঘন জঙ্গল। সার বেঁধে সব খচ্চরের পিঠে করে আলু নিয়ে আসছে। ঝরণার পাশে কলা গাছের ঝোপে ঝোপে দু' একখানি কুঁড়ে ঘর চকিতের জন্য দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায়। পথের আঁকে বাঁকে পাইন বনের ও চীর গাছের ফাঁকে শরতের সুনীল আকাশ চোখে পড়ে—মেঘমুক্ত, নির্ম্মল আকাশ। এ পথে চলতে বেশ লাগে। প্রতি মুহূর্ত্তে নব নব বাঁকে নব নব সৌন্দর্য্য পথিকের মন ভুলিয়ে প্রলোভিত করে। অনাস্বাদিত সৌন্দর্য্য প্রতিমুহূর্ত্তে হয় আস্বাদিত, আবার আসে নব সৌন্দর্য্য। কত অনাগত গত হল, অদৃশ্য দৃশ্যমান হল, গাড়ী চলল ছুটে। বেলা ৯টা নাগাৎ পৌছলুম নৈনিতাল। এর জন্য দিতে হল মাথা পিছু ১৸০ বাস ভাড়া, আর ১৲ টাকা টোল্ (Toll)। এপথে মোটরগাড়ীও ভাড়া পাওয়া যায়।

লেকের ধারে দাঁড়িয়ে একবার চারিদিকে তাকালুম। এই নৈনিতাল। একে দূর থেকে খুব সুন্দর ভেবে শান্তি পেয়েছি, ভেবেছি অমূল্য স্থান, কিন্তু আজ হাতে পেয়ে তার আর কোন মূল্যই রইল না, পাওয়া মানেই তার দর কমে যাওয়া।…শুধু পেয়েছি এই মাত্র! কিন্তু এর জন্য এত কৌতূহল, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-ব্যথা মূল্য-হীন হয়ে গেল। এ যেন ভূমিকা হল মূল্যহীন আসলের চেয়ে। অথচ আসলের জন্যই ভূমিকা।

'মার্ভেলাস্', 'চার্মিং', চমৎকার! এরকম অনেকগুলো কথা বন্ধুদের কাছ থেকে শোনা গেল। সব কথাই সত্য, খুবই সুন্দর জায়গা। এ রকম 'হিল ষ্টেশন' ভারতবর্ষে আছে খুব কম, কিন্তু তা সত্ত্বেও একে খুব বড় করে দেখেছিলাম, এ দূরত্বের ব্যবধান ভরিয়ে তুলেছিলাম কল্পনার রঙীণ রেখায়।

হিন্দুস্থান হোটেলে উঠা গেল। বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান—বিশেষ তো অবাঙ্গালীর দেশে। এখানকার কুলীরা সৎ এবং বিনয়ী। অসম্ভব দরিদ্র বটে, কিন্তু আপনি যা দেবেন তাই হাসিমুখে নিয়ে যাবে। এরা পরিশ্রমী, সাহসী এবং নির্লোভ; অশিক্ষিত বটে, কিন্তু অসভ্য নয়। থাকবার জন্য সম্পূর্ণ সাধারণ বাড়ীর ভাড়া ৩০৲-৫০৲ পড়ে। তবে বাড়ীর কর্ত্তারা ঠকিয়ে নেবার জন্য ভয়ানক চেষ্টা করে। বাঙ্গালী তাদের একটি মস্ত বড় শিকার।

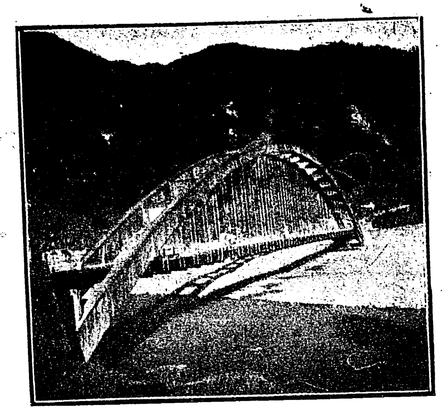

কাঠগুদাম ব্রিজ, ষ্টেশনের পাশে (নীচে গলা নদীর জল দেখা যাচ্ছে, পাশে পাহাড় শ্রেণী) [ফটো—শৈলেন ধর

হিন্দুস্থান হোটেলটি ঠিক লেকের উপরেই। তেতলায় আমাদের জন্য ৪খানা ঘর, ২টা বাথরুম, ১খানা রান্না-ঘর ঠিক হল—দৈনিক ৫৲ টাকা ভাড়া হিসেবে। দু' তিনজনের

চীনা পিক ও সহর [ফটো—খগেন দাস

থাকবার জন্য হোটেলে ১৲ টাকায় বেশ ভাল ঘর পাওয়া যায়। রান্নার জন্য ঠাকুর এবং একজন চাকর ঠিক হল। রোজ তাদের আট আনা হিসেবে। নিজেদের

খাবার ব্যবস্থা নিজেরা কর্ত্তে পারলেই ভাল হয়। তাতে খরচও বাঁচে, আনন্দও হয়—আর ইচ্ছেমত খাওয়া চলে। জিনিষপত্র অবশ্য বিশেষ সস্তা নয়। চা'ল ১০৲ টাকা মণ, ডিম ছ' আনা কুড়ি, মাংসের সের ১৪ আনা, মাছটা পাওয়া যায় কম···দর খুব বেশী নয়। আমরা ৪৸০ আনায় সের পাঁচেক একটা রুই কিনেছিলুম। খুচরা পাওয়া মুস্কিল। তরি-তরকারী প্রায় সবই পাওয়া যায়, দর কোল্‌কাতার চেয়ে কিছু বেশী, বাঁধাকপি, বীট, মূলো, টমাটো বেশ সস্তা, আমদানীও প্রচুর। আলু হয় এখানে প্রচুর—অথচ তার দর কোলকাতারই মত। কারণ উৎপন্ন যা হয়, তা প্রায়ই চালান হয়ে যায়।···হোটেলে

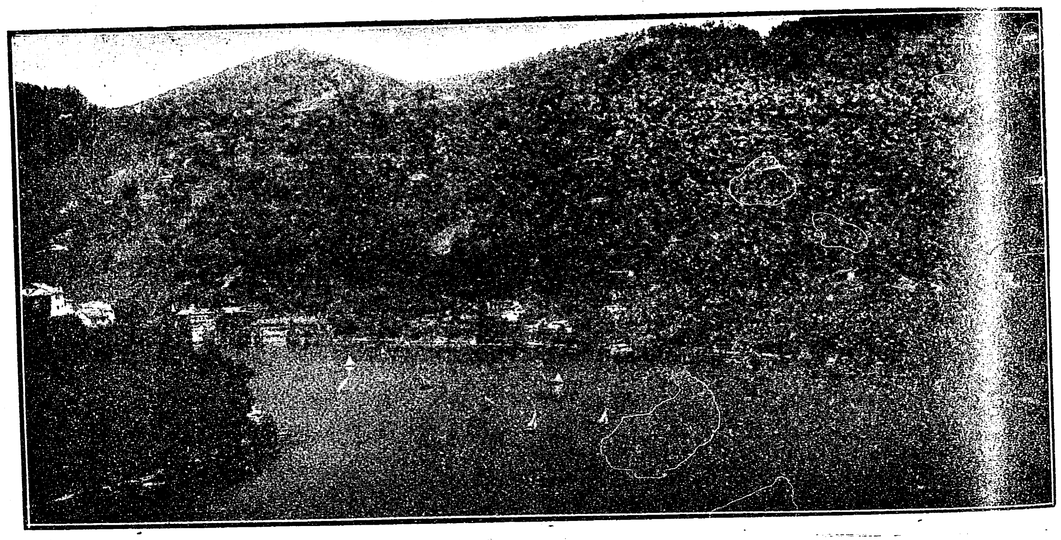

লেকের উত্তর পশ্চিমের দৃশ্য—ডাণ্ডা-হিলের একাংশ

সাধারণ দু'টো Mealএর খরচ ১৷৷০ টাকা, ভাল খেতে হলে ৩৷৷০ টাকার কম হয় না। তারপর আছে 'টিফিন' খরচ। যাক্, যখনকার যা—

বাসের পেট্রলের গন্ধে ও ঝাঁকানিতে বেশ গা বমি বমি করছিল। বন্ধুবর শৈলেন ধর নেবুটেবু খাইয়ে আমায় আরোগ্য করিয়ে তবে রেহাই দিলেন।···লেকের সামনের ছোট ঘর দু'খানার একখানা নিলেন অলোকবাবু, বাকী খানা নিলুম আমরা চারটি বন্ধু—সমর, আমি, শৈলেন গুপ্ত, শৈলেন ধর। এ দু'খানা ঘরই সবচেয়ে ভাল। ঘরের মধ্যে দু'খানা খাট, একটা সোফা, একটা ড্রেসিং টেবিল, একটা আলনা।···দিনটা কাটল জিনিষপত্র গোছাতে আর বিশ্রাম নিতে। আমি তো সন্ধ্যে পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে কাটালুম।

···চোখ খুলে দেখি দিনের কমলটি মুদে এসেছে, সূর্য্য গেছেন অস্তাচলে—কিন্তু লেকের জলে, পাহাড় শ্রেণীর ওপরে পাইন বনের শিখায় তার রক্তাভাষ রয়েছে এখনও। অনেকদিন দেখেছি দিবার বিদায়—দেখেছি মুক্ত মাঠের শেষে সুদূর দিকচক্রবালে, সমুদ্রের তীরে। কিন্তু কখনও ভাবি নি যে এর মধ্যে দেখার কিছু আছে। আজ ক্রম-বিলীয়মান রক্তিম রেখার মাঝে বিদায়মান দিবাকে দেখতে দেখ্‌তে একটা অনন্ত বেদনার সুর জেগে উঠল।··· ভোরের আলো যে রক্তিমরাগে রঞ্জিত হয়ে বিপুল পৃথিবীকে নিজের ঐশ্বর্য্য দিয়ে ভরে দিয়েছিল, তখন কে ভেবেছিল এর সমাপ্তি আছে! সমস্ত পৃথিবী যাকে চেয়েছিল নিজের প্রয়োজনে, তাকে পাওয়া হয়ে গেছে, তার আর কোন মূল্য নেই, তার বিদায়ের ক্ষণে কারো মনে নেই এক ফোঁটা দুঃখ···কেউ ফেলছে না এক ফোঁটা অশ্রু। এমনই হয়তো হয়! মানুষ যখন যৌবনের শিখায় বসে থাকে তখন কার মনে হয় সে একদিন চলে যাবে। অথচ তাকে যেতে হয়; এই বিপুলা পৃথ্বী, নীলাকাশ, আত্মীয়স্বজন ছেড়ে যখন তাকে যেতে হয়—তখন ক'জনই বা

তার কথা ভাবে, তার জন্য ফেলে চোখের জল। আমাকেও হয় তো একদিন যেতে হবে—ওই নীলাকাশ, গর্ব্বতমালা, পাইনবন, গিরিসানুদেশে সঞ্চরণশীল মেঘদল, পৃথিবীর এই অসীম ঐশ্বর্য্যসম্ভারকে ফেলে যেতে হবে

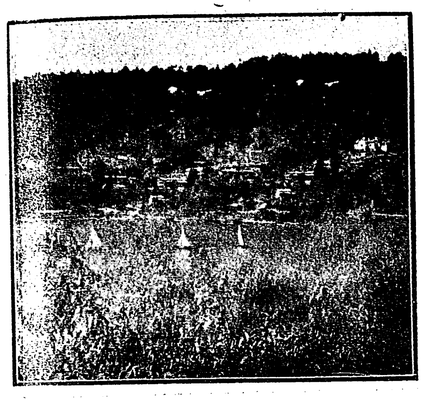

লোক ও "ডিওপাথ হিল"

[ফটো—রবি চট্টোপাধ্যায়

মহাকালের সীমাহারা সমুদ্রে মিশে—তখন এই যে সমর-শৈলেন-হরদেব, আর যারা আজ আমায় এত ভালবাসে, তারা ক'জনই বা আমার কথা ভাব্‌বে, ফেলবে আমার জন্য একবিন্দু অশ্রু? এই সামান্য কটা কথায় চোখের উৎস খুলে গেল—আমি তাকে রোধ করতে পারলুম না···

অলোকবাবু ডাকলেন চা খাবার জন্য। ওরা সবাই চা খেয়ে বিকেলেই বেরিয়েছে—আমার জন্য হলো আবার নূতন করে। বললেন: শরীরটা খারাপ লাগছে না তো আর? 'না স্যার, ঘুমিয়ে বেশ ভালই হয়েছে।'··· খানিকক্ষণ গল্প হলো। বাইরে ভয়ানক বাতাস বইতে আরম্ভ হয়েছে···ওপরের টিনগুলা যেন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বন্ধুরা সব একে একে ফিরছেন। বললুম: একটু বেড়িয়ে আসি, স্যার।

বেড়িয়ে আসবে! কেমন চমৎকার বেড়াবার সময়—চাঁদিনী রাত, বসন্তের মধুর হাওয়া—বস।

অলোকবাবুকে নিয়ে আর পারার যো নেই। পাছে কারুর শরীর খারাপ হয় এই ভয়ে তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত। কার মাথা ধরেছে তাকে দেবেন মাথা টিপে, কার মুখ ফেটেছে তাকে দেবেন 'গ্লিসারিণ' বার করে, অথচ এদিকে যে নিজের গা ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে, সেদিকে লক্ষ্যই নেই। বেরোন ভয়ানক কম, খালি Collected Plant, মাইক্রস্কোপ নিয়ে বসে আছেন, আর মাঝে মাঝে আমাদের নামে কবিতা লিখছেন। দু'একটি আমি আপনাদের উপহার দিচ্ছি:

সুকেশচন্দ্র সরকার,
পরণে 'সর্ট সার্ট' তার
ছোটখাট মানুষটি বেশ।
রাখিতে নামের মানে,
চিরুণীতে চুল টানে,
পরিপাটী রাখিয়াছে কেশ।
··· ··· ··· ···
গাড়োয়ালী টুপি পরি—
পায়জামা পায়—
টগ্‌বগ্ ঘোড়া চড়ি
নবেন্দু যায়।
··· ··· ·· ···
ঘোড়া চড়ি চীনাপিক
করিয়াছে জয়,
মোটর চড়িলে কিন্তু
বড় বমি হয়।

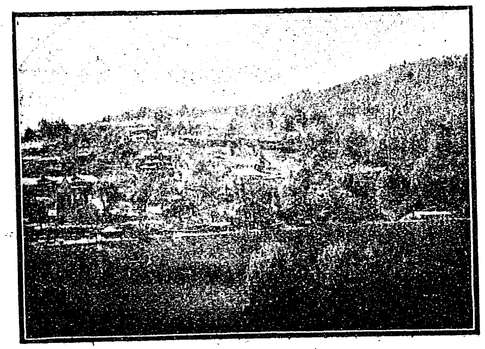

আয়ার পাথ হিল [ফটো—শৈলেন ধর

ওঁর অনুরোধে বসলুম বটে, কিন্তু বেশী দু'চারজন আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি উঠে পড়লুম এক ফাঁকে।

নৈনীতালকে প্রাচীনত্বের মর্য্যাদা দেওয়া যেতে পারে।

স্কন্দপুরাণে এই স্থানটি ত্রিঋক্ষী সরোবর বা ত্রিশেখর নামে অভিহিত আছে। ত্রিঋক্ষী বা ত্রিশেখর মানে—তিনটি ঋষির দ্বারা সৃষ্ট সরোবর। এক সময় মুনিবরত্রয় অত্রি, পুলস্ত্য ও পুলহ কৈলাস যাবার পথে এই স্থানে উপস্থিত হন। জলের কোন উৎস বা নদী না থাকাতে জলাভাবে তাঁদের অত্যন্ত কষ্ট অনুভূত হতে লাগল। সুতরাং তাঁরা এখানে একটি ক্ষুদ্র সরোবর খনন করেন এবং এটা তৎক্ষণাৎ জলের দ্বারা পূর্ণ হয়। সেই অতি ক্ষুদ্র সরোবর থেকেই এই লেকের উৎপত্তি। বর্ত্তমান নামটি হয়েছে নৈনীদেবী ও লেকের সংযোগে। হিন্দীতে তাল মানে বড় সরোবর। নৈনী হয়েছে নয়ন থেকে।

সে সব ছেড়ে দিয়ে বৃটিশ রাজত্বে আসা যাক্। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে লেকটির প্রথম অস্তিত্ব জানা যায়। তখন এ স্থান বন্যজন্তুতে পূর্ণ গভীর জঙ্গলে আবৃত ছিল। শুধু তাই নয়—ভূত এবং পরীরাও নাকি এখানে বাস করত। তাই ভয়ে কেউ এদিকে আসত না। শুধু বসন্ত ও বর্ষায় রাখালেরা দল বেঁধে তাদের গৃহপালিত পশুর দলকে খাওয়াবার জন্য নিয়ে আসত, কারণ পশুর খাদ্য ছিল প্রচুর। কিন্তু দল বেঁধে এলেও তাদের দু'চারজনকে প্রায়ই পাওয়া যেত না, তাই তারা পূজার দ্বারা নৈনীদেবীকে

ডাণ্ডা হিলের ওপর থেকে লেকের দৃশ্য

[ফটো—খগেন দাস

সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করত। তাদের এই পূজার এবং ভক্তির দ্বারা মন্দিরটি লুপ্ত না হয়ে সুরক্ষিত হয়ে আছে।

১৮৩৯ সালে Balten এবং Mr. P. Barren লেকটির অস্তিত্ব প্রথম সভ্যজগতে প্রচার করেন। তাঁরা আলমোড়ায় এসেছিলেন শিকার কর্ত্তে। তাঁদের দেশীয় পথপ্রদর্শকেরাই এখানে তাঁদের নিয়ে আসে। জায়গাটিকে দেখে Barren এর কি মনে হয়েছিল, সেটা তিনি "Pilgrim" নামে

চীনামল বা খেলার মাঠ [ফটো—শৈলেন ধর

"Agra Akbar" পত্রিকায় যা লিখেছিলেন, তাই থেকে খানিকটা আমি আপনাদের উপহার দিচ্ছি :

"An undulating lawn with a great deal of level ground interspersed with occasional clumps of Oak, Cypress and other beautiful trees, continues from the margin of the lake for upwards of a mile up, to the base of a magnificient mountain standing at the further extreme of this vast amphitheatre, the sides of the lake are also bounded by splendid hills and peaks which are thickly wooded down to water's edge. On the undulating ground between the highest peak and the margin of the lake there are capabilities for a race-course, cricket ground etc. and building sites in every direction for a large town."

মধু লোভে অনেক ভ্রমরের হল আগমন, কাগজে কাগজে বেরুলো প্রচুর ছবি, তখনকার কমিশনার Mr. Lushingtonএর দৃষ্টি ফিরল এদিকে। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে লালা মতিরাম সা Mr. Barren কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে কয়েকখানা বাংলো তৈরী করেন। ক্রমশ এল লোকজন, বাড়ল বাড়ী, হল বাজার দোকান, অল্প খাজনায় হল

'মৌরসী' ব্যবস্থা, অল্প দিনেই হয়ে উঠ্‌ল নগর। Sir Acmy Ramsay নৈনীতালকে তাঁর হেড কোয়ার্টার করলেন—'তারাইয়ে'র দস্যুদলকে দমনের জন্য। একটা ব্যারাক হল সৈন্যদের জন্য। তা ছাড়া অসমর্থ (convalescent) ব্রিটিশ সৈন্যরা এসে দখল করলেন খানিকটা স্থান, আর ক্যাণ্টনমেণ্ট যে হল এ কথা না বল্লেও চলে। তবে শেষের দু'টো সহরের ওপর নয়—কিছু নীচে। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে কাঠগুদাম পর্য্যন্ত রেলপথ হল। সোনায় সোহাগা! দুর্গম হল সুগম, সুদূর হল অতি নিকট, এর পর আর কি থাকতে পারে?···এর পরে হল ইউ. পি, গবর্ণরের গ্রীষ্মাবাস। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে landslip হয়। এর ফলে পুরাণ বাড়ী ঘরদোর অনেক নষ্ট হয়ে যায়, বহু লোকের (১৫১ জন) মৃত্যু ঘটে বটে, কিন্তু তাতে নূতন করে নগর তৈরী করবার সুবিধে হয়েছিল প্রচুর।

পথ চলতে চলতে দেখি রাস্তায় ইলেক্‌ট্রিক আলোগুলা সব নিভে আসছে। কি ব্যাপার! 'পাওয়ার' হাউস বন্ধ হয়ে গেল নাকি! আলোগুলা নিবু নিবু হয়ে আবার দিব্যি জ্বলে উঠল। হোটেলে এসে শুনলুম, এটা রাত্রি ৮টার চিহ্ন, যেমন কোল্‌কাতার বেলা ১টার চিহ্ন তোপধ্বনি।

সকাল বেলায় যাত্রা করা হল Sher-Ka-Danda শিখর উদ্দেশে, প্রায় ৮০০০ ফিট উঁচু। রাস্তাটি ভারী সুন্দর! কত বনফুল ফুটে আছে দু'পাশে পাইন ও ঝাউ বনের ছায়ায়, বউ কথা কও পাখীর ডাক, পাহাড়ে পাহাড়ে তার প্রতিধ্বনি। মনটা একটা গভীর প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। পাহাড়ের ওপর অনেক বাড়ী-ঘর আছে—চাষও হচ্ছে বহু জায়গায়। এর ওপর থেকে snow range ভারী সুন্দর দেখায়—একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সাদা ধব্‌ধবে তুষারশ্রেণী। তুষারাবৃত শিখরগুলার নাম জেনেছিলাম 'চীনাপিক' থেকে। সেটা যথাসময়ে বলবো। ফেরবার পথে একজন লোককে দেখে ভয়ানক আকৃষ্ট

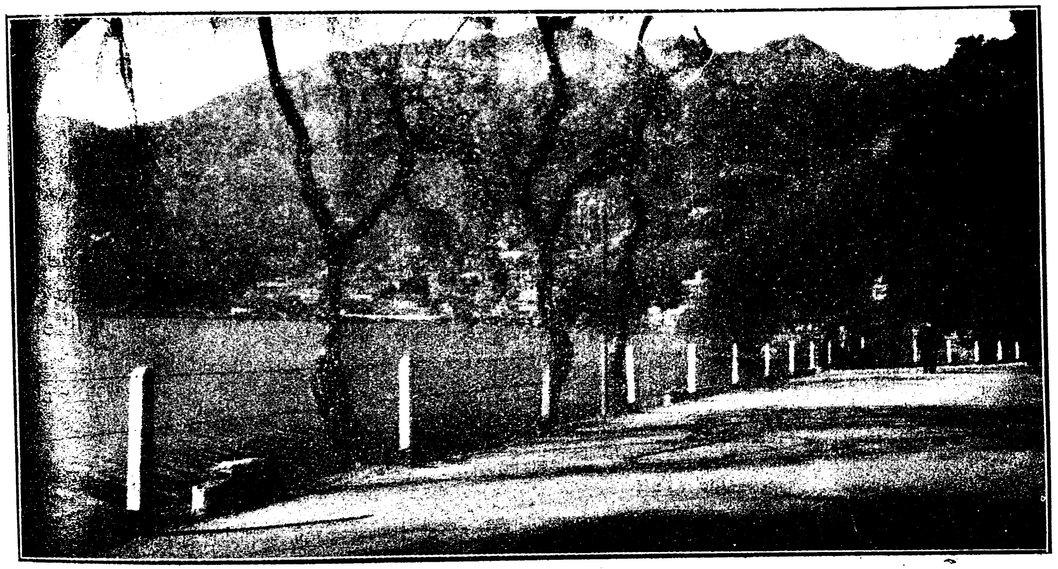

লেকের একাংশ ও পথ। দূরে চীনাপিক ও নগর দেখা যাচ্ছে

হলুম। পাইন-ঘেরা ডালিয়া ফুলের অজস্র সমারোহের মধ্যে তাঁর বাংলোখানি। বসে বসে গীতা পড়ছেন, বছর পঞ্চান্ন তাঁর বয়েস। মুখখানি ভারী সুন্দর—কমনীয়তা, ঔজ্জ্বল্য এবং গাম্ভীর্য্যে ভরা। তাঁর উজ্জ্বল চোখদুটি আকর্ষণ করে, বিকর্ষণ করে না। বন্ধুদের ঠাট্টার ভয়ে আপাতত তাঁর কাছে যাবার ইচ্ছে স্থগিত রাখতে হল।

বিকেল ৪৷৷০টা নাগাৎ চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লুম সকাল-বেলাকার সেই ভদ্রলোকের উদ্দেশে। দুটি পাহাড়ীর সঙ্গে বসে গল্প করছেন, নমস্কার কর্ত্তে ঘাড় নাড়লেন। হেসে

বললেন: কি চান্? কি চান! ভদ্রলোক বাঙ্গালী তাহ'লে—বেশ একটু আশ্চর্য্য হলুম। কথায় কথায় নানা দেশের নানা কথা উঠল, কিন্তু তিনি নিজের সম্বন্ধে আমাকে সব সময়েই অজ্ঞাত রেখে চললেন। আচ্ছা মানুষ তো! মানুষের স্বভাবই তো নিজের কথা বলা, কিন্তু এ যে দেখছি সম্পূর্ণ উল্টো।

ভগবানের কথা উঠল শেষে—বল্লেন—ভগবান কি, সে সম্বন্ধে আমার কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। আমার মনে হয়, বিশ্বের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে, তারায় তারায়, গ্রহে গ্রহে প্রকৃতির মাঝে যে সুন্দর রূপের, সৌন্দর্য্যের বীজ বুনে চলেছেন তাকে পাওয়াই মানব জীবনের চরম সার্থকতা।··· তাকে পেতে হয় সুন্দরের সাধনা করে, প্রকৃতিকে ভালবেসে, প্রেমের মধ্য দিয়ে। এ জন্যই সেকালের মুনিরা

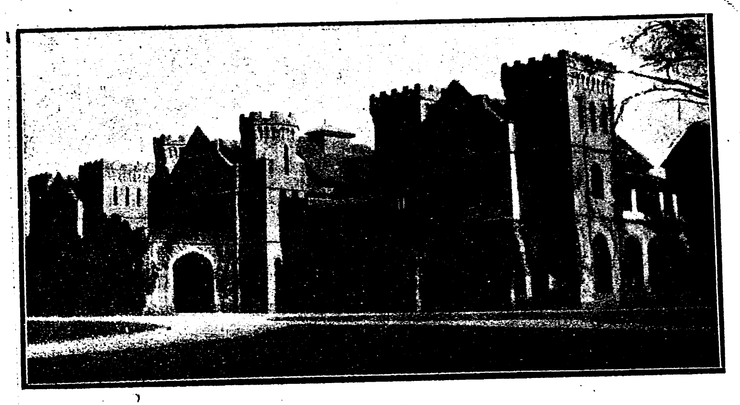

গবর্ণমেণ্ট হাউস

তাঁদের আশ্রম করতেন সৌন্দর্য্যময় প্রকৃতির কোলে, যাতে প্রকৃতির সেই খণ্ড সৌন্দর্য্যকে ভালবাস্‌তে শিখে সেই বিরাট অখণ্ড সুন্দরকে ভালবাসতে পারেন।

প্রেম ছাড়া তাঁকে তো আর পাওয়া যায় না। এ জন্যই তো কবিরা বলেছেন:

"I know
That love makes all things equal:
I have heard
By mine own heart this joyous
truth averred:
The spirit of the worm beneath the sod
In love and Worship blends itself
with God."

প্রকৃতিই মানুষের ভালবাসার নির্ঝরিণী খুলে দেয়, তাকে সুন্দরের পথে এগিয়ে দেয়, এই সসীম রূপের মধ্য দিয়ে তাকে অসীমের পথে নিয়ে যায়। Wordsworth বলেছেন:

···Knowing that nature never did betray
The heart that loved her; it is her
privilege
Through all the years of this our
life, to lead
From Joy to Joy: for she can so enform
The mind that is within us, so impress
With quietness and beauty and so feed
With lofty thoughts·····

প্রকৃতির সম্পদ ও নির্জ্জনতার মাঝেই তো আমরা তাকে পাই।

In solitudes
Her voice came
to me, through the
whispering woods.
And from the
fountains, and the
odours deep
Of flower, which like
lips murmuring in
their sleep
Of the sweet kisses
which had lulled
them there.

রবীন্দ্রনাথও তো এই কথা বলেছেন:

বনদেবীর দ্বারে দ্বারে
শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি,
আকাশবীণার তারে তারে
জাগে তোমার আগমনী।

অনেক কথাই বলে গেলেন তিনি, একচিত্তে পান করছিলুম। স্থলের অধিবাসীদের কাছে যে সাগরের কথা চিরদিনেরই প্রিয়।

গিরিবনে সন্ধ্যা নেমে এসেছে, ঘরে ঘরে জ্বলে উঠেছে দীপ দু'একটি করে, আকাশ উঠেছে স্তব্ধতায় ভরে··· দু' একজন করে প্রায় জন পাঁচেক পাহাড়ী তাঁর কাছে ওষুধ

নিয়ে গেল, একটি সাহেব এসেও কয়েক মিনিট তাঁর সঙ্গে কথা বলে গেলেন···একা একা এতটা পথ যেতে হবে ভেবে একটু ভয় করছিল, তিনি সেটা হয় তো লক্ষ্য করলেন, বল্লেন: ভয় করবে বুঝি একা যেতে—এই রুদ্র—বাবুকে লে যাও তো বীচমে···

আসবার আগের দিন আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলুম। রুদ্রের ভাঙ্গা হিন্দী মারফত শুন্‌লুম, ভদ্রলোক এখানে আছেন প্রায় ২৫ বছর। গবর্ণমেণ্টের চাকরী করতেন, এখন 'পেন্‌সান' পান। বন্ধনের মধ্যে স্ত্রী ছিলেন, তিনি বছর সাতেক মারা গেছেন। দু'টি ছোট ভাই আছেন, তাঁরা কানপুরে ব্যবসা করেন। ভদ্রলোক নানারকম রোগের ওষুধপত্র জানেন এবং বিনামূল্যে পাহাড়ীদের দেন বলেই পাহাড়ীরা তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। দু'জন ইউরোপীয়ানের 'থাইসিস'ও নাকি তিনি সারিয়ে দিয়েছেন তাঁর ওই গাছগাছড়া দিয়ে।

ভয়ে ভয়ে হোটেলে ঢুকছি—কিন্তু ভয়ের পরিমাণ বেশী যেখানে, বিপদও সেখানে তত বেশী। পড়লুম একেবারে জগদীন্দ্রবাবুর সামনে। বললেন: এত রাত পর্য্যন্ত লে কে র ধারে! তুমিই আমাদের মজাবে দেখছি। অলোকবাবু ডাকলেন, চোখ কাণ বুজে একটা মিথ্যে উত্তর দিতে বলে উঠলেন: আজ যে Silver Fun সংগ্রহ করা হয়েছে, দেখেছ! ওগুলো সাধারণত···এই রে!—অলোকবাবু যদি এখন 'বোটানি' বোঝাতে আরম্ভ করেন···। তপেশচন্দ্র বাঁচালে আমায়। বলে উঠল: চেপে যান স্যার এখন, পড়াশুনা হবে কাল সকালে। অলোকবাবু সত্য সত্যই চেপে গেলেন।

ঘরে ঢুকে দেখি বন্ধুত্রয় কম্বলমুড়ি দিয়ে গল্প করছেন: যে গল্প সমবয়স্ক তরুণেরা—একত্র হলে করে থাকে। দলে যোগ দিলুম।

'আজ তো তুমি ছিলে না বিনয়, আজ যা দেখেছি ··'

আগেই বলেছি নৈনীতাল সহরটির ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী নয়—তার যত মূল্য লেকটিকে নিয়ে। লেকের চারপাশে একটি সরু রাস্তা, রাস্তার পাশে 'উইপিং উইলো', পাইন প্রভৃতি গাছের সারি, মাঝে মাঝে গাছের তলায় বেঞ্চি পাতা। চার পাশে উঠে গেছে চারটি পাহাড়—লেকের উত্তরে—'চীনাপিক', পুবে Sher-ka-danda (এর সম্বন্ধে আগেই বলেছি), পশ্চিমে Deopatha আর দক্ষিণে হচ্ছে Ayarpatha.

লেকটি লম্বায় ১৫৬৭ গজ (১ মাইলের কিছু কম), চওড়ার দিকে ৫০৬ গজ, আর গভীরতায় ৯৩ ফিট। লেকের বেষ্টনী দু' মাইলের কিছু ওপর। লেকের প্রধান Inlet বা জলের প্রবেশ পথ হচ্ছে Deopatha পর্ব্বতের একটি ঝরণা—অবশ্য ঝরণা তাকে ঠিক বলা যায় না, ইট দিয়ে তার দু'পাশ গেঁথে দিয়ে তাকে বৃহৎ নর্দ্দামা আকারে

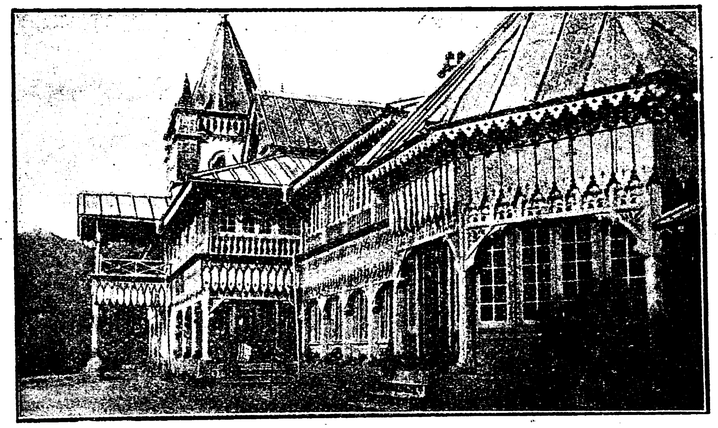

রামজে হাসপাতালের একাংশ

পরিণত করা হয়েছে। এই জলস্রোতের উৎপত্তি স্থান যে কোথায় - তা আমরা খুঁজে বার করতে পারি নি। শুনেছি, এটা অনেক বছর থেকে আসছে। এটা ছাড়া আরো দু'চারটে ক্ষুদ্র প্রবেশ পথ আছে বটে, কিন্তু সব সময় তা দিয়ে জল আসে না। লেকের জলের পরিমাণ সমান রাখার জন্য দক্ষিণ পারে, নৈনীতাল পোষ্ট অফিসের নীচ দিয়ে একটি জলনির্গম পথের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার ফলে হয়েছে একটি ছোটখাট জলপ্রপাতের সৃষ্টি। ভারী সুন্দর এ জায়গাটা—উৎক্ষিপ্ত ফেনময় জলকণার ওপর যখন সূর্য্যকিরণ এসে পড়ে তখন এমন চমৎকার দেখায় ··। এই জলের দ্বারা 'বালিয়া' নদীর সৃষ্টি এবং বালিয়া নদী গিয়ে

পড়েছে 'গলা' নদীতে। এই বালিয়া নদীর জল নিয়ে electric current তৈরী হচ্ছে। 'পাওয়ার হাউস'টি প্রায় ১০০০ ফিট নিচুতে—ছোট্ট 'হাউস'টি। লেকের দক্ষিণ পারে নৈনীতাল বাজারের কাছে একটি sulphur Spring আছে।

'চীনা পিকটি' হচ্ছে সব চেয়ে উঁচু, ৮৫৬৪ ফিট; তার মানে ওর ওপর উঠতে হলে দু'হাজার ফিট উঠতে হয় লেকের পার থেকে। ওপরে ওঠার জন্য 'মিউনিসিপালটীর' রাস্তা আছে, ডাণ্ডী বা ঘোড়ার সাহায্যে যাওয়া যায়। হেঁটে যাওয়া খুব শক্ত—আর হেঁটে খুব কম লোকই যায়। যাঁরা যাবেন তাঁদের দল বেঁধে যাওয়া উচিত এবং হাতে লাঠি থাকাও দরকার। মাঝে মাঝে নাকি ভাল্লুক, নেকড়ে বা পাহাড়ী সাপের সাক্ষাৎ মেলে। আমরা ৯ জন গিয়েছিলুম, উঠতে প্রায় ২ ঘণ্টা ১৩ মিনিট লেগেছিল। রাস্তা ৬ মাইলের কিছু ওপরে। জায়গায় জায়গায় খাড়াই ভয়ানক বেশী, এক জায়গায় ১০০ গজে ৩০০ ফিট উঁচু হয়েছে। শিখরের ওপর দু' চারটে ওক এবং রডোডেনড্রণ গাছ দেখা গেল। কে একজন বলে উঠল :

'শিখর-শাখায়'

'উদ্ধত যত শিখর-শাখায় রডোডেনড্রণগুচ্ছ।'

শিখরটি limestone ও slate পাথরের তৈরী। slate পাথরে বহু লোকের নাম লেখা রয়েছে দেখলুম, আমরাও দু' চারটে বাড়িয়ে দিলুম মাত্র।

এর ওপরে উঠা হয় Snow Range দেখার জন্য। খুব পরিষ্কার দেখায়, সামনে বনময় পাহাড়শ্রেণী, তার মাঝে মাঝে শীর্ণকায়া জলস্রোত গৃহত্যাগী বৈরাগীর মত কোন সুদূরে যাত্রা করেছে। এই পাহাড়শ্রেণীর পরপারে দাঁড়িয়ে আছে তুষারময় গিরিশ্রেণী অসীমতে একটা সীমারেখা টেনে। এদের সব চেয়ে উঁচু শিখরটি নন্দাদেবী (২৫৬৬৭ ফিট), তারপর কামেট (Kamet ২৫৪৪৩) এবং ত্রিশূল (২৪০০৬)। এখান থেকে এদের দূরত্ব যথাক্রমে ৭৫,১০৫ ও ৮৬ মাইল। কুয়াসায় ঢাকা না থাকলে Snow Range অত্যন্ত সুন্দর দেখায়—একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত স্ফটিকের মত শুভ্রতায় জ্বলছে। সূর্য্যের আলো ভেঙে টুকরো টুকরো—হয়ে গিয়ে সাতরঙা রামধনুর মত দেখাচ্ছে……

সব দিন আবার তুষারশ্রেণী দেখা যায় না। প্রায়ই মেঘে ও কুয়াসায় ঢাকা থাকে। তখন শুধু শিখর তিনটে দেখে ফিরে আসতে হয়। পরেশ মজুমদার মশাই বলছিলেন—আমি তিন দিন গেছি, কিন্তু একদিনও

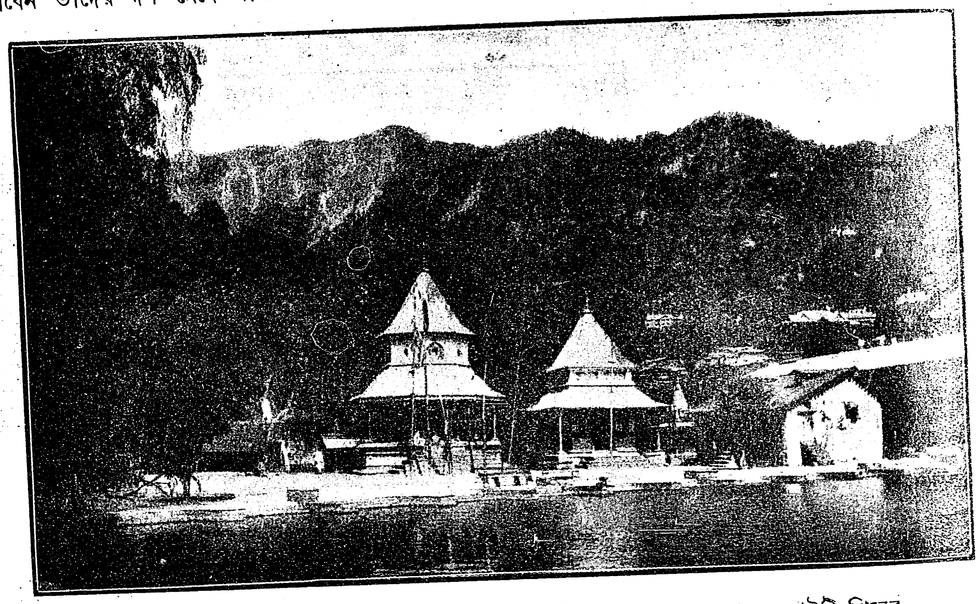

নৈনীদেবীর মন্দির। প্রথমটি নৈনীদেবীর, পাশেরটি ভ্যারোর, একেবারে ছোটটি শিবের

ভাল দেখতে পাই নি। আমাদের ভাগ্য সে হিসেবে ভাল বলতে হবে। যাদের এর ওপর উঠে দেখা অসুবিধে হবে, তাদের আমি Sher-ka-danda থেকে দেখতে অনুরোধ করি। তাতে বেশী কষ্ট হবে না।

Deopatha শিখর ৭৯৮৭ ফিট। এ পাহাড়টি অত্যন্ত ভগ্ন, অসমতল এবং গভীর বনে ঢাকা। বাঁশ ও অর্কিডের গাছ অনেক দেখা গেল। এর ওপর প্রায় জায়গাতেই লেখা রয়েছে 'Beware of falling stones; পাহাড়ের চাঁইগুলি এমন আল্‌গা হয়ে রয়েছে, যে মনে হয় প্রতি মুহূর্ত্তে পড়ে যাবে। পাহাড়টি ক্রমশ পশ্চিমে ঢালু হয়ে গিয়ে সমতলে মিশে গেছে। বাড়ী ঘর দোর খুব কম এর ওপরে।

Ayarpatha পাহাড়টি সব চেয়ে ছোট ও নিরাপদ, St. Joseph college, গবর্ণমেণ্ট হাউস এবং অন্যান্য অনেক বাড়ী রয়েছে এর ওপরে। St. Joseph কলেজটি এখানকার সব চেয়ে বড় কলেজ।

গবর্ণমেণ্ট হাউসটির কথা বেশী বলা বাহুল্য। ওখানে যতদূর ভাল করা সম্ভব তা হয়েছে। আগে এটি ছিল Dunda Hillএ, কিন্তু সেটা নিরাপদ মনে না হওয়ায় ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে এখানে বাড়ী আরম্ভ হয়, সেটা শেষ হয় ১৯০০ খৃঃ অব্দে।

Ayarpathaএর তলায় তালিতাল বাজার ও পোষ্ট আফিস। বাজারটি ছোট, জিনিষপত্রের দরও বেশী। নৈনীতাল বাজার এর চেয়ে অনেক ভাল—সব দিক থেকেই।

Ramsay Hospitalটি Danda Hillএর ওপর। চিকিৎসা যেমন ভাল, খরচপত্রও তেমনি কম। বাঙ্গালীর প্রবেশলাভ কষ্টকর। মাইলখানেক দূরে Manora Epidemic Hospital আছে; সেখানে সংক্রামক রোগের চিকিৎসা করা হয়।

থাইসিসের রোগীকে নৈনীতালে ঢুকতে দেওয়া হয় না। তাদের চিকিৎসা হয় ভাওয়ালীতে—এখান থেকে মাইল ছয়েক দূরে। সেখানে কয়েকটি যক্ষ্মানিবাস আছে। তাতেও বাঙ্গালীর প্রবেশলাভ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। সুখের কথা আমাদের একজন বাঙ্গালী ডাক্তার এখানে একটি যক্ষ্মানিবাস স্থাপন করেছেন। নিবাসটি বেশ ভাল—চিকিৎসাও উন্নতধরণের। ঘূর্ণায়মান ঘরগুলার দ্বারা রোগীকে সব সময়ই সূর্য্যালোক উপভোগ করান যেতে পারে। এখনও অবশ্য খুব বড় করে তুলতে পারেন নি, তবে দেশবাসীর সাহায্য পেলে অচিরেই যে এটা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আগেই বলেছি আসল সহরটি চীনাপিকের পাদদেশে। ঘরবাড়ী দোকান-বাজারে বোঝাই একেবারে। নৈনীতাল বাজারটি বেশ ভাল; এখান থেকে বাজার করাই সাধারণের সুবিধে। এর কাছেই বিস্কুট ফ্যাক্টরী, Hydro electric water works প্রভৃতি। কলের জলটি বেশ সুস্বাদু, সব সময়েই পাওয়া যায়। পথে ঘাটে, পাহাড়ে-পাহাড়ে, খানিকটা অন্তরই কল বসান আছে।

নৈনীদেবীর মন্দিরটি হচ্ছে লেকের উত্তর প্রান্তে।

চীনা পিক থেকে তুষার-শ্রেণী

পাশাপাশি তিনটি মন্দির: প্রধানটিতে নৈনীদেবীর মূর্ত্তি। দেবীর মূর্ত্তিটি ছোট, দেহ ঢাকা। চোখ তিনটি বেশ বড় বড় এবং সোণা দিয়ে বাঁধান। অন্য দু'টি মন্দিরের একটিতে আছেন শিব, অপরটিতে ভ্যারে (অনেকটা আমাদের হনুমানের মত)। বর্ত্তমান মন্দিরটি দেবতাসহ পুনরায় নির্ম্মিত হয়েছে—১৮৮২ খৃঃ অব্দে আসলের জায়গায়। কারণ আসল বা পুরাতন মন্দিরটি landslip (পাহাড়খণ্ড পতন)এর ফলে নষ্ট হয়ে যায়, দেবতা যান চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে। পুরাতন মন্দিরটি যে কত পূর্ব্বে স্থাপিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না—তবে এটা যে খুব পুরাতন সে বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ।

নৈনীমন্দিরের পেছনে China Mall বা খেলার মাঠ—

নৈনীতালের একমাত্র বৃহৎ সমতল ক্ষেত্র, বেষ্টনীটি প্রায় ১ মাইল। এটা গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি, কিন্তু রক্ষার ভার মিউনিসিপ্যালিটীর ওপর। স্থানীয় ক্লাবেরা এটা মিউনিসিপ্যালটীর কাছ থেকে জমা নিয়ে থাকেন। এখানে ঘোড়ায়-চড়া থেকে, ক্রিকেট, ফুটবল, হকি প্রভৃতি সবই চলে।

পান্‌খান (Pankhan) দেবীর একটি মন্দির আছে Dédpothaএর তলায়। দেবীর মুখখানি লালটক্‌টকে—তার মধ্যে জিবখানিই সর্ব্বস্ব।

দুটি সিনেমা আছে এখানে—Capital ও Plaza। এদের মধ্যে Capital Cinemaই ভাল। টিকিট যথাক্রমে আট আনা ও ছ' আনা থেকে উর্দ্ধে।

দু'টি ব্যাঙ্ক—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও নৈনীতাল ব্যাঙ্ক, Lending Library, পাঁচ ছ'টি স্কুল। একটি Govern-

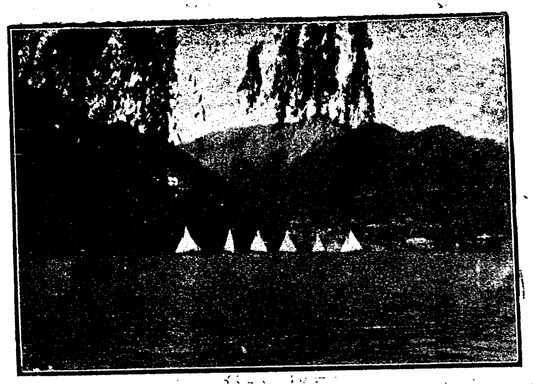

লেকে ইয়ট (yacht) খেলা
[ফটো—খগেন দাস

ment Carpentary Schoolও চোখে পড়ল। এ স্কুলটির 'কোর্স' তিন বছরের—ছেলে আছে মোট ৪২টি।

হোটেলের মধ্যে Metropol, Empire, Royal, Y. M. C. A. এবং Hindusthan বিখ্যাত।

এইটুকু জায়গায় চার্চ্চের সংখ্যাধিক্য দেখে অবাক হয়ে গেলুম। ভাবলুম, সংখ্যাধিক্য বেশী কার—ধার্ম্মিকের, না অধার্ম্মিকের?

শীত, বসন্ত ও বর্ষা—এই তিনটি মাত্র ঋতু এখানে। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বরফ পড়ে—সিনেমা, হোটেল, দোকান, বাজার প্রায়ই বন্ধ হয়ে যায়, তিনভাগ লোক প্রায় নীচে নেমে যায়। স্বাস্থ্য এখানকার খুব ভাল।

লেকে নৌ-বিহার ও মাছ-ধরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, আর স্থলে উল্লেখযোগ্য ঘোড়ায় চড়া। লেকটিকে পারাপারের ভাড়া ৬ জনের ১২ আনা। ঘোড়া ঘণ্টায় ৬ আনা থেকে আট আনা। yacht (ইয়ট)গুলা কেবলমাত্র ওখানকার ক্লাবের সভ্যদের জন্য।

.. ...কবি সত্যই বলেছেন : To me high mountains are a feeling। এক একদিন যখন লেকের ধারে বেঞ্চিতে একা একা বসে থাকি তখন এমন সব কথা মনে হয়...মনে হয় এই গিরিবনের শ্যামলিমার পেছনে, ওই সৌন্দর্য্যের অন্তরালে একজন দেবতা আছেন...যিনি পৃথিবীর এই সমস্ত সৌন্দর্য্যের আধার—তিনি আমাদের তাঁর কাছে ফিরে যাবার জন্য নিয়ত ডাকেন, পথ দেখিয়ে দেন...

এই মানবমণ্ডলী, ওই প্রাণীকুল, কীট-জগৎ একদিন হয় তো তাঁরই অংশ ছিল—মহাকালের ঘূর্ণায়মান চক্রে ছিন্ন হয়ে জন্মের আরম্ভে সকলেই কীটাণুকীট হয়ে করেছিল জন্মগ্রহণ...তার পর তাঁরই দর্শিত পথে চলে... প্রেমের পথে সুন্দরের সাধনা করে ওদেরই এক দল কত জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে সেই ক্ষুদ্র কীটাণুকীট থেকে অভিব্যক্তির পথে সরীসৃপ পশুপক্ষী হয়ে মানবজন্ম লাভ করেছে...এখনও তাদের সাধনা শেষ হয় নি, যে দিন শেষ হবে সেদিন ওই বিরাট অসীমের সাথে গিয়ে লীন হয়ে যাবে...। তিনি তাদের সব ফিরে পেতে চান, কারণ তারা যে বিরাট তাঁরই অংশ—তাদের ছাড়া যে তিনি অসম্পূর্ণ।

আমি তাঁকে পেতে চাই না...আমি তাঁর সাথে মিশে লীন হয়ে যেতে চাই না...। যে লক্ষ কোটী বৎসর ধরে প্রেমের মধ্য দিয়ে সুন্দরের সাধনা করে আজ মানবজন্ম লাভ করেছি, তাকে আমি হারাতে চাই...আবার সেই কীটাণুকীট হয়ে চাই জন্মাতে। সুন্দরের সাধনা করে লক্ষ কোটী জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে আবার মানব হয়ে জন্মাবো...আবার ফিরে যাবো সেই কীটাণুকীটে...। আমি তাঁকে পেতে চাই না, আমি শুধু চাই তাঁকে পাবার আশায় আশায় থাকতে...কোটী কোটী বৎসর...অনন্ত কোটী বৎসর ...সৃষ্টির সমাপ্তি পর্য্যন্ত...

আমার সামনে থেকে ওই নৈনীদেবীর মন্দির অদৃশ্য হয়ে যায় ধীরে ধীরে...ওই সন্ন্যাসীদের ভ্রান্ত, অলীক বলে মনে হয়...পরপারে বনময় পাহাড় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বনপথে গরুর পালকে নাম্‌তে দেখি...তাদের গলার ঘণ্টা বাজে, সে ধ্বনি একটি অনন্ত সুর হয়ে এসে কাণে বাজে...তার কাছে নৈনীদেবীর ঘণ্টাধ্বনি অস্পষ্ট হয়ে যায়...কাণে প্রবেশ করে না। আমার মন বলে ওঠে :

'মৃত্তিকা-ছানি' আমার দেবতা গড়ে নি কুম্ভকার,
ভাস্কর আসি হানে নাই তাঁরে ছেনি ও হাতুড়ি তার ;
... ...
এ জীবনে আর করিতে নারিব অন্যের আরাধন,
মরমে পেয়েছি পরশ-মাণিক! সোনা হয়ে গেছে মন!

বাণী যাবে না বিনয় : সমর এসে কাঁধে হাত দিল। চল।

শৈলেন বললে : এক সের আপেল নিয়ে এলুম বিনয় ...৬ আনা সের। তোমার ভাগে ছ'পয়সা পড়েছে।

ওরা আমায় ভালবাসে...খুব ভালবাসে, কিন্তু অনুগ্রহ করে না...এ জন্যই ওদের অত ভালবাসি।

বাঙ্গালী-বাসিন্দা এখানে খুব কম। Eastern Commandএর ইন্‌জিনিয়ার পরেশ মজুমদার, এখানকার S. D. O. এবং সবশুদ্ধ আরো গুটি চারেক বর আছেন। বেড়াতে ও বাঙ্গালী খুব কম আসেন। পরেশ মজুমদার মহাশয় দিব্য লোক—যেমন আমুদে—তেমনি মিশুক। আমরা গেছি শুনে তিনি নিজে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন...আদর আপ্যায়িত করলেন খুব। তাঁর ভাইপো নীতীশ মজুমদার আমাদের সঙ্গেই ঘুরে বেড়াতেন। সম্প্রতি আমাদের হোটেলে আরো দুজন বাঙ্গালী অতিথি এসেছেন—তার মধ্যে আমাদের কলেজের Vice-Principal Dr. B. C. Ghose ও Mrs. B. L. Chowdhury। Dr. Ghoseএর সঙ্গে আগে কখনো মিশবার সুযোগ হয় নি, এখন সুযোগ পেয়ে ধন্য হলুম। তাঁর মত লোক খুব কম দেখেছি। রোজ সন্ধ্যের পর আমাদের ঘরে এসে বসতেন...নানা দেশের গল্প হত...বিলেতে দশ বছর কাটিয়ে ছিলেন কি রকম ভাবে, আরো কত কি? প্রায়ই আমাদের জন্য আপেল, আঙ্গুর, বিস্কুট, কেক প্রভৃতি পাঠিয়ে দিতেন... আমাদের সুবিধে অসুবিধের প্রতি তীব্র দৃষ্টি দিতেন। এক একদিন মিসেস বি-এল-চৌধুরী নেমন্তন্ন করতেন—গাইয়ে

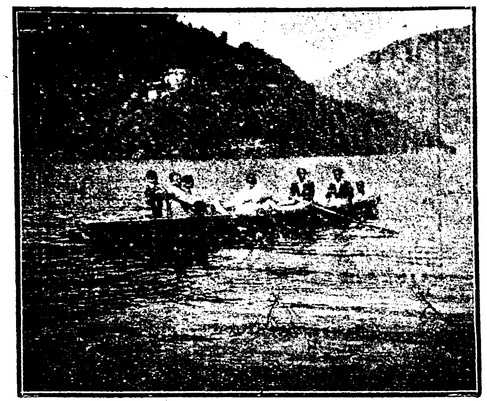

নৌ-বিহার [ফটো—রবি চট্টোপাধ্যায়

বন্ধুদের গাইবার জন্য ; Dr. Ghoseএর ঘরে আসর বসত... দল বেঁধে সব যেতুম...গানের পর হত প্রচুর জলখাওয়া...

রবি, বিজয়, হরদেব আমাদের ঘরে এসে বসে, গল্প

তুষারপাতে নৈনিতাল

করে, বলে : দুদিন বাদে ভুলে যাবে তো এ সব? হরদেব তো বলেই বসল—

'...দুদিন পরে যাবে চলে।
ঝিনুকের দুটি খোলা।

মাঝখানটুকু ভরা থাক্
একটি নিরেট "ভালবাসা" দিয়ে,—
দুর্লভ মূল্যহীন।'

মিউনিসিপাল গার্ডেন ও লেক
[ফটো—রবি চট্টোপাধ্যায়

বলে : না বন্ধু, এত সহজে কোন জিনিষ ভোলবার নয়। যেখানে তোমাদের স্মৃতিটুকু রেখে দিলুম,

'সে-নব জগতে কাল-ধারা নাই, পরিবর্ত্তন নাহি,
আজি এই দিন অনন্ত হয়ে চিরদিন রবে চাহি।'

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ওদের সব ভবিষ্যতের আশার কথা শুনছি। ওদের কেউ হবে ব্যারিষ্টার, কেউ বা এগ্রিকালচার পড়তে যাবে 'ডেনমার্ক', কেউ বা করবে coal সম্বন্ধে রিসার্চ বিলেত গিয়ে,···

আমি শুধু শুনেই যাচ্ছি···শুধু···

নিস্তব্ধ রাত্রি। অন্ধকার—বাইরে ভেতরে একটুও তফাৎ নেই—গাঢ় অন্ধকার। 'উইপিং উইলোর' কান্না এখান থেকে বেশ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি···বেশ স্পষ্ট···

বন্ধুদের আর ভাল লাগছে না নৈনীতাল, কালকেই আগ্রা রওনা হতে হবে। বিকেলে একবার দল বেঁধে বেড়াতে বেরুলুম। প্রকৃতি যেন মানুষের কাছে প্রিয়ার প্রথম চিঠি—যতবারই পড়া যাক্ না কেন, নূতন লাগবেই। যে রাস্তা দিয়ে কতবার গেছি, সে রাস্তা দিয়ে চলতে আবার নূতন নূতন লাগছে। একটি ভদ্রলোক ও একটি ভদ্রমহিলা আসছিলেন একসঙ্গে। ভদ্রলোক 'সুট্' পরে, মহিলাটি ইউ, পি ধরণের কাপড় পরে। কেউ বল্‌ছে বাঙ্গালী, কেউ বা কচ্ছে 'প্রোটেষ্ট'। তাঁরা কাছে আসতেই তপেশবাবু বলে উঠলেন: এ্যাদ্দিন এসেছি, অথচ একজন বাঙ্গালীর মুখ দেখ্‌লুম না স্যার—আর এদেশে থাকা নয়—

ওঁরা দুজনে হেসে উঠলেন···তার পর হল নমস্কার বিনিময়—আলাপ পরিচয়। এমনিভাবে ওখানে যে কজন বাঙ্গালী আছেন বা গিয়েছেন, তাঁদের সবার সঙ্গে আলাপ করেছি।

বিদায়ের ক্ষণে নাথুরাম, নীতীশবাবু এসে দাঁড়ালেন। আমাদের ঠাকুর নাথুরাম এবং ওখানকার বন্ধু নীতীশবাবু এ ক'দিনে আমাদেরই একজন হয়ে উঠেছিলেন, ওদের যে কখনো ছাড়তে হবে তাও ভাবিনি। আমরা হয় তো বহু বৎসর এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকব, কিন্তু কোনদিনই হয়তো দু'জনের মাঝে আর দেখা হবে না—আশ্চর্য্য···ওদের বিদায় দিতে গিয়ে চোখটা আপনি জলে ভরে উঠে।

'হায় ওরে মানব হৃদয়—
বার বার—
কারো-পানে ফিরে চাহিবার—
নাই যে সময়,
নাই নাই।'

লেখক [ফটো—সমর চট্টোপাধ্যায়

৬-৩৩ মিনিটে আগ্রা এক্সপ্রেস ছাড়ল। Au revoir. Good-by. এমনি দু' একটা কথা কাণে এল। কি

তার মূল্য কতটুকু! তার মধ্যে বেদনা নেই, আবেগ নেই, সে শুধু কথার কথা।

'কত যে প্রাতের আশা ও রাতের গীতি,
কত যে সুখের স্মৃতি ও দুখের প্রীতি,
বিদায় বেলায় আজিও রহিল বাকি।'

তার খোঁজ ক'জন করলে ?

এর মধ্যে সবার চরিত্রের দুর্ব্বলতা ফুটে উঠেছে—ফুটে উঠেছে স্বার্থপরতা, প্রভুত্ব, অহঙ্কার। প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যের অন্তরালে চরিত্রের ত্রুটির ওপর একটা মাধুর্য্য, সরলতা, অসামান্যতা ফুটে উঠেছিল পরস্পরের মধ্যে··· একটা সখ্যবন্ধন করেছিল বিকাশলাভ—নৈনীতাল ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই সে বন্ধন গেল ছিঁড়ে, মাধুর্য্য গেল নষ্ট হয়ে, অসামান্য হল সামান্য...যারা ছিল আপন, তারা হল পর। নিজের মনেই বলে উঠ্‌লুম :

'হায় রে হৃদয়,
তোমার সঞ্চয়—
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়!'

কাঠগুদাম ষ্টেশনের ডিস্‌ট্যান্ট্ সিগ্‌নালটা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আঁধারের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল···

আগ্রা এক্সপ্রেস তখন পূর্ণগতিতে ছুটে চলেছে···

এখনই চলিয়া যাবে ?

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

এখনই চলিয়া যাবে ? হে সুন্দরী, সন্ধ্যার অতিথি,
এখনও গগনপ্রান্তে দিবসের স্তিমিত আলোক
নিঃশেষে বিদায় নিতে পারেনি ক' ধরার মায়ায়,
সে মায়া মধুর এত—যেতে হবে তাও ফিরে ফিরে
পিছনে চাহিয়া দেখে, প্রিয়া তারে ডাকে কি না ডাকে।
স্বপ্নলোকে, মায়ালোকে, প্রিয়ারে কে দিয়া নির্ব্বাসন
কালের শাসন মানি ফিরে যেতে চায় গৃহ কোণে ?
ব্যথা বাজিবে না বুকে ? নিঃসঙ্গ ফেলিয়া যাবে মোরে ?

সম্মুখে আঁধার রাত্রি, একা আমি তুমি নাই পাশে
বিনিদ্র নয়ন দুটি তোমারে খুঁজিয়া হ'বে সারা
একা জাগি মায়ালোকে, একা জাগে দূরে সন্ধ্যাতারা।

সন্ধ্যায় এসেছ বলে, চলে যাবে রাত্রি না আসিতে ?
এখনও আসে নি রাত্রি !— এ কেবল সন্ধ্যার আঁধার
আমারে দেখায় ভয় ;—তুমি মোরে দেবে না অভয় ?
চেয়ে দেখ নদী পারে পল্লী-বধূ এখনও ফেরে নি—
শেষ ঘট ভরি' ত্রস্ত পদে ; দিবসের শেষ রৌদ্রটুকু
নারিকেলশাখার আড়ালে ঝিলিমিলি করিছে এখনও।
রাত্রি হ'তে দেরী নাই,—তবু সন্ধ্যা এখনও রয়েছে,
ম্লান সন্ধ্যা তবু ত' রয়েছে। তোমারে পেয়েছি কাছে
এর বেশী আর কিছু নাহি চাই, থাক তুমি আরো কিছুক্ষণ,
স্মৃতির ফলকে রাখ চির-লেখা এ ক্ষণ ভুঞ্জন।

বিরহ-মিলন কথা

শ্রীহীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মাধবীর আনন্দোজ্জ্বল মন গেল বিস্বাদ হ'য়ে তিক্ত হ'য়ে। শৈবাল যে এই কারণে তাকে এমনতর কঠিন আঘাত করবে এ কথা একটিবারও তার মনে হয় নি। বরঞ্চ সে ভেবেছিল বাড়ীতে এই রকম একজন মাননীয় অতিথি, শৈবাল নিজে থেকেই এ যাবার আয়োজন স্থগিত রাখতে চাইবে। শৈবালের মত যুবকের কাছ থেকে এই প্রত্যাশা করাই যে স্বাভাবিক। কারণ এমন ঘটনা আজ এই প্রথম নয়, এর আগে কতবার এমনি ভাবে অতিথি এসেছে, সে দিন হয়তো কোথাও যাবে ব'লে তারা ঠিক ক'রে রেখেছিল—সে যাওয়ার প্রয়োজন হয় তো এর চেয়েও বেশি ছিল, কিন্তু অতিথির আকস্মিক অভ্যাগমে তাদের যাওয়া হ'য়ে ওঠেনি এবং শৈবালই স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে তাদের যাওয়া স্থগিত রেখেছিল। আর আজ সেই একই কারণে সে এমনি অবিবেচকের মত এমনতর অপ্রীতিকর ব্যাপার সৃষ্টি করতে পারলে কি ক'রে? কি ক'রে সে পারলে হৃদয়হীন হ'য়ে তাকে অপমান ক'রতে—অতিথিকে ক'রতে শ্লেষ! এ যে একেবারে অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর।

কয়েক মিনিট এইভাবে বিবর্ণ নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকবার পর মাধবী নিরানন্দ মন নিয়ে উপরে উঠতে লাগল। হৃদয় লজ্জা ও আশঙ্কায় দুলছে। শৈবালের তীব্রকণ্ঠে তাদের কলহের আভাষ কেউ পেয়েছে কিনা এই ভাবনা নিয়ে মাধবী ঘরে গিয়ে ঢুকল। সবিতা তারই জন্য অপেক্ষা করছিল। বললে: 'কি হ'ল? যাবি নাকি থিয়েটারে?'

'না কাকীমা, আজ আর যাব না।'

'সেই ভাল—বাড়ীতে কুটুম এসেচে তাকে ফেলে থিয়েটার যাওয়াটা ভাল দেখায় না' সবিতা মাধবীর আরক্ত মুখের দিকে চেয়ে বললে: 'গেলি নে ব'লে শৈবাল রাগটাগ করলে না তো?'

'বেশ তো—রাগ কেন করবে?'

সবিতার হঠাৎ যেন চমক ভাঙল। ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠল: 'হাঁ রাণী, শৈবাল কি চ'লে গেল নাকি? তাকে যে সকালবেলা এখানে খাবার নেমন্তন্ন করবো। আমি জানি সে ওপরে আসবে। লক্ষ্মী মা আমার—তাকে এখুনি গিয়ে একবার ব'লে আয়।'

মাধবী পড়ল সঙ্কটে। ঈষৎ দ্বিধায় বললে: 'ক্ষিতি তো রয়েচে, তাকে ব'লে দাও না কাকীমা। আর শৈবালদার কি এ বেলা খাবার সময় হবে?'

'কেন হবে না। খুব হবে' সবিতা বললে: 'তার জন্য খাবার আয়োজন করেচি—সে না এলে চলবে কেন। যাতে আসে তার ব্যবস্থা আমিই করচি।'

সবিতা চলেই যাচ্ছিল—হঠাৎ তার নজরে পড়ল ঘরের কোনে জড় করা ময়লা কাপড় জামাগুলার উপর। বিস্মিত কণ্ঠে বললে: 'এখনো এ সব ধোবার বাড়ী যায় নি। কতদিন থেকে বলচি ধোবাটাকে ডেকে পাঠিয়ে কাপড় জামা গুলা দিয়ে দে। তা তোর সে সময়ই হয় না। এসব ময়লা জিনিষ ঘরে রাখতে নেই, ব্যামো হ'তে পারে।'

মাধবী হেসে বললে: 'আচ্ছা আজ দেব কাকীমা—তুমি দেখো।'

'হাসি নয় এ সব শেখা তো দরকার' সবিতা যেতে যেতে বললে: 'একদিন সংসার ধর্ম্ম করতে যেতে হবে মনে থাকে যেন। চিরকাল এইভাবে কাটালে চলবে না।'

বিজন মাধবীর মুখের দিকে চেয়ে রসিকতা ক'রে বললে: 'সূক্ষ্মরুচি প্রকর্ষ-চিত্ত হওয়ার বিপদ কি দেখচেন? অনবরত সংসারের তুচ্ছ স্থূল জিনিষের দিকেও জোর ক'রে দৃষ্টিতে সজাগ রাখতে হয়।'

'মেয়ে হ'য়ে জন্মালে' মাধবী হেসে বললে: 'তা রাখতেই তো হবে। কিন্তু সত্য বলচি এ আমার মোটে ভাল লাগে না। আমি একটুও আনন্দ পাই না।'

'কিসে আপনি আনন্দ পান?'

'কিসে আবার' মাধবীর মুখ ঈষৎ রক্তাভ হ'য়ে উঠল। কুণ্ঠিতকণ্ঠে বললে: 'এই—এই ছাত্রী হ'য়ে কলেজে যেতে—লেখাপড়া নিয়ে থাকতে—আর ছুটিতে আগের মতন দেশ-বিদেশে বেড়িয়ে আসতে। এক কথায় নিজের মনটাকে স্বাধীনভাবে ফেলে দিতে। এই আর কি।'

বিজন বললে: 'তাই করেন না কেন? করতে বাধা কি?'

'প্রধান বাধা হ'চ্ছে আমার কাকীমাটি'—মাধবী করুণ হেসে বললে: 'বি-এ পড়বার অনুমতি বাবার কাছ থেকে পেলাম, কিন্তু কাকীমার মত পেলাম না। তাঁকে কিছুতেই রাজি করান গেল না।'

'দিদির আপত্তির কারণ?'

'কারণ কাকীমা বলেন বেশি লেখাপড়া করলে মেয়েদের সংসার করবার অনেকখানি শক্তিক্ষয় হ'য়ে যায়, আর সেটা সংসারের পক্ষে অমঙ্গলজনক। এই মাত্তর শুনলেন না স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মতামত'—মাধবী বললে: 'এখন কাকীমা প্রাণপণে চেষ্টা করচেন এই বয়সেই আমাকে একটি নিখুঁত পাকা গিন্নী তৈরী করতে। কিন্তু আমি সংসারের কাজে কিছুতেই মন বসাতে পারি না। এমনি বিশ্রী লাগে আমার। ওতো আছেই—তবে কেন এখন দুদিনকার মনের আনন্দকে এ ভাবে নষ্ট করি।'

'ওটা আর কিছুই নয়'—বিজন হেসে বললে: 'দিদি আপনাকে রিহার্সাল দিইয়ে নিচ্চে। দুদিন পরে যখন অভিনয় করতে যাবেন তখন যাতে আপনার অভিনয় নিখুঁত হয় তার জন্যই দিদির এই আপ্রাণ চেষ্টা।'

কথাটা রসিকতার মত বলা হ'লেও এ যে রসিকতা নয় তা মাধবী বুঝল। তার ছদ্ম-সহানুভূতির সুরে সুর মিলিয়ে বললে: 'এটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ। এখন প্রত্যেকে নিজের আনন্দের পথ নিজেই নির্ব্বাচন ক'রে নেবে, একথা বড় বড় মনীষীরা জোর গলায় প্রচার করচেন। আমারও তো তাই মনে হয়। কোন মেয়ে যদি সংসারী হওয়ার চাইতে অন্য কোন নিষ্পাপ আনন্দের পথ নির্ব্বাচন ক'রে নেয়—তবে কেন সকলে তাকে আপ্রাণ চেষ্টা করবে বাধা দিতে?'

'এ যে আমাদের দেশের অন্ধ সংস্কার—যা প্রত্যেক নরনারীর অস্থিমজ্জায় মিশে এক হ'য়ে রয়েচে' বিজন বললে: 'গতানুগতিকভাবেই এরা এই পথটাকে নারীর জীবনের একমাত্র সার্থকতা ও মঙ্গলের পথ ব'লে মেনে নিয়েচে; সেখানে টুঁ শব্দটি করলে আর রক্ষে থাকবে না।' বিজন বললে: 'মাধবী দেবী যদি ডায়োসেসন থেকে বিএ পাশ ক'রে নিজের পড়াশুনা এবং দেশভ্রমণ নিয়েই পরম আনন্দে থাকেন তাহ'লে সবাই বলবে এ গর্হিত কাজ। ভাল হোক, মন্দ হোক, গতানুগতিকভাবে যা চিরকাল আমাদের সমাজের নারীরা মেনে এসেচে তাকে খণ্ডন করবার চেষ্টা করলেই প্রথমটা কলঙ্ক আর অপযশের বোঝায় মাথা ভারি হ'য়ে উঠবে।'

মাধবী আস্তে আস্তে বললে: 'সত্য।'

বিজন হেসে বলল: 'সত্য বলচি আপনাকে আমাদের সমাজে যে ভাবে মেয়েদের বিয়ে হয়—তা আমার কাছে তামাসা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।" আমাদেয় বাঙলা দেশের কুমারী মেয়েরা যেন শো-কেশের পুতুল।

মাধবী কোন কথা বললে না। বিজনও নীরবে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। কয়েকটা মুহূর্ত্ত কাটল এমনি ভাবে। হঠাৎ বিজনের খেয়াল হ'ল—মাধবী তখন থেকে দাঁড়িয়েই রয়েছে একবার সে তাকে বসতেও অনুরোধ করে নি। লজ্জিত হ'য়ে সে বললে: 'বাঃ আপনি যে সেই থেকে দাঁড়িয়েই আছেন। বসুন।'

'এই তো বেশ আছি!'

'না তা শুনব না বসুন।'

'আচ্ছা বসচি।' মাধবী বিজনের সামনে মুখোমুখি হ'য়ে বসল।

'কোন কাজটাজ নেই তো? এখানে ব'সে গল্প করলে কাজের ক্ষতি হবে না?'

'আমার তো ভারি কাজ। আর গল্পের ভাল সঙ্গী পেলে আমার কাজের কথা ভাবতেই ইচ্ছে করে না।'

'আমাকে তাহ'লে গল্পের ভাল সঙ্গী ব'লে স্বীকার করচেন?'

'তা করচি।'

এ কথা সে কথার পর বিজন হঠাৎ এক সময় বললে: 'একটা কথা আপনাকে জিগ্‌গেস করব, কিছু মনে করবেন না?'

মাধবী একটুখানি অবাক হ'য়েই তার মুখের দিকে তাকাল। তার কণ্ঠস্বরে মুখের ভাবে মাধবী বুঝল বিজন সত্যিই তাকে কোন সীরিয়াস কথা জিগ্‌গেস করতে উদ্যত হ'য়েছে। কিন্তু মাধবী ভেবেই ঠিক করতে পারলে না কি এমন কথা জিগ্‌গেস করবার থাকতে পারে—যাতে ক'রে ঐ রহস্যালাপী মুখর যুবকটি তার চারপাশের নির্ম্মল

আনন্দ হাসি কলরোলকে নিমিষে নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়ে দিল। কি সে কথা। মাধবী মনে মনে অত্যন্ত কৌতূহলী হ'য়ে শান্তকণ্ঠে বললে : 'না—বলুন।'

বিজন বললে : 'প্রথমে ভেবেছিলাম জিগ্‌গেস করব না, কিন্তু এখন ভেবে দেখচি সেটা না জিগ্‌গেস করাটাই অভদ্রতা হবে।' ব'লে বিজন সোজা তার মুখের দিকে চেয়ে বললে : 'শৈবালবাবুর সঙ্গে আপনার যেখানে যাবার কথা ছিল সেখানে গেলেন না কেন জানতে পারি কি ?'

মাধবী ভয়ানক বিস্মিত হ'ল। কয়েক-মুহূর্ত্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে পরে বললে : 'হঠাৎ এ কথা জানতে চাইছেন কেন বলুন তো ?'

বিজনের ঠোঁটে একটুখানি মৃদু হাসি ফুটে উঠল। বললে : 'কারণ আছে নিশ্চয়। এটা না জানা পর্য্যন্ত নিজের কাছেই আমাকে অপরাধী থাকতে হবে।'

কথাটা মাধবীর কাছে দুর্ব্বোধ্য ঠেকল। বিস্মিত-কণ্ঠে বললে : 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারচি না। কথাটা খুলেই বলুন !'

'আচ্ছা খুলেই বলচি' বিজন একটুখানি নড়েচড়ে ব'সে নিজেকে ঠিক ক'রে নিয়ে বললে : 'আজ মাসীমার বাড়ীতে আপনাদের নেমন্তন্ন। শৈবালবাবুর মুখ থেকে যা শুনলাম তাতে মনে হ'ল সেখানে সবাই অত্যন্ত উৎসুক হ'য়ে আপনাদের জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকবেন। আর সেখানে যাবার জন্য আপনারাও সম্পূর্ণ প্রস্তুত হ'য়ে ছিলেন—তাই না ?'

মাধবী ঘাড় নেড়ে বললে : 'হাঁ।'

বিজন বললে : 'আপনাদের যাওয়ার ওপরই তাঁদের সব কিছু আনন্দ নির্ভর করচে এও সত্য। কিন্তু কি এমন ঘটল যাতে সেখানে না গিয়ে নিজেদের এবং আরো পাঁচজনের এমন আশার আনন্দকে নষ্ট ক'রে দিলেন ?'

কথাটা কৈফিয়তের মত মাধবীর কাণে গিয়ে বাজল। তার মোটে ভাল লাগল না। তার প্রশ্নের উত্তরে মাধবী শুধু বললে : 'না যাবার কারণ আছে।'

'সেইটাই তো আমি জানতে চাইছি' বিজন মাধবীর আনত মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত চেয়ে থেকে বললে : 'আমার কেবলই মনে হ'চ্চে এর কারণ বোধ হয় আমি নিজে। হঠাৎ এমনভাবে এসে প'ড়ে সকলের আনন্দকে নষ্ট ক'রে দিলাম।'

মাধবী আনত দুটি চোখ তুলে বললে : 'বেশ ধরুন তাই। কিন্তু তাতে আপনার ক্ষতি হ'য়েচে কি ?'

'ক্ষতি ? আমার ?' বিজন বললে : 'আমার আবার ক্ষতি হবে কি ? বরঞ্চ ক্ষতি তো হ'ল আপনাদেরই। কিন্তু সত্য এর জন্য আমি ভয়ানক দুঃখিত হ'য়েচি। আমার জন্য যে পাঁচজনের আনন্দের আয়োজন নষ্ট হ'ল এই চিন্তাটায় আমার এমনি অনুশোচনা হ'চ্চে। সত্য আপনার আজ না যাওয়া মোটেই ভাল হয় নি।'

মাধবী নিজের মনের বিরক্তি চেপে যথাসম্ভব শান্তকণ্ঠে উত্তর দেবার চেষ্টা ক'রে বললে : 'কি ভাল হ'ত? শৈবালবাবুর সঙ্গে সেখানে চ'লে যাওয়া ?'

'নিশ্চয়।'

'আপনি আজ আমাদের বাড়ীর অতিথি' মাধবী বললে : 'আপনাকে ফেলে আমাদের অন্য জায়গায় আনন্দ করতে যাওয়াই উচিত হ'ত—এই কি আপনি বলতে চান ?'

'তাইতো চাই। কেন আপনি আমার জন্য আর পাঁচজনের নিরানন্দের কারণ হ'তে গেলেন ? আপনি বোধ হয় ভেবেছিলেন আপনার অনুপস্থিতিতে অতিথি সৎকারের ত্রুটি হবে ?'

'না, তা ভাবি নি।'

'তবে ?'

মাধবীর বিরক্তি এইবার ক্রোধে রূপান্তরিত হ'ল। সে আশা করেছিল তাকে ফেলে তার এই না যাওয়াটার জন্য বিজন খুব খুশি হ'য়ে তাকে অনেক ধন্যবাদ দেবে। এইটা মনে মনে কল্পনা ক'রে শৈবালের দেওয়া রূঢ় আঘাতের জ্বালাটা কিছু পরিমাণে স্নিগ্ধ করেছিল। কিন্তু কল্পনার সুতা গেল টুকরো টুকরো হ'য়ে ছিঁড়ে। এ কি অপ্রত্যাশিত আচরণ। অন্যের দেওয়া জ্বালা যার সান্ত্বনার দ্বারা স্নিগ্ধ করতে চাই সেই দেয় জ্বালা বাড়িয়ে। মাধবী প্রথমটা অভিমান-ক্ষুব্ধ, পরে বিরক্ত, তারপর ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠল। এইবার সে আর প্রতিঘাত দেবার সুযোগ ছাড়লে না। বললে : 'বাড়ীতে একজন অতিথি, তাঁকে ফেলে অন্য জায়গায় আনন্দ করতে গেলে আর যাই হোক

শিষ্টাচারের পরিচয় দেওয়া হয় না। এই শিক্ষাই আমি চিরকাল পেয়ে এসেচি।'

কথাটা বিজনকে আঘাত করল। বললে : 'তাহ'লে আমি ছাড়া অন্য যে কেউ অতিথি হ'য়ে এলেও আপনি এই রকম করতেন ?'

কথাটা নিতান্ত সামান্য। কিন্তু এই সামান্য কথাটা বিজনের সব কিছুকে নিমিষের মধ্যে মাধবীর চোখের সামনে স্পষ্ট উন্মোচিত ক'রে দিল। সে যে কি কথা তার মুখ থেকে শোনবার জন্য এত প্রকার কৌশল করচে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকে করচে আঘাত—তার সূক্ষ্ম অর্থ মাধবীর কাছে আর গোপন থাকল না। আজ সে শৈবালের সঙ্গে নিমন্ত্রণ যায় নি ব'লে বিজন বিন্দুমাত্র দুঃখিত নয় বরঞ্চ পরম আনন্দিতই হ'য়েছে। তথাপি নিজের এই আনন্দকে গোপন ক'রে এই ভাব ব্যক্ত করার কারণ, বিজন মাধবীর মুখ থেকে শুনতে চায়, সে এমন ক'রে পাঁচজনের আনন্দকে নষ্ট ক'রল শুধু তারই জন্য। সে ছাড়া অন্য যে কোন অতিথি এলেও তার এ যাত্রাকে কোনমতেই রোধ করতে পারতো না। সে বিজনের সঙ্গ মনে প্রাণে কামনা করে এবং তার এই সাহচর্য্যের আনন্দ আজকের সেই সব আনন্দের চেয়ে মাধবীর কাছে অনেক বেশি উপভোগ্য ও লোভনীয় ব'লেই এমন অনায়াসে সেই সবকে অবহেলা করতে পারল। মাধবীর মুখ থেকে বিজন এটা স্পষ্ট শুনতে চায়। এ তার দুর্ব্বলতা। কিন্তু অপরের এই দুর্ব্বলতার পরিচয় পেয়ে অন্য জনের বুকের ভেতরটা এক অনির্ব্বচনীয় আবেগে এবং লজ্জায় দুলে উঠল। কিন্তু নিজের এই দুর্ব্বলতা বিন্দুমাত্র প্রকাশ হ'তে দিল না। তার কথার উত্তরে তেমনি শান্তকণ্ঠে বললে : 'হাঁ আর যে কেউ হ'লেও ঠিক এই রকমই করতুম।'

এই অপ্রত্যাশিত কথায় বিজন খুশি হ'ল না, হ'তে পারেও না। মাধবীর কথার উত্তরে সে একটুখানি হাসল। সে হাসিতে আনন্দ না থাক কৃত্রিমতাও ছিল না। বললে : 'যাক্ বাঁচা গেল। ভেবেছিলাম আমার জন্যই এটা হ'ল। আমি আবির্ভূত হ'য়েই—'

মাধবী বাধা দিয়ে বললে : 'তা কেন হবে ? আর আপনি এটাকে নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ক'রে দেখচেন কেন ? ব্যাপক ভাবে দেখুন !'

'আমার তাহ'লে কোন অপরাধ নেই ?'

'না' ব'লে মাধবী অনেকক্ষণ পরে একটুখানি হাসল। কৌতুক স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে : 'এবার দুর্ভাবনা গেল তো ? এখন নিশ্চিন্ত হ'লেন ?'

'হ'লাম বৈ কি' ব'লে বিজনও হাসল।

মাধবী মৃদু হেসে বললে : 'সত্য আপনার মতন সহৃদয়তা দুর্লভ। এমন ক'রে পরের জন্য ভাবতে বড় একটা কাকেও দেখা যায় না।'

মাধবীর মুখের হাসি সত্ত্বেও তার কথায় যে সূক্ষ্ম শ্লেষ ছিল তা বিজন টের পেল এবং সেও সৌজন্যের আবরণে প্রচ্ছন্নভাবে শ্লেষের উত্তর দিতে দ্বিধা করলে না। বললে : 'তা বটে। কিন্তু সেটা সব জায়গায় নয়। স্থান কাল পাত্র বিশেষে আমার সহায়তার সীমা এমনি অতিক্রম ক'রে যায় বটে।'

এই কথার উত্তর দেবার জন্য উদ্যত হ'য়ে মাধবী চোখ তুলতেই দুজনের চোখে চোখ মিলল এবং পরক্ষণেই মাধবী আরক্ত-মুখে চোখ নত করল। ইতিপূর্ব্বে অনেকবার তাদের চোখোচোখি হ'য়েছে কিন্তু এমনতর লজ্জা সে পায় নি। কেন জানি না বিজনের সঙ্গে চোখ তুলে কথা কইতে তার বড় লজ্জা করছিল। তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। আর নীরবতার মধ্য দিয়ে কয়েকটা মুহূর্ত্ত গেল কেটে।

তারপর মাধবী বললে : 'এতখানি সময় বাজে কথায় গেল। এবার কিন্তু গল্প বলুন।'

'আমি কি গল্প বলব। বরঞ্চ আপনি বলুন।'

'বাঃ আমিই তো শুনব। আপনি বলুন।'

'না—আপনি বলুন।'

'বেশ যাহোক আমি কি গল্প জানি। আপনি বলুন।'

'আমি সত্য গল্প জানি না।'

'খুব জানেন' মাধবী সকৌতুকে বললে : 'গল্প ক'রে আপনি চমৎকার আসর জমাতে পারেন। আপনার অসামান্য গুণের মধ্যে এটি অন্যতম।'

'তাহ'লে' বিজনও হেসে বললে : 'শরৎচন্দ্রের ভাষায় ব'লতে হয় 'অনেক প্রকারের গুণগ্রামেই ইতিপূর্ব্বে মণ্ডিত হ'য়ে উঠেচি।'

মাধবী হাসতে হাসতে বললে : 'হাঁ।'

দুজনে মুখোমুখি হ'য়ে ব'সে গল্প ক'রতে লাগল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে এই দুটি তরুণ তরুণীর আলাপ একেবারে নিবিড় হ'য়ে উঠল। বিজনের মুখে শিলঙের গল্প শুনতে শুনতে মাধবীর দুটি চোখ কৌতূহলে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। শিলঙ—শিলঙ তার মনকে এক অপরূপ স্বপ্নরাজ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের লেখায় শিলঙের যে ছবি সে দেখেছে—তার রঙ জীবনে তার মন থেকে ম্লান হবে না। ভারি ইচ্ছে করে একবার তাজমহল দেখে আসি। সুন্দর ব'লে—বিস্ময়কর ব'লে—গতানুগতিক-ভাবে তাজকে মেনে নিতে চাই না। আমি চাই তাকে নিজের চোখে দেখতে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, আলতুম হাক্সলি প্রভৃতি মনীষীগণ তাজকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন—ভারি ইচ্ছে করে দেখতে কি ভাবে এবং কোথায় এঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আমার দৃষ্টির পার্থক্য ঘটল। এই রকম আরো কত প্রসঙ্গ এল এবং গেল। বিজন সত্য-সত্য বিস্মিত না হ'য়ে পারল না। এতটা কল্পনা করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। বিস্ময় লাগে বৈ কি। একুশ বছর বয়সের মেয়ে কিন্তু কি তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল মার্জ্জিত মন, সূক্ষ্ম রুচি। কোন বিষয়ে কৌতূহলের অভাব নেই, গতানুগতিক ভাবে কোন জিনিষ মেনে নিতে রাজি নয়। সব কিছু নিজের নির্ভিক এবং রসিক মনের কাছে যাচাই ক'রে নিতে চায়। বিজনের বিস্ময় শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত হ'ল এবং কিছুক্ষণ আগে মেয়েটির প্রতি যে অবিচার করেছিল সেই কথা স্মরণ ক'রে নিজেকে যেন ছোট মনে হ'তে লাগল।

অবশেষে উঠল সাহিত্যের প্রসঙ্গ। গল্‌সোয়ার্দ্দি বড় নাট্যকার না ঔপন্যাসিক, কিসে তাঁর শিল্প পরিপূর্ণরূপে আত্ম-প্রকাশ ক'রেছে। আচ্ছা—লোকের ধারণা কি ভুল নয় যখন তারা বলে Dolls house ইবসেনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক। An enemy of the people কি ইবসেনের নাট্য-প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ নয়? এই নাটকখানি পড়ে কি তাঁকে পূজা করতে ইচ্ছে করে না। দেশের ভয়াবহ মিথ্যাচারের হাত থেকে সমাজের নরনারীকে রক্ষা করবার জন্য যেন Dr Stockman ধরল অস্ত্র। কিন্তু সেই সমাজেরই নরনারী ভুল বুঝে তাকে দেশশত্রু ব'লে অপমান করল—নির্দ্দয়ভাবে লাঞ্ছিত ও প্রতারিত করল—অবশেষে দেশ থেকে শত্রু ব'লে তাড়িয়ে দিতে চাইল। অথচ সমস্ত নিন্দা গ্লানি কলঙ্ক অপমান মাথায় নিয়ে, কঠিন আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হ'য়েও একা দাঁড়িয়ে তাঁর সেই অবিরাম সংগ্রামের বিরাম নেই। কি গভীর সত্যোপলব্ধি। ষ্ট্রীণ্ড-বার্গের নারী-বিদ্বেষের মূলে তার ব্যক্তিগত জীবনের কোন ঘটনা ছিল কি না—তাঁর অবর্ণনীয় বীভৎস নাটক Fatherএর সেই captainএর শোচনীয় পরিণামের কথা মনে পড়লে কি গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে না—এমনতর বীভৎস রসসৃষ্টির মূল্য আর্টে কতখানি যার প্রভাব পড়ে মনের উপর নয়, স্নায়ুর উপর। ডষ্টয়েভস্কির বিখ্যাত উপন্যাসের সেই ছবিটা কি অপূর্ব্ব! প্রায়ান্ধকার স্বল্প-পরিসর একখানি ঘরের এক ধারে টেবলের উপর একটি প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকা, তার মিটমিটে আলোয় ঘরখানি অদ্ভুত রহস্যময় ব'লে বোধ হচ্ছে। সেই স্বল্পালোকিত আবছায়া ঘরে ম্লান-বর্ত্তিকার আলোর ঠিক নীচে ব'সে ক্ষীণাঙ্গী sonia উদাত্তকণ্ঠে পড়ছে বাইবেল, আর অদূরে ব'সে হত্যাকারী Rascalnicoff স্থির নিশ্চল নিরুদ্ধ শ্বাস হ'য়ে তাকিয়ে আছে soniaর গভীর তন্ময়তা-মাখান মুখের দিকে। তার আত্মা তখন পৃথিবীর ধূলা মাটির ক্লেদকে অতিক্রম ক'রে হয়তো কোন অনন্ত সৌন্দর্য্যের উদ্দেশে যাত্রা ক'রেছে। শিল্পীর নিরপেক্ষতা কি আপনি বিশ্বাস করেন? মানি—আর্টে কেমন ক'রে বলা হ'ল এইটাই সবচেয়ে বড় কথা—কিন্তু কি বলা হ'ল সেইটা কি অবহেলার?

এমনি ধরণের আলাপ আলোচনায় দুজনে এত তন্ময় হ'য়ে পড়েছিল যে তাদের এ খেয়াল নেই—এদিকে দেড়টা বেজে গিয়ে বাইরের মধ্যাহ্ন আকাশে রৌদ্র প্রখর হ'য়ে উঠেছে। বিজন যখন মাধবীকে উদ্দেশ ক'রে বলছে: 'দেখুন বর্ত্তমান যুগে পিওর আর্টের খুব বেশি কদর নেই যদি না তার মধ্যে কিছু পরিমাণে জার্ণালিসম থাকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে নিতে পারেন বার্ণার্ড শ'কে। বার্ণার্ড শ'র রচনা যে সার্ব্বজনীন সমাদর পেয়েছে—বর্ত্তমান যুগের কোন খাঁটি শিল্পীর পরিপূর্ণ শিল্পসম্মত রচনা তার অর্দ্ধেক সমাদরও পায় নি, তার কারণ আমার কি মনে হয় জানেন—' ঠিক এমনি সময় চাকর এসে জানাল যে সবিতা খাবার জন্য অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করছে তখন তাদের দুজনেরই চমক ভাঙল, বিজন লজ্জিত মাধবী

সরম-কুণ্ঠিতা। চাকর চ'লে গেলে পর দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। এই অল্প সময়ের মধ্যে তারা যে দুজনের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করতে পেরেছে এবং একটি বিশুদ্ধ মমত্ববোধ জন্মেছে দুজনের মধ্যে—এই উপলব্ধি দুজনের অন্তরে সুধাবর্ষণ করতে লাগল। বিজনের মনে এমন একটি অনির্ব্বচনীয় রসের স্পর্শ লাগল, যার স্বাদ জীবনে কখনো পায় নি। এই স্পর্শ, এই রসের নির্ম্মল ইঙ্গিত তার মনের বুন্তের কোরকগুলিকে একটি একটি ক'রে জাগিয়ে দিল। বাতাসে সেগুলি রজনীগন্ধার কোমল শাখার মত দুলে উঠে সমস্ত মনকে সৌরভে আকুল ক'রে তুলল। এই পথটুকু সশব্দ হাস্যকৌতুকে মুখর ক'রে নীচে এসেই অকস্মাৎ মাধবী থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়ল। চকিতে তার মুখের হাসি গেল মিলিয়ে। নীচের দালানে খেতে বসবার আয়োজন করা হ'য়েছে। পাশাপাশি দুখানি আসন পাতা রয়েছে একধারে। একখানি শূন্য, অন্যখানির উপর স্তব্ধ নতমুখে ব'সে শৈবাল, আর তারই সামনে পাখা হাতে ক'রে ব'সে সবিতা তাদেরই জন্য অপেক্ষা ক'রে রয়েছে। কালবিলম্ব না ক'রে বিজন আসনখানির শূন্যতা পূর্ণ করল। মুহূর্ত্তকালমাত্র পরক্ষণেই নিজেকে সংযত ক'রে মাধবী এগিয়ে গেল।

সবিতা মাধবীর মুখের দিকে চেয়ে বললে: 'এমনি গল্পে মেতেছিলি যে আমার এত হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি কাণেও যায় নি। বিজন আজ এসেচে ওর দোষ দিইনে, কিন্তু তোর তো এদিকে হুঁস থাকা উচিত ছিল। গল্প তো আর পালাচ্ছিল না, খাবারদাবার পর করলেই হ'ত। শৈবাল সেই কখন্ থেকে ব'সে আছে। এত বেলায় তোমার বড় কষ্ট হ'ল, না শৈবাল?'

'না—কষ্ট আর কি।'

'দিদি অবিচার ক'র না' বিজন বললে: 'এতে এ অধীনও দায়ী। চোখের সামনে সব দেখে ওঁর ঘাড়ে চাপাতে দেব না।'

দুজনে পাশাপাশি আহার করছে। সবিতা পাখা দিয়ে ধীরে ধীরে বাতাস করতে করতে এটা ওটা সেটা আলাপ করছে। বিজন থেকে থেকে মাধবীকে নিয়ে করছে রসিকতা। শৈবাল স্তব্ধ নতমুখে আহার ক'রে যাচ্ছে—আর মাঝে মাঝে সবিতার কথার উত্তর দিচ্ছে খুব সংক্ষেপে। তার আশ পাশের হাস্যোজ্জ্বল মুখর আবহাওয়া থেকে নিজেকে সে কঠিনভাবে বিচ্ছিন্ন রেখেছে। এমন কি সবিতা যে প্রশ্নগুলি তাকে মাঝে মাঝে করছে সেগুলি না করলেই যেন ভাল হয়। সমস্ত লক্ষ্য ক'রে মাধবী বিবর্ণমুখে বসে রইল। তার প্রতি শৈবালের এই অবজ্ঞা এত নিষ্ঠুর এবং স্পষ্ট যে মাধবীর আহত মন অভিমানে দুলে উঠল।

সবিতা বিজনকে বললে: 'হাঁ রে শৈবালের সঙ্গে জানা-শুনা হ'ল এখন কথাটথা বল্! দুজনে এমন ভাবে ব'সে খাচ্চিস যেন কেউ কাকেও চিনিস নে।'

বিজনের মুখ লজ্জায় অকস্মাৎ লাল হ'য়ে উঠল। শৈবালের মত যুবকের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় করবার জন্য সে সত্যিই খুব উৎসুক হয়েছিল, কিন্তু শৈবালের এখনকার আচরণ ও ভাবভঙ্গীতে এমন একটা কিছু তার নজরে প'ড়ল যাতে আলাপের প্রবল ঔৎসুক্য আর থাকল না। আজই সকালে তাদের দুজনের পরিচয় হ'য়েছে, তারপর সেই পরিচয়ের পর যখন আবার দুজনে মিলিত হ'ল তখন শৈবাল ভদ্রতার খাতিরে একটি কথাও তার সঙ্গে বললে না—এমন ভাবে খেতে লাগল যেন তাকে সে চেনে না। এই অপ্রত্যাশিত আচরণে বিজন ক্ষুব্ধ হ'ল, দুঃখিত হ'ল এবং বাধ্য হ'য়ে তাকেও এমন আচরণ ক'রতে হ'ল যেন শৈবালের সঙ্গে তার পরিচয়ই নেই। জিনিষটা অত্যন্ত লজ্জাজনক বিজন প্রতিমুহূর্ত্তে তা অনুভব করছিল। এতক্ষণ নানা প্রসঙ্গ ও টুকরো হাসি তামাসা জিনিষটাকে একটা আবরণ দিয়ে সকলের কাছে গোপন রেখেছিল অকস্মাৎ সবিতা ঐ একটা কথা দিয়ে সেই আবরণকে উন্মোচিত ক'রে তার নির্লজ্জ রূপটা সকলের কাছে যেন প্রকাশ ক'রে দিল। বিজনের লজ্জার আর সীমা পরিসীমা রইল না। তার কেবলই মনে হ'তে লাগল ওপক্ষের আচরণে যত ঔদাসীন্যই প্রকাশ পাক্ না কেন, নিছক ভদ্রতার খাতিরে তার কি উচিত ছিল না শৈবালের সঙ্গে একটা কথাও বলা? কিন্তু ক্ষণিকমাত্র, পরমুহূর্ত্তেই নিজের স্বভাবসুলভ রসিকতায় জিনিষটার গুরুত্ব একেবারে উড়িয়ে দেবার জন্য বললে: 'কি ক'রে কথা কইব দিদি? ওঁর সঙ্গে কথা কইবার কি আর মুখ রেখেচি।'

সবিতা ও মাধবী বিস্মিত হ'য়ে তাকাল এবং শৈবালও একটুখানি লজ্জিতভাবে উৎকর্ণ হ'য়ে রইল—তার কথা শোনবার জন্য।

যদিও বিজন মনে মনে বুঝল কৈফিয়ৎটা খুব সন্তোষজনক হবে না তবু বললে: 'আমার জন্যই তো ওঁকে মিছিমিছি এতক্ষণ কষ্ট ক'রে ব'সে থাকতে হ'ল। এই লজ্জায় ওঁর সঙ্গে কথা বলতে ভয়ানক বাধছিল।' শৈবালকে বললে 'সত্যি এর জন্য আমি ভয়ানক লজ্জিত।'

শৈবাল মৃদুকণ্ঠে বললে: 'এর জন্যে আপনার লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই।'

বিজন হেসে বললে: 'কারণ আছে বৈ কি। কিন্তু তাই ব'লে দোষ সম্পূর্ণ আমার একার নয়! ওঁর মত চমৎকার গল্পের সঙ্গিনী পেয়েছিলাম ব'লেই তো এটা হল। কাজেই আমার দোষের অর্দ্ধেক ভাগ ওঁর।' মাধবীর দিকে চেয়ে বললে: 'এর অর্দ্ধেক দোষ আপনার ঘাড়ে নিতে রাজি? না, দস্যু রত্নাকরের পরিবারবর্গের মত নিঃসঙ্কোচে ব'লে বসবেন, তোমার দোষের এক কণা ভাগও আমি নিজের ঘাড়ে নেব না।'

শৈবালের সামনে নিজেকে খুব সংযত ক'রে মাধবী ক্ষুব্ধভাবে তাদের কথাবার্ত্তা শুনছিল, কিন্তু আর নিজেকে সামলাতে পারলে না। বিজনের শেষের কথায় উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়বার উপক্রম করল। তাড়াতাড়ি নিজের এই অবাধ্য হাসিকে থামাবার জন্য মুখে আঁচল চাপা দিল, তবু অবরুদ্ধ হাস্যে দেহখানা দুলে দুলে উঠতে লাগল। একটু পরে হাসির বেগটা থামলে পর বললে: 'ঝাবা, কে আপনার সঙ্গে কথায় পারবে।'

সবিতা হাসতে হাসতে বললে: 'এত জানিস' শৈবালের দিকে চেয়ে হেসে বললে: 'ওর সঙ্গে কথায় কেউ পেরে ওঠে না। দেখচ তো কি রকম কথা বলতে পারে।'

বিজন শৈবালকে হেসে বললে: 'আমার একার এত বড় দোষ ক্ষমা ক'রতে হয় তো আপনার বাধত, কিন্তু এখন সেই দোষ দু-জনের ভাগে পড়েচে। আশা করি এখন সহজেই ক্ষমা করতে পারবেন?'

কিন্তু আশ্চর্য্য—যাকে সম্বোধন ক'রে কথাগুলি বলা হ'ল তার দিক থেকে বিশেষ কোন উত্তরই এল না। মনে হ'ল এই আনন্দ এই উচ্ছ্বসিত হাসির প্রবাহ তাকে লেশমাত্র স্পর্শ করে নি। শৈবাল নীরবে নতমুখে আহার করতে লাগল বটে কিন্তু তার বুকের ভেতরটা তখন রোষে ক্ষোভে জ্বালায় পুড়ে যাচ্ছিল এবং যার রসিকতায় মাধবী হাসির আবেগে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল, যার কথায় ভগিনী সবিতা ভ্রাতৃগর্ব্বে গর্ব্বিতা হ'ল সেই যুবকটির প্রতি তার সমস্ত মন এমনি বিমুখ হ'য়ে উঠল যে ভাল ক'রে তার কথার উত্তর পর্য্যন্ত দিতে তার প্রবৃত্তি হ'ল না। বিষাক্ত বিমুখ মন তার কেবলই এই আবহাওয়ার মধ্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য জোরে তাগিদ দিতে লাগল। অসহ্য মাধবীর নির্লজ্জ হাসি—আর বিজনের রসিকতা। মুহূর্ত্তে শৈবালের মুখে সমস্ত আহার্য্য তিক্ত বিস্বাদ ঠেকল। আহার্য্য যতই সুস্বাদু হোক, এই বিশ্রী অসহ্য আবহাওয়ার মধ্যে তার মত শিক্ষিত উচ্চবংশীয় যুবকের গলা দিয়ে সে আহার্য্য নামবে কেমন ক'রে!

একটু পরে নিজেকে সংযত ক'রে শৈবাল বললে: 'থাক ও কথা আর মিছামিছি ব'লে কি হবে।'

বিজন বুঝল যে কোন কারণেই হোক, শৈবাল তার সঙ্গে নিজেকে ঘনিষ্টভাবে জড়াতে চায় না, তাই আর তার সঙ্গে কোন কথা বলবার চেষ্টা না ক'রে আহারে মন দিল। সে তো ভদ্রতা ক'রে কথা বলেছে—তার নিজের দিক থেকে ভদ্রতার সৌজন্যের তো কোন ত্রুটি হয়নি—তাহ'লেই হ'ল।

সবিতা শৈবালের দিকে চেয়ে এক সময়ে ব'লে উঠল: 'হাঁ শৈবাল, মাছের চপটা যে সরিয়ে রাখলে? কালিয়ার বাটিতে তো হাতই দিলে না! রান্না ভাল হয় নি বুঝি।'

'আর খেতে পারচি না কাকীমা।'

শৈবালের সমস্ত আচরণ ও ব্যবহারে আঘাত পেলেও মাধবী তার সঙ্গে কথা কইবার সুযোগ খুঁজছিল। কারণ তাদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত একটি কথার বিনিময়ও হয় নি, শৈবালের সঙ্গে তার এই আচরণ লক্ষ্য ক'রে পাছে তাদের কলহের কথা কেউ জানতে পারে এই আশঙ্কায় কণ্টকিত হ'য়ে মাধবী এক কৌশল করলে। শৈবালের কথা শেষ হ'তেই খুব সহজভাবে হেসে বললে: 'না কাকীমা, শৈবালদার এ কথা একেবারে মিথ্যে। বিজনবাবুর সঙ্গে খেতে ব'সেচে ব'লে লজ্জা ক'রে খাচ্চে, তুমি শৈবালদাকে আলাদা বসিয়ে খাওয়ালেই তো পারতে! লজ্জায় ওর হয়তো পেট ভরে খাওয়াই হ'ল না।'

কথাটা ভারি উপভোগ্য। তিনজনই একসঙ্গে হেসে উঠল। কিন্তু যাকে নিয়ে এ রসিকতা করা হ'ল, সে এর রস-গ্রহণ ক'রতে পারলে না। তেমনি স্তব্ধভাবে নতমুখে খেতে লাগল। মাধবী আড়চোখে তা কয়ে দেখলে শৈবালের মুখ পাষাণের মত কঠিন হ'য়ে উঠেছে এবং আনত দুটি চোখ দিয়ে অসহ্য ক্রোধে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে।

অনেক জিনিষই সংসারে সবিতার চোখ এড়িয়ে যায়, এটাও গেল। সে শৈবালের কথার সূত্র ধরে বললে: 'খেতে পারবে না কি। কি এমন খেয়েচ তুমি? নাও কালিয়ার বাটি থেকে অন্ততঃ মাছটা তুলে নাও। না-ও ব'সে রইলে যে! হাঁ, তোর যে পাতে সবই প'ড়ে রইল রে, কিছুই যে খেলি নে।' সজনে-ফুল ভাজা ভালবাসিস—বেশি ক'রে দিয়েছে তাও তো ছুঁলিনে।'

সজনে-ফুল ভাজা খেতে আমি ভালবাসি হা ভগবান এও শুনতে হ'ল। তোমাদের মত লোভী নারীদের জন্য ও বেচারা তো চিরকাল কাব্যে অপাঙক্তেয় হ'য়ে রইল। তোমাদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে সজনে ফুলও পরিত্রাণ পেলো না। রান্নাঘরে ঢুকিয়ে দিলে ওর জাত মেরে। সেই দুঃখে তো ছুঁই না।

'কি যে সব সময় রসিকতা করিস' ব'লে সবিতা শৈবালের দিকে চেয়ে বললে: 'ভাল কথা' আজ দুপুরে তুমি এস শৈবাল—চারজনে তাস খেলব। রাণী আর বিজন এরা দুটি হ'চ্চে পাকা খেলোয়াড়। আজ তোমাতে আমাতে বসব। দেখি ওদের হারাতে পারি কি না।'

শৈবাল মুখ না তুলেই বললে: 'আজ দুপুরে আমার আসা হ'য়ে উঠবে না।'

'কেন।'

'কলকাতায় যাব।'

'মাসীমার বাড়ীর মেয়েদের থিয়েটারে নিয়ে যেতে হবে বুঝি?'

'না, অন্য একটা কাজে যাব।'

'তবে দুপুরে নাই গেলে। বিকেলে যেয়ো।'

'না কাকীমা, আমাকে এখুনি বেরতেই হবে।'

'আজ কি না গেলেই নয়?'

'না।'

সবিতা নৈরাশ্যক্ষুব্ধকণ্ঠে বললে: 'আজ তাহ'লে বেশ খেলা যেত। তা কাল দুপুরে এস, এই চারজনে খেলব!'

'কালও বোধ হয় আসা হ'য়ে উঠবে না। এ কদিন রোজই কলকাতায় যেতে হবে।'

সবিতার মুখ দিয়ে আর কোন কথা বার হ'ল না।

বিজন বললে: 'ভালই হ'য়েচে দিদি খেললে তো হারতেই! তার চেয়ে না খেলে মনে মনে ভাবা ভাল, খেললে নিশ্চয় জিততে পারতাম। কি বলেন?'

বিজন মাধবীর মুখের দিকে চেয়ে হাসলে। সে হাসিতে যোগ দেবার মত মনের অবস্থা মাধবীর ছিল না, সে নীরব হ'য়ে রইল। সবিতা তখন আশাভঙ্গে মুহ্যমান, মিনিট দুই তাই নিঃশব্দে কেটে গেল। এমনি সময় ভোলা চাকর এসে দাঁড়াল সেখানে।

সবিতা মুখ ফিরিয়ে বললে: 'বাবুদের আঁচাবার জল তোয়ালে সব ঠিকঠাক ক'রে রাখ্, আর তুই এখন এখান থেকে কোথাও যাসনে। বাবুদের খাওয়া হ'য়ে এল। ভাল কথা—হাঁ রাণী, দোতলার ঐ ঘরটা পরিষ্কার করিয়ে বিছানা পাতিয়ে সব ঠিকঠাক করিয়ে রেখেচিস তো মা? বিজন ও ঘরটায় থাকবে।

মাধবী ভয়ানক চমকে উঠল। এ কথা তো তার একেবারেই স্মরণ নেই।

'ও কি চুপ ক'রে আছিস যে? সে কথাটা বুঝি একেবারে ভুলে গেছিস?' সবিতা মাধবীর নতমুখের দিকে চেয়ে বললে: 'তোর মন আজকাল কোথায় প'ড়ে থাকে রাণী? কাল তোকে পই পই ক'রে ব'লে দিলুম, আজ বিজন আসবে ঘরটা ভোলাকে দিয়ে ঠিকঠাক করিয়ে রাখিস—'

এবং সঙ্গে সঙ্গে মাধবীর পায়ের নীচেকার মাটি দুলে উঠল। আজ যে সকাল বেলা শৈবালের প্রতিবাদ সত্ত্বেও কলহ ক'রে জোর ক'রে বলেছে—বিজন যে আজ আসবে তা সে জানত না—আর সেই শৈবালের সামনেই তার সমস্ত মিথ্যা এমনি নিষ্করুণভাবে প্রকাশ হ'য়ে প'ড়ল! সবিতার কথা শেষ হ'তেই শৈবাল মুখ তুলে স্থিরদৃষ্টিতে একটিবার মাত্র মাধবীর মুখের দিকে তাকাল। তার সেই

দৃষ্টির কল্পনাতীত অর্থ হৃদয়ঙ্গম ক'রে মাধবী নিঃশব্দে বিবর্ণ-মুখে ব'সে রইল। দুঃখে ক্ষোভে লজ্জায় অপমানে তার চোখে জল এসে পড়েছিল।

অকস্মাৎ শৈবাল ব'লে উঠল: 'আজ একটা অভদ্রতা করছি কাকীমা, মাপ করবেন—একটা জরুরি কাজে আমাকে এখুনি উঠতেই হ'চ্চে।'

'সে কি শৈবাল? তোমার যে খাওয়াই হ'ল না! কি এমন কাজ—'

'দুটো পঁচিশ মিনিটের ট্রেণ এখুনি না উঠলে ধরতে পারব না' শৈবাল আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে: 'খাওয়ার জন্য ভাববেন না। এত বেশি খাওয়া কোন দিন খাই নি।'

মাধবী খানিকটা তফাতে তেমনি নতমুখে বসেছিল। আঁচিয়ে এসে শৈবাল তার পাশে দাঁড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ হাত মুছতে লাগল।

'শৈবালকে ঘর থেকে চাট্টি মসলা এনে দে রাণী।'

'দরকার নেই কাকীমা, মসলা আমার কাছেই আছে' ব'লে তোয়ালেটা টাঙানো তার লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ে—শৈবাল খুব নিম্নকণ্ঠে যেন স্বগত-উক্তি ক'রল: 'ওর মত মেয়ের ছোঁয়া খেতে আর আমার প্রবৃত্তি হয় না।' (ক্রমশঃ)

অমৃত চায় নর

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

সংখ্যা ত নাই কতই যে কাজ তার,
বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র এ সংসার।
সত্য একটা রাজ্য তাহার গৃহ,
সুন্দর এই ভুবন তাহার প্রিয়।
কত আশা আর কতই না শঙ্কা,
বক্ষে তাহার সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা।
সতত যে তার অতৃপ্ত অন্তর,
অমৃত চায়, অমৃত চায় নর।

২

জ্ঞান বিজ্ঞান স্থপতি শিল্পকণা,
সুধার লাগিয়া এ কোন পথ চলা।
যুগের যুগের মহা মানবেরা আসি,—
সুধার খপর দিয়ে যায় ভালবাসি।
ক্ষিতি অপ তেজ মরুতে ও ব্যোমে হয়ে
সন্ধানী নর সুধার গন্ধ পায়।
দেবতা তাহার অন্তরে দেছে ক্ষুধা—
নাহিক তৃপ্তি, মানব যে চায় সুধা।

৩

বিদ্যুৎ আজ তাহার আজ্ঞাবহ
জয় যাত্রার সংবাদ তার লহ।
আকাশ পাতালে স্থাপিয়াছে অধিকার,
করেছে সৃষ্টি সাহিত্য সম্ভার।
গ্রহে গ্রহে তার আবিষ্কারের ধুম
তবে দৃষ্টির চলিয়াছে মরুস্থম।
তবু অতৃপ্ত শান্তি তাহার নাই।
অমৃত চাই, অমৃত তার চাই।

৪

সে ত সব পারে কিছুতেই নহে কম
তাহার সৃষ্ট দ্রব্যও অনুপম।
প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না সে,
সুধার ভাণ্ড নাই যে তার পাশে।
তাই জীবনেতে এত সন্দেহ দোল—
এত সংগ্রাম, হিংসার হিল্লোল।
সদা ধুক্ ধুক্ করিতেছে অন্তর,
অমৃত চায়, অমৃত চায় নর।

ধনসঞ্চয়ে জীবন-বীমা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

প্রয়োজন কি?

জীবন-বীমার সার্থকতা কি?—বিশেষ করিয়া আমাদের দেশে ইহার ব্যাপক প্রসারের প্রয়োজন উপলব্ধ হইতেছে কেন—এ সকল কথা চিন্তা করিতে গেলে পারিবারিক প্রবন্ধের অমর-লেখক স্বর্গীয় ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "অর্থ-সঞ্চয়" নামক প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে।

ভূদেবচন্দ্র ছিলেন বাঙ্গালা দেশের পারিবারিক মঙ্গল-বিধানের পুরোহিত—তাঁহার লেখায়, আচার-আচরণে ও ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তে তিনি তাঁহার আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন!—আজিও পর্য্যন্ত—এই অদৃষ্টপূর্ব্ব 'প্রগতি'র যুগেও তাঁহার সে আদর্শ হইতে বাঙ্গালী সমাজ যে সর্ব্বতো-ভাবে বিচ্যুত হয় নাই এ কথা জোর করিয়া বলা যায়।

সমাজের যে শক্তির উদ্বোধনকল্পে ভূদেবচন্দ্র সঞ্চয়ের কথা বারবার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাকেই আজকাল আমরা অর্থনৈতিক বা আর্থিক সঙ্গতি বা উন্নতি বলিয়া অভিহিত করিতেছি।

ভূদেবচন্দ্র বলিয়াছেন—"ভবিষ্যদ্দর্শন ও সঞ্চয়ের উপায়োদ্ভাবন দ্বারা আমাদের সমাজে শক্তিসঞ্চয়ের প্রয়োজন।" ভূদেবচন্দ্রের নিজের "ভবিষ্যদ্দর্শন" ছিল—তিনি তাই সমাজের গোড়াপত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার ক্রমোন্নতি ও স্থিতির মূলে বাঙ্গালীর আর্থিক সঙ্গতি ও সংস্থানের একান্ত প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। কোনও সমাজের কল্যাণ-সৌধ গঠনের ভিত্তিমূলে সঞ্চয়ের পাকা মাল-মশলা জোগান দিবার উপায়ই বা কি—তাহাও তিনি চিন্তা করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালী সংসারের দুর্গতি, তাহার পারিবারিক দুঃখ-দারিদ্র্য ও শোচনীয় উপায়হীনতা তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছিল—আজ তাই জীবন বীমার প্রয়োজন ও সার্থকতার বিষয় চিন্তা করিতে গিয়া—সম্মিলিত পারিবারিক জীবনে সর্ব্বদা আস্থাবান সেই চিন্তাশীল বাঙ্গালীর কথা শ্রদ্ধা-সহকারে স্মরণ করিতে হয়।

বাঙ্গালীর অমিতব্যয়িতাকে লক্ষ্য করিয়া সঞ্চয়-অভ্যাসের প্রতি তাহার অবজ্ঞা ও আধ্যাত্মিক নিরপেক্ষতায় হতাশ হইয়া ভূদেবচন্দ্র বলিয়াছেন,—

"এই জন্যই দেখিতে পাই, কেহ বহু বৎসর ধরিয়া মোটা বেতন পাইয়াও লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদির ভরণ-পোষণের জন্য চাঁদার বহি বাহির হয়। এই জন্যই দেখিতে পাই, কোনও আয়বান ব্যক্তি একখানি প্রকাণ্ড বসত বাটীর কতকদূর প্রস্তুত করিয়া মৃত হইলে তাঁহার ছেলেদিগকে ঐ বাটীর ইট কাঠ বেচিয়া খাইতে হয়। এই জন্যই দেখিতে পাই, খুব স্বচ্ছল পুরুষ যেই গেলেন, অমনি দেনার দায়ে তাঁহার ঘটি বাটি পর্য্যন্ত নিলামে উঠে! এই জন্যই প্রশংসাবাদ শুনিতে পাই—"অমুকের অত আয়, কিন্তু সঞ্চয় এক কড়াও নাই" "অমুক স্বয়ং ঋণগ্রস্ত হইয়াও দান করিয়া ফেলেন, বলেন, ছেলেদের জন্য কিছু না রাখাই ভাল; ধনবানের পুত্ররা প্রায়ই মন্দ এবং অকর্ম্মণ্য লোক হয়।"

জগত সম্পর্কে আধ্যাত্মিক মনোভাব বা ঔদাসিন্য অসংসারী বা সন্ন্যাসীর পক্ষে ভাল—কিন্তু যাঁহারা সংসারী, স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া যাঁহারা সংসার ধর্ম্ম পালন করিতে প্রতিশ্রুত, তাঁহাদের পক্ষে এই প্রকার "অমিতব্যয়িতার প্রশংসাবাদ সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর নহে; যাহা কিছু আয় হয়, সকলই ব্যয় করিয়া ফেলা গৃহস্থধর্ম্মের অনুকূলাচরণ নহে।"

সঞ্চয়ের মূলনীতি

জীবন-বীমার মূলনীতিও তাই;—পরিবারের জন্য সঞ্চয় করিয়া যাওয়া লোকতঃ ধর্ম্মতঃ আমাদের কর্ত্তব্য। সেই সঞ্চয়ের সহজ উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে জীবন-বীমায়।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, পরিবার প্রতিপালন ও সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রত্যেক মানুষের আছে। পুত্রকন্যার ভরণপোষণ ও শিক্ষার ভার, কন্যাকে সৎপাত্রে দান করিবার দায়িত্ব পিতামাতার, বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি-পালনের ভার যোগ্য সন্তানের—এইরূপ জীবনকালে এবং জীবনান্তে স্ত্রীর সর্ব্ববিধ ব্যয়ভার বহন করিবার কর্ত্তব্য

স্বামীর—ইহাই সংসার-জীবনে মনুষ্যত্বের দাবী এবং এই দাবী মিটাইবার সহজ উপায় জীবন-বীমা করিয়া নিয়মিত-ভাবে সঞ্চয় করা। যাহার যেমন প্রয়োজন, যাহার যেমন সঙ্গতি, সেই অনুসারে সঞ্চয় করিবার সুযোগ একমাত্র জীবন-বীমাতেই পাওয়া যায়।

গৃহস্থকে যে কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে হয় একথা সকল দেশের বিজ্ঞ লোকেই বলিয়া থাকেন। ইংরাজ দার্শনিক মহামতি বেকন বলিয়াছেন—"উপার্জ্জনের অর্দ্ধেক সঞ্চয় কর।" সঞ্চয় ব্যতিরেকে লক্ষ্মীমন্ত হইবার উপায় নাই; পারিবারিক শান্তিও অমিতব্যয়ীর পক্ষে লাভ করা সম্ভব নহে। যিনি "যত্র আয় তত্র ব্যয়" করেন, সংসার-জীবনে সফলতা লাভ করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।—ইহা ত আমরা আমাদের ঘরে ঘরে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি।

মনীষী ভূদেবচন্দ্র শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তিনি শাস্ত্রানুশাসন বিশেষভাবে অনুশীলন করিয়াছিলেন। আমাদের শাস্ত্র বলিতেছেন—

"ভবিষ্যৎকালের জন্য আয়ের সিকি জমা রাখিবে, অর্দ্ধেক নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ করিবে, আর সিকি ধার দিয়া সুদে বাড়াইবে।"

ভূদেবচন্দ্র যখন বাঙ্গালী গৃহস্থের সঞ্চয়ের কথা বলিয়াছেন, শাস্ত্রকার যখন হিন্দুর উপার্জ্জিত অর্থের ব্যয়ভাগ দেখাইয়াছেন, তখন জীবনবীমার তথ্যের কথাই তাঁহারা অজ্ঞাতে বলিয়া গিয়াছেন—কারণ প্রত্যেক উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির উপার্জ্জনের আংশিক সঞ্চয় সম্পর্কে জীবন-বীমার নীতিও এইপ্রকার। কেন না, জীবনবীমা একাধারে আমাদিগকে সঞ্চয় এবং লগ্নী ব্যাপারে সুবিধা ও লাভের ভাগী করিয়া থাকে। সম্পাদিত জীবন-বীমায় সঞ্চিত একটা নির্দ্দিষ্ট টাকা বাঁচিয়া থাকিলে আমি এককালীন পাইয়া ভোগ করিয়া যাইতে পারিব এবং মেয়াদী সময়ের আগে আমার যদি মৃত্যু হয়, আমার বীমার টাকা আমার স্ত্রীপুত্রপরিবার পাইবে;—সঞ্চয়ের এই সান্ত্বনা ও শান্তি লাভের সুযোগ দেয় জীবন-বীমা,—বীমা তহবিলের লগ্নী কারবারে আমার প্রদত্ত টাকার অংশতঃ সুদের ভাগীদারও আমি। নিজের আর্থিক সঙ্গতির এই শক্তি মানুষকে বড় করে—পরিবারকে, গোষ্ঠীকে আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন করিয়া তোলে—জাতিকে আর্থিক সম্পদের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর করিয়া দেয়। জীবনবীমার সূক্ষ্ম তত্ত্বই হইতেছে এই।

অবস্থা ভেদে ব্যবস্থা

কিন্তু সকল লোকের আর্থিক অবস্থা সমান নহে এবং সেই কারণেই সকলের পক্ষে সমপরিমাণ সঞ্চয় সম্ভব হইতে পারে না। তাই, ব্যক্তি ও অবস্থা বিশেষে সাধ্যানুযায়ী সঞ্চয়ের ব্যবস্থা দিয়া মানব-সংহিতা রচয়িতা ভগবান মনু বলিয়াছেন,—

"তিন বৎসর খরচের যোগ্য, অথবা এক বৎসরের যোগ্য, তিন দিনের যোগ্য, অন্ততঃ একদিনের যোগ্য ধান্য সঞ্চয় করিবে।"

অতএব দেখা যাইতেছে শাস্ত্রনির্দ্দেশ অনুসারে আমাদের সকলেরই কিছু না কিছু সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য।

"যে দিন আনে সে প্রতিদিন সঞ্চয় করিবে, যে মাসে আনে সে প্রতি মাসে সঞ্চয় করিবে, যে বর্ষে আনে সে প্রতি বর্ষে সঞ্চয় করিবে। কিন্তু কিছু সঞ্চয় সকলকেই করিতে হইবে। আর একটি নিয়ম এই যে, খরচের পূর্ব্বভাগে সঞ্চয় করিবে, খরচের শেষভাগে নয়।"

জীবনবীমার তথ্য নিরূপণ বা সঞ্চয়ের "উপায়োদ্ভাবন" সম্পর্কে যাঁহারা চিন্তা করিয়াছেন, চিন্তাকে কার্য্যক্ষেত্রে সুপ্রয়োগ করিবার জন্য ব্যাপৃত আছেন, সেই বীমাবিদ্ পণ্ডিতগণও মানুষের বিভিন্ন অবস্থার জন্য বিভিন্ন প্রকার বীমার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ৫০০৲ টাকা হইতে যেখানে ৫০ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিবার সুযোগ আছে, বয়স এবং মেয়াদ বা কাল অনুসারে চাঁদার তারতম্য রক্ষা করিয়া যেখানে সঞ্চয়ের সৌকর্য্য সাধন করা হইতেছে, সেখানে শাস্ত্র, বিজ্ঞান ও মানবধর্ম্মের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াই কর্ম্মিগণ আপনাদের কর্ম্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন।

পারিবারিক দায়িত্ব

উপযুক্ত সঞ্চয়শীলতার অভাবে আজ বাঙ্গালী সমাজ নানাভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। "অভাবে স্বভাব নষ্ট" এই প্রবচন বাঙ্গালীজীবনে অনেক ক্ষেত্রেই সত্য হইয়া উঠিতেছে। আজ আমরা স্বাধিকারলাভের জন্য যে প্রাণপাত চেষ্টা করিতেছি—তাহার সাফল্যের জন্য বাঙ্গালী পরিবারকে আত্মস্বতন্ত্র করিয়া সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করা চাই। দরিদ্র পরিবার সমাজকে রুগ্ন, আশা ভরসা ও উৎসাহহীন করিয়া জাতির স্কন্ধে দুর্ব্বহ ভার হইয়া পড়িতেছে, আর্থিক সংস্থানে

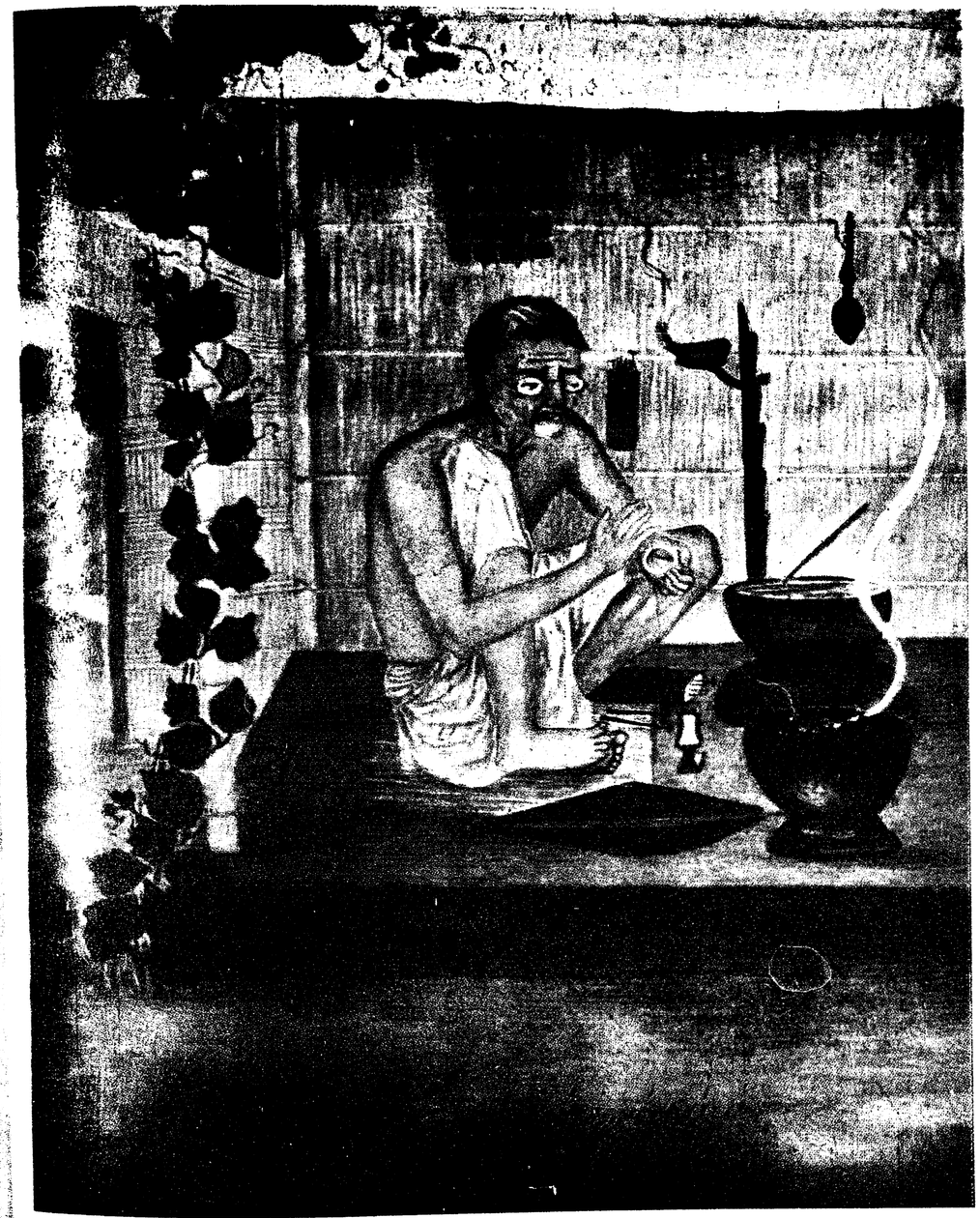

গ্রাম্য স্বর্ণকার

শিল্পী—শ্রীযুক্তা মণি দেবী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

COLOURED ILLUSTRATION

সমাজের পুনর্জ্জীবন দান করা ছাড়া জাতির অভ্যুত্থানের আর কোনও উপায় নাই।

মনের ধর্ম্মের দিক দিয়া, সমাজ ও পরিবারের সংহতি ও সংস্থিতি সাধনের দিক দিয়া—ভূদেবচন্দ্র বলিতেছেন—

"সঞ্চিত অর্থকে কদাপি নিজের মনে করিতে নাই। বাস্তবিক উহা সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব নহে। তুমি যাহা রোজগার করিতেছ তাহাতে তোমার পরিজনের অংশ আছে। তুমি যাহা সঞ্চয় করিতেছ, তাহাতেও উহাদের অংশ আছে। তুমি সঞ্চয়ের ধন যদি পারিবারিক বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন খরচ করিয়া ফেল, তবে কিয়ৎ পরিমাণে পরস্বাপহারী হইবে।"

"পরস্বাপহারী" কথাটি এখানে বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। সমাজে অবিবেচক ও অবিমিশ্রকারী লোকের অভাব নাই। নিজের সুখ ও আরামের জন্য, পরিবারবর্গকে নিঃসম্বল করিয়া রাখিয়া যাইবার দৃষ্টান্ত ও আমাদের সমাজে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। উপার্জ্জনক্ষম অভিভাবকদের মৃত্যুতে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে যে দারিদ্র্য দুঃখের হাহাকার উঠিতেছে তাহাত আমরা নিত্যই শুনিতেছি। ইহা হইতেই আমাদের পারিবারিক দায়িত্ব সূচিত হইতেছে। দায়িত্ব এড়াইয়া চলা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে। পরিবার সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে পথে বসাইবার অধিকার আমার নাই। যাহারা পারিবারিক দায়িত্ব এড়াইয়া আত্মসর্ব্বস্ব জীবন যাপন করিয়া সুখী হইতে চায়—ধর্ম্ম ও সমাজের চোখে তাহারা নিন্দনীয়। সমাজকে দুর্ব্বল করিয়া তাহারা ক্রমশঃ জাতিকেও পঙ্গু ও বিপন্ন করিয়া তোলে। কল্যাণ কর্ম্মের সূচনা ও পরিণতির উপর জাতীয়তার সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত করিতে হইলে সঞ্চয় তথা জীবনবীমার প্রয়োজন ও সার্থকতা সম্বন্ধে আজ প্রত্যেক বাঙ্গালীকে অবহিত হইতে হইবে।

মনের অন্তরালে

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মৌলিক এম-এ, বি-এল

শ্যামল এবার অনেক চেষ্টার পর তার বাবার কাছ থেকে মত পেল—তাদের গাঁ কুসুমপুর যাবার। সামনেই বড়দিনের ছুটি, কলেজ দশ বার দিন বন্ধ। তাই শ্যামল তার বাবাকে সিমলাতে লিখেছিল—এ'কটা দিন কলেজের ছুটিতে বাড়ী যেতে চাই। এখন শীতে ওখানে অসুখ বিসুখ নেই; তা ছাড়া সেখানে কদিনই বা থাকব'। একবার ভারী দেখতে ইচ্ছে করে নিজেদের গাঁ-টাকে। সেই কবে যে গিয়েছি দেশের বাড়ীতে তা ভাল করে মনেই পড়ে না। আশা করি এবার অমত হবে না আপনার।

শ্যামলের বাবা জগদীশবাবু থাকেন সিমলা। সরকারী ডাকবিভাগে মস্ত বড় চাকরে—মাইনে হাজারেরও ওপর। বছরের বেশীর ভাগ সিমলাতেই কাটে, দিল্লীতেও থাকতে হয় কিছুদিন করে। শ্যামল তার একই মাত্র ছেলে, আর মেয়ে সীতা। শ্যামল প্রেসিডেন্সিতে পড়ে বি-এ,—থাকে হিন্দু হোষ্টেলে। আর সীতা থাকে বাপ মার কাছে—কখনও দিল্লী, কখনও সিমলা। জগদীশবাবু তাঁর ছেলেকে "বইয়ের পোকা" করতে না চাইলেও তাঁর মনে একটা গোপন আকাঙ্ক্ষা ছিল গোড়া থেকেই। তাই তিনি শ্যামলকে বই-নিয়ে বসে থাকতে দেখলেই সুখী হতেন বেশী। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দুটো পরীক্ষাতেই শ্যামল খুব উঁচু স্থানই অধিকার করেছিল, তাই বি-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হবার সাথে সাথে জগদীশ বাবু শ্যামলকে লিখতে সুরু করেছেন—সময় নষ্ট কোর না একটুও। বি-এ তে ইকনমিক্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া চাই। অবশ্য শ্যামলের পক্ষে প্রথম হওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়, কিন্তু তবুও পরীক্ষার দু-বছর আগে থেকেই তার বাবার অমনি ধরণের আদেশে মনটা দমে যায় অনেকখানি।

এবার সে ঠিক করেছে বাড়ী যাবেই। এতদিন তো তার বাবা যেতে দেন নি মোটে, পরীক্ষা আর পড়াশুনার জন্য। ক'লকাতা থেকে কতদূরই বা তাদের বাড়ী। মাত্র একটা বেলা আর একটা রাতের পথ। মনে পড়ে কবে সেই ছোট বেলায় সে মায়ের সাথে গিয়েছিল তাদের গাঁয়ে। তখন সে বাসায় পড়ে মাষ্টারের কাছে। গাঁয়ের ছবিখানি

স্বপ্নের মতই মনে পড়ে তার মাঝে মাঝে। ক'লকাতার এ কোলাহল থেকে কদিন দূরে সরে যেতে তার ইচ্ছে করে খুব। সিমলা আর দিল্লীতেও তার মোটেই ভাল লাগে না। সেখানে ও পথে ঘাটে, চাল-চলনে, কেমন একটা কৃত্রিমভাব—কেমন একটা মার্জ্জিত রুচির আবহাওয়া। এ সব তার কাছে লাগে অসহ্য। তাই এবার সে তার বাবা আর মাকে অনেক আগে থেকেই লিখছে—থার্ডইয়ারে কদিনের জন্য বাড়ী গেলে পড়াশুনার মোটেই ব্যাঘাত হবে না, বরং মনটা তার ভাল হবে অনেকখানি। কি জানি কেন জগদীশবাবুও এবার অমত করেন নি। তবে লিখেছেন—সাতদিনের বেশী থেক না ওখানে, অসুখ বিসুখ হতে পারে। ওখানকার জল-হাওয়া সহ্য নাও হতে পারে তোমার—সাবধানে থেক। শ্যামলের তাই এবার ভারী আনন্দ—নিজেদের গাঁয়ের বাড়ীতে যাবে।

শেষ রাতে ট্রেণ থেকে নেমে শ্যামল আলো-আঁধারে ঢাকা ষ্টীমার ঘাটে এসে বিস্মিত মুগ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। শীতের কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস পদ্মার বুক বেয়ে এসে তীরে লাগছে। সাদা স্বচ্ছ ধূয়ার মত কুয়াসায় ঢেকে আছে চারিদিক, আর তারই মাঝে এক একখানা ষ্টীমার বাতি নিবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যাত্রীর আশায়। ভোর হ'তে তখনও কিছুটা বাকী।

শ্যামল ষ্টীমারের দোতালায় একটু জায়গা করে নিল নিজের জন্য। যে সব যাত্রী আগ-রাতে বা মাঝ রাতে এসেছে তারা পাটাতনের ওপর বিছানা ক'রে দিব্য নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। রাতের আঁধারে চারিদিক আচ্ছন্ন। শেষ-রাতের আকাশে তখনও কয়েকটা তারা জ্বলছে মিট্‌মিট্ করে। পূবের আকাশটা বেশ লাল হ'য়ে উঠেছে। চারিদিকের কুয়াসা অনেকটা তরল হ'য়ে এল। বাইরে খুবই ঠাণ্ডা। ক্যান্‌ভাসের পুরু ঢাকনা ফেলে দেওয়া চারদিকে। শ্যামল একটা কোনে একটু খোলা জায়গায় গিয়ে রেলিঙ ধরে বাইরের পানে চেয়ে আছে। এ যেন প্রকৃতির শীতল স্নিগ্ধ আর একটা রূপ! মৌন জগতে প্রকৃতির এ অপূর্ব্ব লীলা দেখতে দেখতে শ্যামল তন্ময় হ'য়ে চেয়ে থাকে বাইরের পানে।

ভোর হবার সাথে সাথে চারদিক অনেকটা ফর্সা হ'ল। গাঢ় কুয়াসা অনেকটা তরল হয়ে ছড়িয়ে গেছে সবদিকে। নদীর জল প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত ক'রে সশব্দে ষ্টীমার তার যাত্রা সুরু করে দিল। শ্যামলদের গাঁয়ের ঘাটে ষ্টীমার এসে লাগবে বেলা ন'টায়।

কত গ্রাম পেরিয়ে নদীর ধার দিয়ে ষ্টীমার চলেছে। বহু দূরের তাল সুপুরি খেজুর গাছে ঘেরা গ্রামটা ক্রমেই কাছে এসে পড়ে - আবার সেটা ছাড়িয়ে ষ্টীমার চলে দূরের পানে। কোথাও আবার নদীর পাড় দিয়ে দিগন্ত বিস্তীর্ণ মাঠ—ধান সব কাটা হয়ে গেছে, এখনও চিহ্ন তার স্পষ্ট। কোথাও নদীর পাড়েই চাষীর কুটীর—তাদের সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে শ্যামলের চোখে। ছেলে-মেয়েরা নগ্ন পায়ে মলিন বসনে পাড়ে দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে থাকে ষ্টীমারের যাত্রীদের দিকে। কোথাও আবার কৃষক বঁধু ছেঁড়া-কাঁথা কম্বল বাইরে রোদে এনে মেলে দেয়। নদীতে জেলেরা ছোট ছোট ডিঙ্গিতে মাছ ধরছে। ষ্টীমারের জলের আলোড়নে তাদের ছোট ছোট ডিঙ্গি ভীষণভাবে দুলতে থাকে—তারা তাদের কাজ করে চলে আপন মনে, ভয় বা ভাবনার চিহ্নও নেই কোনখানে। মাঝে মাঝে দু-একখানা বড় বড় নৌকা পাল তুলে ধীর মন্থর গমনে চলেছে।

শ্যামল অবাকবিস্ময়ে মুগ্ধনয়নে এ সব দেখে। দেখে দেখেও তার দেখবার আশ মিটছে না মোটে। কখন যে তাদের গাঁয়ের ঘাটে ষ্টীমার এসে লেগেছে বুঝতেই পারে নি। যাত্রী জনকয়েক তাদের মোট নিয়ে ষ্টীমার থেকে ঘাট অবধি পেতে দেওয়া সরু তক্তার ওপর দিয়ে পাড়ে উঠছে। শ্যামলও নেমে প'ড়ে সুটকেশ মুটের মাথায় দিয়ে।

শ্যামল ঘাটে এসে দাঁড়াতেই বেশ বলিষ্ঠ সবল একটি ছেলে—মাজায় কাপড় বাঁধা, ঘাড়ের ওপর ছিটের একটা সার্ট, খালি পা, গায়ে ডোরাডুরি হাতকাটা ফতুয়া, শ্যামলের কাছে চট্ করে এসেই জিজ্ঞেস করে—শ্যামল, চিন্‌তে পারলি আমাকে? শ্যামল নিরুত্তর, ছেলেটির মুখের পানে তাকিয়ে থাকে অবাক হ'য়ে। কোন দিন একে দেখেছে বলে মনে পড়ে না। ছেলেটি বলে—বাঃ রে, এরি মধ্যে ভুলে গেলি! আমি যে তোর কানুদা—তোর চেয়ে দুবছরের বড়। সেই যে কতদিন আগে ছোটবেলা একবার এসেছিলি, আমার তো বেশ মনে আছে তোর কথা।

শ্যামল এবার বুঝতে পেরে বলে—ওঃ তুমিই তা হলে

কানুদা! কিছু মনে কর না ভাই, সে তো অনেকদিনের কথা—চেহারাও বদলে গেছে তোমার খুব।

—তা, এবার চল নৌকায় উঠি। ঐ বিলটার মধ্য দিয়ে আধ মাইলটেক গেলেই বাড়ীর ঘাটে উঠব।

শ্যামলের কানুদা সুটকেশ নিজের ঘাড়ে ফেলে শ্যামলকে নিয়ে নৌকায় উঠল। তারপর নিজেও গিয়ে দাঁড় ধরে বসে বললে—চলরে, চরণ—চালিয়ে চল, দাঁড়ে আমিই বসছি। শ্যামলদের নৌকা কুসুমপুর গাঁয়ের দিকে চল্‌ল।

কুসুমপুর গাঁয়ে শ্যামলদের পৈতৃক বাড়ী। বাড়ীতে জ্যাঠামশাই থাকেন আর সবাইকে নিয়ে। তিনিই গাঁয়ের জোত-জমি সব দেখাশুনা করেন। শ্যামলের বাবা জগদীশ-চন্দ্র মেজ ছেলে পড়িয়ে, স্কুলে মাষ্টারি ক'রে, তখনকার দিনে এম-এ পাশ করেন। আপন চেষ্টায় ডাকবিভাগে তাঁর একটা চাকরী হয়। তারপর ভাগ্যজোরে আপন কর্ম্মদক্ষতায় তিনি আজ ডাকবিভাগের এত বড় চাকরে। ছোট ভাই হৃষীকেশ—লেখাপড়া বিশেষ কিছু হয় নি। এ গাঁয়ের কাছেই পাটের আপিসে কি একটা চাকরী করত। বছর কয়েক হ'ল বিধবা পত্নী ও তিনটি ছেলে মেয়ে রেখে কলেরায় মারা যায়। এরা সব বাড়ীতে থাকে। তাছাড়া পিসিমা আছেন বাড়ীতে কর্ত্রী হয়ে বিশ বছরেরও ওপর। তিনি নিঃসন্তান বালবিধবা। জ্যাঠামশায়ের দুই ছেলে, চার মেয়ে। বড় ছেলে বলাই রেলে কি একটা চাকরী করে। ছোট ছেলে কানাই আজ বছর তিনেক চেষ্টা করেও ম্যাট্রিক পাশ করতে পারছে না। কানাই শ্যামলের চেয়ে বছর দুইয়ের বড়। বলাইয়ের বিয়ে হয়েছে কিছুদিন হল। জগদীশচন্দ্র বছর দশ বার বাড়ীতে আস্‌তে পারে না। সরকারী চাকুরী—ছুটি কম। তা ছাড়া আসতে হলেই সপরিবারে আসতে হয়। পত্নী অরুণাদেবীর গীতা হবার পর যে অসুখ হয়েছিল তা থেকে আজ পর্য্যন্ত সুস্থ হ'তে পারেন নি। তাই ছুটি পেলে তাঁকে নিয়ে বছর কয়েক হল স্বাস্থ্যকর স্থানেই যেতে হয় হাওয়াবদলের জন্য। জগদীশবাবু চাকুরীর প্রথম থেকে বাড়ীর খরচ দিয়ে আসছেন নিয়মিতভাবে। তা ছাড়া সংসারের নানা দায় দৈন্যে মোটা টাকা দিতে হয় তাঁকেই। তাই বাড়ী না এলেও বাড়ীর সংসারের সাথে তাঁর সম্বন্ধ আজও আছে অটুট।

কুসুমপুরের বিলের মধ্য দিয়ে শ্যামলদের নৌকা প্রায় বাড়ীর কাছে এল। বাড়ীর নিচেই ঘাট। বাড়ীর সবাই ও গাঁয়ের আর পাঁচজন দাঁড়িয়ে আছে ঘাটের পাড়ে। সেখানে বেশ একটা জটলা।

শ্যামল বলে—কানুদা, এমন একটা নদীকে তোমরা বিল বল কেন! এত বেশ একটা নদী।

কানাই ঠোঁট উল্টে বলে—দূর্, এ আবার একটা নদী! তবে হ্যাঁ, বর্ষাকালে এটা একটা নদী হয় বটে, যেমন স্রোত, তেমনি ডাক। বছর কয়েক হল এ বিলে কুমীরও আসছে।

নৌকা এসে ঘাটে লাগল। শ্যামলের জ্যাঠামশাই হুঁকা হাতে সবার আগে দাঁড়িয়ে আছেন—সাদা ধবধবে দাড়ি—বুক অবধি পড়েছে। শ্যামল দেখেই চিনতে পারে তাঁকে। এসে পায়ের ধূলা নিয়ে প্রণাম করে। জ্যাঠা-মশাই তার মাথায় হাত রেখে করেন—নীরব আশীর্ব্বাদ। পিসিমা এগিয়ে আসেন। সেই শ্যামল, মায়ের কোলের ছোট্ট ছেলেটি! আজ কত বড় হয়েছে! কেমন ফুটফুটে পরিষ্কার পাতলা চেহারা! কেমন মিষ্টি মুখখানা! শ্যামল পিসিমাকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলা মাথায় নেয়। পিসিমা ছোট ছেলের মত আদর করে—তার মাথায় চুমা খেয়ে—বলেন—বেঁচে থাক বাবা। তার পর এক এক ক'রে প্রণম্যদের প্রণাম করে শ্যামল সবার সাথে বাড়ীতে উঠে আসে।

শ্যামলের এতটা কাল বাপ মার কাছে, আর মেস হোষ্টেলেই কেটেছে। তাই এত আপন জনের মধ্যেও তার জড়সড় ভাবটা যায় না। আর বরাবরই সে একটু মুখ-চোরা। বেশী কথাবার্ত্তা, আলাপ আলোচনা করতে পারে না কোনদিন। তবুও বেশ ভালই লাগে এদের সবাইকে। আর ভাগ্যিস কানুদা ছিল, তাই রক্ষে। তা না হলে হয়ত সবার সাথে আলাপ-সালাপ করাও তার পক্ষে মুস্কিল হোত। পিসিমা তো কেবল বলেন—লজ্জা কর না শ্যামল, আমরা তো তোমার আপন জন, এত তোমাদেরই ঘর বাড়ী—কোন অসুবিধে হলে ব'ল। তোমরা সহরে থাক—কত অসুবিধে না জানি হবে।

—না পিসিমা, আমার মোটেই অসুবিধে হচ্ছে না—বরং খুবই ভাল লাগছে সব, সহরের চেয়ে অনেক ভাল, শ্যামল কোন রকমে কথা কটা বলে।

শ্যামল কানুদাকে কাছ ছাড়া করে না। কানুদাকে নিয়ে বসে গিয়ে বাইরের ঘরের উত্তর দিককার বারান্দায়। ঠিক নদীর পাড়েই ঘরখানা। পাড় থেকে অনেক উঁচু করে গেঁথে তোলা হয়েছে। ঠিক তারই নিচে হাতকয়েক দূরে নদী। কানুদা বলে—বর্ষাকালে নদীর জল বারান্দা অবধি আসে। এই বারান্দায় বসে ছিপ দিয়ে তারা সবাই মাছ ধরে। শ্যামল শুনে অবাক হয়ে যায়।

শ্যামল বারান্দায় বসে যতদূর চোখ যায় শুধু তাকিয়ে থাকে। দূরে ওপারে ঘন আম-কাঁটাল-দেবদারু গাছের বন দেখা যায়। মাঝে মাঝে বাঁশের ঝাড়। সুপারি, তাল, আর খেজুর গাছ। তারই ফাঁকে দু' চারটে মেটে ঘরের চাল দেখা যায়।

শ্যামল বলে—এটা কি গাঁ কানুদা?

—ঐ যে ঘরগুলো একটু একটু দেখা যায়, ও গাঁয়ের নাম পলাশদিয়া—তার পাশেই রামপুর, তারপর গোঁসাইহাট, কানাই এমনি একটার পর একটা নাম করে যায়।

শীতের চক্‌চকে রোদ নদীর জলের ওপর পড়েছে। ঝিরঝিরে বাতাসে নদীর জল কেঁপে কেঁপে বয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে দু একখানা জেলের নৌকা মাছ ধরে ফিরছে। শ্যামলের ভারী ভাল লাগে এ সব দেখতে। বলে—কানুদা, ভারী সুন্দর এ নদীটা।

কানাই এ কথা শুনে শুধু হাসে।

জ্যাঠামশাই সব সময় কেবল সবাইকে সাবধান করেন—দেখ, শ্যামলের যেন কোন অনিয়ম না হয়। সহরে থেকে অভ্যাস—এখানে অনিয়ম হলেই অসুখ হবে। শ্যামল নদীতে স্নান করতে চায় সবার সাথে। সবার তাতে ঘোর আপত্তি। জ্যাঠামশাই বলেন—চাকর জল এনে দিক, তুমি বাড়ীতেই স্নান কর। শ্যামল জেদ ধরে—নদীতেই স্নান করবে কানুদাদের সাথে। কিন্তু সাঁতারও জানে না, ভাল করে ডুব দিতেও পারে না। শ্যামলের খাবার জল ফুটিয়ে রাখা হয়েছে আলাদা করে। শ্যামল ভাবে, এ সব বাড়াবাড়ি—আর সবার যা সয় আমারই বা তা সইবে না কেন? কানাই তো রাগ করেই বলে—পিসিমা, ওকে আঁচলের কোনে বেঁধে রেখে দাও—আলো বাতাস লাগবে না, বেশ ভাল থাকবে। পিসিমাও চড়াসুরে বলেন—তোর মত তো গোঁয়ার গোবিন্দ না রে। তিন তিন বারেও একটা পরীক্ষায় পাশ দিতে পারলি না। তোর যা সয়, ওর কি তাই সইবে।

—বেশ, আমি গোঁয়ার আমিই আছি, তোমাদের তাতে কি? বলে রাগ করে কানাই চলে যায়।

দুপুরে গাঁয়ের এ-বাড়ী ও-বাড়ীর পিসিমা, মাসিমা, কাকীমা ও আর সবাই আসেন রায়বাড়ীর মেজ বৌয়ের ছেলে শ্যামলকে দেখতে। শ্যামলের ভারী লজ্জা করে এদের সামনে আসতে।

সন্ধ্যাবেলা শ্যামলদের বাইরের ঘরে বসে গাঁয়ের বুড়োদের বৈঠক। ঢালা ফরাসটায় সবাই এসে এক এক ক'রে জমা হয়। তারপর চা, পান আর তামাক চলতে থাকে রাত দশটা অবধি। এ নিয়ম অনেকদিন থেকে চলে আসছে। এখানেও শ্যামলের ডাক পড়ে। এদের অনেক কথারই উত্তর তাকে দিতে হয়।

বিকেলের দিকে কানুদার সাথে বেড়াতে বের হয় শ্যামল। বলে—আজ চল কানুদা, মাঠের দিকে যাই। চারিদিকে কেবল মাঠ আর ওপরে খোলা আকাশ—আমার বেশ ভাল লাগে তার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকতে। কানাই বলে—তা হলে চল, অদ্দূর না ঘুরে চৌধুরীবাড়ির খিড়কির পেছন দিয়ে গিয়ে মাঠে উঠি। দুজনে চলতে থাকে।

বেত আর বাবলার ঝোপে ঢাকা সরু পায়ে চলার পথ, দিনের বেলাই অন্ধকার। কানাই বেতের কাঁটা সরিয়ে পথ করে আগে আগে চলতে থাকে, শ্যামল চলে পেছনে পেছনে। কিছুদূর আসতেই মস্ত বড় একটা দীঘি। দীঘির জল আর দেখা যায় না—এত কচুরিপানা, সেওলা আর আগাছায় ভরা। দীঘির উঁচু পাড়গুলা ভেঙে সমান হয়ে গেছে মাটির সাথে। পাড় দিয়ে আসতে একটা ধারে দেখে—একটি তের চোদ্দ বছরের মেয়ে দুটো থালা বাটি ধুচ্ছে দীঘির ঘাটে। তারই পাশ দিয়ে শ্যামলদের পথ। শ্যামল অবাক হ'য়ে যায় মেয়েটিকে দেখে। পাড়াগাঁয়ে কারও এমন গায়ের রং থাকতে পারে—লাল টক্‌টকে! আর কি সুন্দর মুখশ্রী! পরণে আধ-ময়লা তাঁতের কাল রংয়ের সাড়ি, কোমরে তার জড়ানো আঁচল। শ্যামল একটু পেছন ফিরে চেয়ে দেখে মেয়েটিকে। মেয়েটিও

হাতের কাজ ভুলে বিস্মিত বড় বড় চোখ দুটা তুলে শ্যামলের দিকে চায়। শ্যামল ভাবে, গাঁয়ে সে নতুন তাই ছেলে বুড়া সবাই তো তার দিকে এমনি করে চেয়ে থাকে। তারা তখন মাঠের ধারে এসে পড়েছে।

শ্যামল বলে—কানুদা, ও মেয়েটি কাদের? ঐ যে দীঘির ঘাটে বাসন মাজছিল।

—কে রে ঐ উষী, ও তো চৌধুরীদের মেয়ে।

—ওর নাম বুঝি উষী?

—নাম তো ওর অতসী, সবাই উষী বলেই ডাকে। ভারী ভাল মেয়ে, বাড়ীর সব কাজ ঐ অতটুকুন মেয়েই তো করে।

—পাড়াগাঁয়েও অমন গায়ের রং আর চেহারা থাকতে পারে কানুদা, আমি কিন্তু তা ভাবি নি কোন দিন।

—ও আর কি রে, ওর দিদি লতিকে যদি দেখতে—তবে বলতে হ্যাঁ, সুন্দরী বটে! যেমন রং তেমনি মাথার চুল! উষীর চেয়ে দেখতে অনেক সুন্দরী সে।

—তার বুঝি বিয়ে হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ, আর বচ্ছর শ্রাবণ মাসে। ওরা খুব গরীব কিনা, তাই দোজ-বরে দিয়েছে বিয়ে। তা জামাইটি মন্দ হয় নি, বয়সও এমন বেশী নয়। আগপক্ষের একটি মাত্র দু-বছরের ছেলে আছে। জামাই মাষ্টারি করে, সংসারে আর কেউ নেই।

—আচ্ছা, তোমাদের ঐ কি বলে, উষীর বাবা কি করেন?

—কি আর করবেন। আগে কি একটা বিশ পঁচিশ টাকার চাকুরী করতেন বিদেশে, তা ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে এসে বছর কয়েক হল বাড়ীতেই আছেন। সামান্য জোত জমি আছে তাই দেখাশুনা করেন। আর গাঁয়ের পোষ্ট-মাষ্টারী করেন তাতে পান মাসে বার টাকা। তা দীনুখুড়ো লোক খুব ভাল। এমন সরল তা আলাপ করলে বুঝতে পারবি। এখন এই উষীর বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়েছেন।

—অতটুকুন মেয়ের বিয়ে! বল কি কানুদা!

—আরে খুঁজতে খুঁজতেই তো বছর দু-তিন যাবে। টাকা তো আর দিতে পারবেন না। মেয়ে দেখে যে দয়া করে নেবে।

—তা এত সুন্দরী মেয়ে, ওর জন্য ভাবনা কি?

—না রে ভাই—সুন্দরী হলে হয় না, টাকা চাই।

কানাই বিজ্ঞের মত কথাকটি বলে মাথা নাড়তে থাকে।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে আসে। সবুজ শ্যামল মটর কলাই আর শর্ষের ক্ষেত আবছা হয়ে আসে—চাষীদের শীতের সন্ধ্যার খড়-পোড়ানো ধুয়োয়। বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ নীরব আঁধার হ'য়ে পড়ে। কানাই বলে—চল শ্যামল, এবার ফিরি। শ্যামলের এ সন্ধ্যা নীরবতার মধ্যেও উষীর মুখখানা বার বার মনে পড়তে থাকে। আহা, ভারী মিষ্টি মুখখানা তার! কেমন সরল সুন্দর চোখদুটি! উষীদের বাড়ীর ধার দিয়ে ফিরতে রান্নাঘরে দেখে একটি মাটির প্রদীপ জ্বলছে টিপ্‌টিপ্‌ করে, আর সারা বাড়ীটা অন্ধকার।

সন্ধ্যাবেলা বাড়ীতে পিসিমা শ্যামলকে নিয়ে কত পুরাণ গল্প করে—সেই তাদের ছেলেবেলাকার কথা। সেই কবে তার বাবা জগদীশ তখন স্কুলে পড়ে—একদিন দুপুরবেলা ঐ দক্ষিণদিকের পিটুলি আমগাছ থেকে পড়ে গিয়েছিল। পড়েছিল ছায়ের গাদায় তাই রক্ষে। তা না হলে সেদিন একটা কি যে কাণ্ড হত! ভারী দুষ্টু ছিল সে। একবার বর্ষাকালে ভরা নদীতে জগদীশ গিয়েছিল সাঁতার দিতে। তারপর মাঝ নদীতে গিয়ে আর আসতে পারে না। হাত পা অবশ হয়ে যায় আর কি! এমন সময় ভাগ্যি ও বাড়ীর নটুদা নৌকা করে আসছিল। সেই তুলে নেয় ওকে নৌকায়। তা না হ'লে সেদিন যে কি হত—ভাবলে এখনও গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। পিসিমা এমনি ধরণের কত কথাই যে বলে যান।

আবার পরদিন বিকেলে কানুদা বলে—চল, নদীর দিকে যাওয়া যাক আজ। শ্যামল রাজি হয় না, বলে—মাঠের দিকই আমার বেশ লাগে। এমন খোলা এত বড় মাঠ আর দেখি নি কানুদা।

—তবে চল্, ঐদিকেই যাই।

আবার সেই বেত বাবলার ঝোড় ঠেলে চৌধুরীদের দীঘির পাড় দিয়ে মাঠের দিকে চলল তারা। আজ আর উষীকে দেখা গেল না ঘাটের পাড়ে।

শ্যামল এদিক ওদিক তাকিয়ে কানুদার পেছনে পেছনে

চলল। মনটা তার দমে গেছে—আর বেড়ান'র উৎসাহটাও কমে গেছে অনেকখানি। মাঠের নীরব সৌন্দর্য্য আর তার কাছে ভাল লাগছে না। কানুদাকে উষীর কথা কিছু জিজ্ঞেস করতে লজ্জাও করছে খুব। যদি বুঝতে পারে তার আগ্রহটা। অন্য কিছু যদি মনে করে। মাঠের আল ধরে একটু দূর এগিয়েই শ্যামল বলে—চল কানুদা, না হয় আজ নদীর দিকেই যাই।

—ঐ না বললি, মাঠই তোর ভাল লাগে খুব।

—তা লাগে বৈকি, তা চল না আজ নদীর দিকেই যাওয়া যাক।

—তা হলে চল।

দুজনে চলতে থাকে। কানু বলে—চল, এবার ঝোপের মধ্যে দিয়ে না গিয়ে বাড়ীর ওপর দিয়ে যাই। চৌধুরীদের বাড়ী পেরিয়ে ভট্‌চাজ বাড়ীর পাশ দিয়ে গিয়ে নদীর ধারে উঠব।

চৌধুরী বাড়ীর কাছে আসতেই ভেতর থেকে কে যেন বললে—কে রে, কানু নাকি? এর মধ্যেই ফিরছিস যে।

—এই যে ন' কাকীমা, শ্যামলের খেয়াল আজ আবার নদীর দিকে যাবে। সহুরে ছেলে কিনা, নদী মাঠ দুইই ভাল লাগে ওর।

একটি মহিলা বাড়ীর ভেতর থেকে সদর দরজার কাছে এগিয়ে এলেন। আধ ময়লা সাড়ি পরণে—শান্ত স্নিগ্ধ মুখশ্রী।

শ্যামলের মার কথা মনে পড়ে। উনি বলেন—আয় না শ্যামলকে নিয়ে বাড়ীর ভেতর। ওকে সেই মার কোলে কতটুকুন দেখেছি। কদিন যেতেই পারি নি তোদের ওদিকে।

শ্যামলকে নিয়ে কানু এসে উঠানের মাঝে দাঁড়ায়। শ্যামল ন'কাকীমাকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলা মাথায় নেয়। ন'কাকীমা শ্যামলের মাথায় হাত রেখে বলেন—বেঁচে থাক বাবা দীর্ঘজীবী হ'য়ে, দেশের মুখোজ্জ্বল কর। উষি—ও উষি, একটা মাদুর পেতে দে না তোর দাদাদের বসতে—বলতে বলতে ন'কাকীমা নিজেই যান ঘরের ভেতর মাদুর আনতে। উষী এসে মেটে ঘরের মেঝেতে একটা মাদুর পেতে দিয়ে যায়। তারপর ন' কাকীমা কত কথাই বলে যান। নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা, শ্যামলের মার কথা—তার সাথে কত আলাপই ছিল সেই বৌ-কালে। আজ হয়ত তার মনে নেই কিছুই। ভারী দেখতে ইচ্ছে করে তাকে—কেমন হয়েছে এখন। একবার এলে বেশ দেখা-শুনা হোত। গীতাকে তো দেখেনই নাই। দেখতে কেমন হয়েছে সে? মার মত মুখ আর রং পেয়েছে না কি? কত বড় হয়েছে এখন? এমনি কত কথাই বলতে থাকেন তিনি। শ্যামলও দু-চারটে কথার উত্তর দেয়। উষী দরজার কাছে বসে সব শুনছে। দেখতে দেখতে রাত হ'য়ে গেল। ন' কাকীমা ঘরের তৈরী খাবার দিয়ে তাদের মিষ্টিমুখ করিয়ে বলেন—তা ও এসেছিলে বলে তোমার গরীব কাকীমার সাথে দেখাটা হল। যাওয়ার আগে আর একদিন এস।

সেদিন সন্ধ্যে হতেই কানাই তোড়জোড় সুরু করেছে। ঘোষবাড়ীতে ভাসান যাত্রা, শীঘ্র খাওয়া-দাওয়া সেরে যেতে হবে। দু-কাঠির নরহরি চক্কত্তির দল ও অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। শ্যামল বলে সেও যাবে। পিসিমা তো হেসেই খুন, বলেন—তুই যেয়ে কি করবি। ওকি তোর ভাল লাগবে। ক'লকাতায় কত ভাল থিয়েটার যাত্রা দেখেছিস। জ্যাঠামশাই বলেন—এ ঐ কেনেটার কাজ। ওকে মিছিমিছি রাত জাগিয়ে অসুখ করাবে, তবে ছাড়বে। না, শ্যামলের গিয়ে কাজ নেই ওখানে। কিন্তু শ্যামল জেদ ধরেছে সে যাবেই। শেষে ঠিক হয়—কিছুটা দেখে কানাই শ্যামলকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে যাবে।

দুজনে বের হয় ঘোষ-বাড়ীর উদ্দেশে—যাত্রা দেখতে। উঠানে সামিয়ানা খাটান' হয়েছে। দুটা গ্যাস লাইট জ্বলছে দুধারে। ঘরের বারান্দায় গাঁয়ের মেয়েদের জায়গা করা হয়েছে? একধারে দুখানা বেঞ্চ পেতে দিল শ্যামলদের বসবার জন্য—ঘোষদের ছোট ছেলে পঞ্চু। সবাই শ্যামলকে দেখে কানাকানি সুরু করে দিল—রায়দের মেজ কর্ত্তার ছেলে, ক'লকাতা থেকে এসেছে, ভারী বিদ্বান, কেমন ছবির মত চেহারা। এদের দুএকটা কথা শ্যামলের কাণে আসছিল। শ্যামল এদের দৃষ্টির আড়ালে একদিকে জড়সড় হয়ে বসেছে। ওদিকের বারান্দায় শ্যামল চাইতেই দেখে—ও কে, উষী না? ঠিক উষীই তো। থামে হেলান দিয়ে বসেছে ভাই বোনদের নিয়ে। আর তারই দিকে

যেন চেয়ে আছে। শ্যামল তাকাতেই চোখ ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে। আবার একবার শ্যামল দেখে—উষী ওরই সমবয়সী কোন বাড়ীর একটি মেয়েকে তারই দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে কি যেন বলছে। শ্যামল আরও কবার উষীর দিকে চেয়ে দেখল—উষী তারই দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে। যাত্রা হচ্ছে শ্যামলের আর সেদিকে খেয়ালই নেই। কানুরা কিন্তু মহানন্দে যাত্রা শুনছে আর হাসছে। শ্যামলের মন চলে গেছে অন্য রাজ্যে। উষী ওকে এত কি দেখছে? কেন অমন করে চেয়ে আছে শ্যামল ভেবেই পায় না? শ্যামলেরও যেন কেমন বেশ ভাল লাগে ওকে দেখতে। শেষ রাত্রে যাত্রা ভাঙ্গল। শ্যামলের খেয়াল হোল তখন, আহা! আরও কিছুক্ষণ যদি হত যাত্রাটা। উষীর কথা ভাবতে ভাবতেই শ্যামল বাড়ী ফিরে আসে। সে রাতে আর শ্যামলের ঘুম হয় না।

সেদিন শ্যামল কানুকে ধরল, আজ সাঁতার শিখবেই। কানু তো সব সময়ই প্রস্তুত। দুজন নদীর ঘাটে এসে দাঁড়াতেই দেখল, উষী নদীর ঘাটে তার ছোট ছোট ভাই বোনদের স্নান করিয়ে দিচ্ছে। নিজেও স্নান করবে বলে এসেছে। কানু উষীকে দেখেই জিজ্ঞেস করল—কি রে উষী, বীরুর কোন খবর এল? বীরু উষীর দাদা। একবছর হল ম্যাট্রিক পাস করে বেকার বসে আছে। আজ দশ বার দিন হল তার বোন সতীর শ্বশুরবাড়ী গিয়েছে। গিয়ে কোন চিঠিপত্র বা খবর দেয় নি। উষী বলে—কই কানুদা, আজ সকালের উজান ষ্টীমারেও তো দাদা এল না—চিঠিও দেয় নি কোন। মা তো ভেবে অস্থির।

উষীকে দেখেই শ্যামলের সাঁতার শেখার উৎসাহ দপ্ করে নিবে গেছে। কানু বলে—কি রে শ্যামল, কোমর জলে দাঁড়িয়েই কি সাঁতার শিখবি? এগিয়ে আয় না। শ্যামল কোনমতে বলে—না কানুদা, আজ থাক কাল শিখব। উষীর চোখ মুখে হাসির ঝলক। কানু বলে—তোর যত সব লজ্জা—লজ্জা করলে কি সাঁতার শেখা যায়। সে দিন কোমর জলেই কোনমতে ডুব দিয়ে শ্যামল বাড়ী ফিরল।

দেখতে দেখতে কি করে যে এগারটা দিন কেটে গেল শ্যামল তা বুঝতেই পারে না। সিমলা থেকে শ্যামলের বাবা চিঠি লিখেছেন—কলেজ খুললে একদিনও দেরী কর না। তবুও শ্যামল বলে—আর কটা দিন থেকে যাই পিসিমা। পিসিমার চোখ ছল্ ছল্ করে ওঠে, বলেন—আহা! বাড়ীর ছেলে বাড়ীতে থাকবি তার আবার কি? কিন্তু জ্যাঠামশাই কিছুতেই রাজী হন না, বলেন—জগদীশ রাগ করবে। ওকে তো জান' চিরটা কাল—কেমন একগুঁয়ে। ওর কথা না শুনলে আর কোনদিন হয়ত শ্যামলকে আসতেই দেবে না গাঁয়ের বাড়ীতে। কথাটা খুবই সত্য। তাই ঠিক হয় কাল বিকেলের ষ্টীমারে শ্যামল যাবে।

সেদিন সকালবেলা কানাই বলে—চল শ্যামল, ঘটক ঠাকুর্দ্দার সাথে একবার দেখা করে আসি। শুনলাম আজ কদিন ধরে জ্বরে বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন। গাঁয়ের মানুষ তোরও তো একবার দেখা করা উচিত।

—ঘটক ঠাকুর্দ্দা আবার কে কানুদা?

—শিবদাস ভট্‌চাজের নাম শুনেছিস? তারই ছেলে হরিদাস ভট্‌চাজ। এদের তিন পুরুষ থেকে ঘটকালি করে আসছে। ঘটক ঠাকুর্দ্দার বাবার তো শুনেছি কত রাজা, মহারাজা, জমিদারদের ঘর থেকে ডাক আস্‌ত—আর ওর ঘটকালি করবার ক্ষমতাও ছিল খুব। ওর বাবা নাকি সবশুদ্ধ দশ হাজার একটা বিয়ের ঘটকালি করে মারা যান। সেকালে শিবদাস ভট্‌চাজকে চিনত না—এমন লোক এ অঞ্চলে খুব কমই ছিল।

—তারই ছেলে বুঝি তোমাদের এই ঘটক ঠাকুর্দ্দা?

—হ্যাঁ রে, তারই একমাত্র বংশধর।

—ইনি আজ পর্য্যন্ত কটা বিয়ের ঘটকালি করেছেন?

—জানিস না বুঝি, ঘটকালিতে ওদের অত নাম—কিন্তু তবু হরিদাস ভট্‌চায্যি ঘটকালি করে নি জীবনে। কেন জানিস্? শুনেছি সে এক ভারী দুঃখের কথা। শিবদাস ঘটক তখন বেঁচে ছিল। ছেলের বিয়ে ঠিক করল বেশ অবস্থাপন্ন লোকের ঘরে, খুবই সুন্দরী একটি মেয়ের সাথে। শিবদাসের অবস্থাও তখন গাঁয়ের মধ্যে ছিল সবচেয়ে ভাল, আর ছেলেও এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়ত। গাঁ শুদ্ধ বরযাত্রী নিয়ে ছেলের বিয়ে দিতে গিয়ে শিবদাস শোনে যে সেদিন সকালবেলাই বিয়ের কনে হঠাৎ কুয়ার পাড়ে পা পিছলে পড়ে যেয়ে মাথায় যে আঘাত পেয়েছে তাতেই অজ্ঞান হয়ে আছে। বিয়ে বাড়ীতে তখন কান্নাকাটি

পড়ে গেছে। মেয়ের জ্ঞান আর হল না। বিয়ের রাতেই মেয়ে গেল মারা। বরযাত্রীরা বর নিয়ে আবার ফিরে এল। সেই থেকে ঘটক ঠাকুর্দ্দা প্রতিজ্ঞা করেছেন যে বিয়েও করবেন না, আর ঘটকালিতেও নেই।

কানু শ্যামলকে নিয়ে ঘটক ঠাকুর্দ্দার বাড়ীতে আসে। জীর্ণ একতালা বাড়ী। সংস্কার অভাবে বাইরের দিকটা নোনা ধরেছে, ফাটলে জায়গায় জায়গায় পাকুড় গাছ আর আগাছা গজিয়ে উঠেছে। বাড়ীর ভেতরে উইয়ের ঢিপি, মাকড়সার জাল, ঝুল আর কালীতে ভরা। একা মানুষ কোন দিকই বা দেখেন। তায় কদিন আবার অসুখে পড়ে আছেন! দুজনে ঘরের ভেতর গিয়ে দেখে—জীর্ণ তক্তপোষের ওপর মলিন বিছানা। তাতে বসে ঘটক ঠাকুর্দ্দা তামাক টানছেন চোখ বুজে। মুখখানা শুক্‌নো, মাথায় সামান্য কগাছা রুক্ষ চুল, চোখের পাতা দুটো অস্বাভাবিক ফোলা। হাত পাগুলো সরু, কিন্তু পেটটা উঁচু। কানুদের দেখে বলেন—কি রে কানু, আজ কদিন অসুখে পড়ে আছি খোঁজও নিস না একবার বুড়ো ঠাকুর্দ্দার।

—ঠাকুর্দ্দা, কিছু মনে কর না, শ্যামল এসেছে, ওকে নিয়ে ভারী ব্যস্ত ছিলাম এ'কদিন।

শ্যামল ঠাকুর্দ্দাকে একটা প্রণাম করে। ঠাকুর্দ্দা আশীর্ব্বাদ করে বলেন—জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল কর। জগদীশের ছেলে তুই, তোর সব খবরই তো এ বুড়ো ঠাকুর্দ্দা রাখে। জগদীশ ছিল আমার খেলার সাথী। ভারী ভাব ছিল ওর সাথে। বিদেশেই কাটাল' জীবনটা, দেশে আর এলই না। তা তুই এসেছিস দেশ দেখতে, কেমন না? কেমন লাগছে তোর পাড়া গাঁ? ঘটক ঠাকুর্দ্দা কথা বলতে থাকেন। ভারী ভাল লাগে শ্যামলের শুনতে তার কথা-গুলো। দেশ বিদেশের অনেক খবরই ঠাকুর্দ্দা রাখেন। সারাটা জীবন তো দেশ বিদেশেই ঘুরে কাটল'। এই সরল লোকটির সাথে জানা বিষয়ে তর্ক করতে শ্যামলের লজ্জা করে না একটুও। ঠাকুর্দ্দাও মুখ খুলেছেন। এক এক করে সমাজের অনেক প্রশ্নই তর্কের মধ্যে উঠতে থাকে। কথায় কথায় আজকালকার মেয়েদের কথা উঠল। ঠাকুর্দ্দা বলেন—পাড়াগাঁয়ের মেয়েও অনেক সুন্দরী ও বিদুষী আছে। তবে ভাই, কলেজে পড়া মেয়েদের মত মেয়ে এখানে পাবে না।

শ্যামল বলে—হ্যাঁ, ঠাকুর্দ্দা ঐ সেদিন দীঘির ঘাটে বেশ সুন্দরী একটি মেয়ে, দেখলাম। পাড়াগাঁয়ে অমন মেয়ে থাকতে পারে তা কোন দিন ভাবি নি।

ঠাকুর্দ্দা কানুকে জিজ্ঞেসা করেন—কে রে কানু?

কানাই বলে—শ্যামল ঐ উষীর কথা বলছে।

—ও উষী, তা ভাই অমন লক্ষ্মী মেয়ে আর পাবি নে। যেমন রূপ তেমনি গুণ, তবে লেখাপড়াটা পাড়াগাঁয়ে আর অত কি ক'রে শিখবে।

শ্যামল বলে ফেলে—কই ঠাকুর্দ্দা, ভাল করে তার চেহারাটা তো দেখি নি, দুএকদিন দেখেছি তাও দূর থেকে।

—দেখিস নি? আচ্ছা দাঁড়া।

বাইরে তিন চারটি ছোট ছোট ছেলে খেলা করছিল; ঠাকুর্দ্দা তাদের একজনকে ডেকে বলেন—যা তো রে টেপু, উষীদিদিকে গিয়ে বল যে ঠাকুর্দ্দা ডাকছে শীগ্‌গির এস। ঠাকুর্দ্দা যেন আপন মনেই বলতে থাকেন—উষীদিদি আমার এত রূপ আর এত গুণ যে রাজার ঘরে পড়লেও মানিয়ে যায়—কিন্তু বড় গরীব ওরা।

পেছন দরজা দিয়ে উষী এসে ঘরে ঢুকেই শ্যামলদের দেখে একটু লজ্জা পায়, বলে—ঠাকুর্দ্দা আমায় ডেকেছ?

—আয় না দিদি এগিয়ে, এদের দেখে লজ্জা কি তোর। উষী ঠাকুর্দ্দার কাছে যায়। ঠাকুর্দ্দা শ্যামলকে দেখিয়ে বলেন—ও কে চিনিস? শ্যামল ততক্ষণ উঠে দাঁড়িয়েছে। উষী অল্প একটু হেসে মাথা নাড়ে।

ঠাকুর্দ্দা বলেন—ওকে প্রণাম করিস নি বুঝি? যা লক্ষ্মী দিদি আমার, ওকে প্রণাম কর।

উষী কি বুঝল সেই জানে। ধীরে এগিয়ে গিয়ে ঝুপ্ করে একটা প্রণাম করে। শ্যামল লজ্জায় বলে—থাক্ থাক্। উষী উঠে দাঁড়াতেই ঠাকুর্দ্দা হাসতে হাসতে বলে ফেলেন—বাঃ কী সুন্দর মানিয়েছে তোদের! যেন শিব-পার্ব্বতা। উষীর মুখ জবাফুলের মত টক্‌টকে লাল হয়ে ওঠে একথা শুনে। এক ছুটে বেরিয়ে যায় পেছন দরজা দিয়ে। শ্যামল বলে—ঠাকুর্দ্দা, এটা কি করলে? ও হয় তো—কি না জানি মনে করছে?

ঠাকুর্দ্দা বলেন—উষী দিদিকে আমার বিয়ে করবি ভাই? আচ্ছা, আমিই লিখব জগদীশকে সব কথা গুছিয়ে। আমার কথা সে ফেলতে পারবে না।

ঠাকুর্দ্দার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শ্যামলরা বাসায় ফিরে আসে। বাসায় এসেই কানু চেঁচিয়ে পিসিমাকে ডেকে বলে—ও পিসিমা, ঘটক ঠাকুর্দ্দা তো শ্যামলের বিয়ে ঠিক করে ফেলল ওবাড়ীর উষীর সাথে। পিসিমা তো হেসেই অস্থির, বলেন—কানুটার কথার ছিরি দেখ! বিয়ে ঠিক কিনা উষীর সাথে! শ্যামলের পাশ করা বৌ ঘরে আসবে। ও যেমন বিদ্বান, তেমন বৌ না হলে কি বিয়ে! আর তা না—কোথাকার এক পাড়াগেঁয়ে গরীবের মেয়ে। হরিদাস ঘটকেরও আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই! বুড়ো বয়েসে ভীমরতি ধরেছে। বংশের ধারা যাবে কোথায়!

শ্যামল বলে—কেন পিসিমা, মেয়েটি তো বেশ!

বৌদিদি সকলকে শুনিয়ে বলেন—ওঃ ঠাকুরপো, তোমারই বুঝি মনে ধরেছে! উষীর ভাগ্য ভাল। তাই তো বলি, এত সাত তাড়াতাড়ি ঘটকের কাছে যাওয়া কেন?

শ্যামল লজ্জায় এর কোন উত্তর দিতে পারে না। সারাদিন বাড়ীতে এই কথারই আলোচনা চলল। শেষ পর্য্যন্ত জ্যাঠামশাই শুনলেন এ কথা। কোন কিছু বললেন না তিনি।

আজ শ্যামল কলকাতা যাবে। নদীর ঘাটে সবাই এসেছে নৌকায় উঠিয়ে দিতে। পিসিমার চোখে জল। বৌদি, জ্যেঠিমা, কাকীমা ও বোনদের চোখ ছল্ ছল্ করছে। পিসিমা বলেন—আবার আসিস পূজার ছুটিতে। শ্যামলেরও মনটা ভাল লাগছে না। কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে সবার ওপর! আর উষীর কথা মনে পড়লেই প্রাণটা যেন কেমন করে ওঠে। ঘাটে উষীর মাও এসেছেন, কিন্তু উষী নেই। যাবার বেলা একবার দেখতে পেলে বেশ হত! কানু নৌকা ছেড়ে দিল। যতদূর দেখা যায় শ্যামল দেখতে লাগল' গ্রামখানাকে। নদীর পাড়ে গাছ-পালায় ঘেরা ছোট্ট একখানা গাঁ। ঘাটে তখনও সবাই দাঁড়িয়ে আছে।

ষ্টীমার ঘাটের কাছে নৌকা আসতেই শ্যামল কানুদাকে চুপি চুপি বলে—তুমি ভাই বাড়ীতে কাউকে বল না, আমি উষীকেই বিয়ে করব। বি, এ পাশ করে যে ভাবেই হোক মার কাছ থেকে মত নেব। মা অমত করবেন না। কানাই কি বুঝল' সেই জানে। কোন কথা না বলে শ্যামলের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল। শ্যামল বললে—চিঠি দিও ভাই, সবার খবর দিয়ে।

তারপর আবার সেই ক'লকাতা। শ্যামল এসে হোষ্টেল, কলেজ, আর পড়াশুনা নিয়ে পড়ল। কিন্তু কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে সব। উষীর মুখখানা সব সময়ই মনে পড়ে। কেন অমন করে সে চাইত তার পানে! কি দেখত চেয়ে চেয়ে—শ্যামল তা বুঝে উঠতেই পারে না! মনটা তার যেন গাঁয়ের আশে-পাশেই ঘুরছে। এমনি করে একটার পর একটা দিন যায়। মধ্যে কানুর দুখানা চিঠি পেয়েছে সে। উত্তরও দিয়েছে। কিন্তু কিছুদিন হল পড়াশুনার চাপে কানুদার চিঠির আর উত্তর দেওয়া হয় নি। কিন্তু উষীর কথা মনে পড়ে তার খুবই সব সময়।

দুটা বছর কেটে গেছে। শ্যামল আর কানুর কোন খোঁজখবর পায় না। আর এ'কটা মাস তার যে কি করে কেটেছে তা কেবল সেই জানে। দুনিয়ার কোনও খবরই সে রাখবার অবসর পায় নি পরীক্ষার চাপে। কেবল বই, আর পড়াশুনা। বি, এ পরীক্ষার ফল বের হল। ইক'নমিক্সে শ্যামল প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে পাশ করেছে। জগদীশবাবুর আনন্দ আর ধরে না। ছেলের চাইতে তিনিই যেন খুসী হয়েছেন বেশী। ছেলেকে কাছে ডেকে তিনি বলেন—শ্যামল, এবার আই, সি, এস, এর জন্য প্রস্তুত হও। এটা আমার অনেক দিনের ইচ্ছা। তুমি আই, সি, এস, এ সফল হলে সে ইচ্ছা আমার পূর্ণ হবে।

পিতৃ-আজ্ঞা। শ্যামল ক'লকাতা এসে ইক'নমিক্সে এম, এ ক্লাসে ভর্ত্তি হয়ে বাড়ীতে আই, সি, এস, এর জন্য প্রস্তুত হতে লাগল'। আসছে বছর আই, সি, এস দেবে। এবারও তাকে দুনিয়ার সব কথা ভুলে গিয়ে বইয়ের মধ্যে ডুব দিতে হল। বি, এ পরীক্ষার পর ভেবেছিল যা হোক এবার কিছুদিন ছুটি। তখন উষীর মুখখানাও উঁকি ঝুঁকি মারছিল তার মনের কোনে। কিন্তু সে সব মনের মধ্যেই চেপে তাকে আবার বইয়ের মধ্যেই আপনাকে মিশিয়ে দিতে হল।

শ্যামলের আই, সি, এস পরীক্ষা হয়ে গেল। ফলও বের হোল তার কিছুদিন বাদে। শ্যামল প্রতিযোগিতায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নির্ব্বাচিত হয়েছে। এবার বিলেতে যেতে হবে কিছুদিনের জন্য। জগদীশবাবু শ্যামলের সাফল্যের খবর পেয়ে সত্য সত্য এবার এত আনন্দিত হয়েছেন যে জীবনে এর চেয়ে বেশী আনন্দ তিনি কোনদিন আশা করেন নি।

শ্যামল তার বাবাকে বললে—আর তো কটা দিন বাদেই দেশ ছেড়ে যেতে হবে। এবার একবার দেশের বাড়ীতে গিয়ে সবার সাথে দেখা করে আসি। শ্যামলের বাবা সানন্দে সম্মতি দিলেন। ছেলেকে অদেয় এখন তাঁর কিছুই নেই। সে যা চাইবে এখন তাই দিতে পারেন তাকে। তাই শ্যামল আবার প্রায় চার বছর পরে তাদের কুসুমপুর গাঁয়ের বাড়ীতে চলল। আজ তারও প্রাণে আনন্দ—আবার উষীকে দেখবে। এবার তাকে জীবনের সাথী করে পেতে চাইলেও তার বাবা অমত করবেন না হয়ত। উষীর সরল সুন্দর মুখখানা বারবার শ্যামলের মনে পড়তে লাগল। এতদিন তো পৃথিবীর কোন জিনিষই ভাববার তার অবসর ছিল না।

আবার শ্যামল গাঁয়ের বাড়ীতে এসেছে। বাড়ীতে আর সবাই আছে কিন্তু তবুও তার কাছে সব খালি খালি লাগে—এক কানুদার জন্য। কানুদা আজ বছর দুই হল এক কাপড়ের মিলে কাজ শিখতে চলে গেছে। পূজার সময় কদিনের জন্য কেবল বাড়ী আসে। মাইনে বলতে পায় মোটে কুড়ি টাকা। কিন্তু জ্বরে ভুগে ভুগে অমন সবল চেহারা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে। পিসিমা কানুর কথা বলে কত দুঃখ করতে লাগলেন।

বিকেলের দিকে শ্যামল নদীর ধারে কিছুদূর হেঁটে বাড়ীতে ফিরে এল। গাঁয়ের সে সৌন্দর্য্য, সে সবুজ শোভা—আজ আর তার চোখে পড়ে না। উষীর কথা থেকে থেকে মনে হয়। কিন্তু কানুদা নেই—কাকেই বা জিজ্ঞেস করে তাদের কথা। একা একা কোথায়ই বা যাবে সে? তাই ফিরে আসতে হল সন্ধ্যে হবার আগেই।

চারিদিকে বেশ ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না উঠেছে। পিসিমা মাদুর পেতে সবাইকে নিয়ে বসেছেন বারান্দায়। তিনি ঘর সংসারের কথা বলছেন, গাঁয়ের কথা বলছেন, আরও কত কি? শ্যামল বলে—পিসিমা ঘটক ঠাকুর্দ্দা এখানে আছেন তো এখন?

—ও মা তুই শুনিস নি বুঝি! আর বচ্ছর আষাঢ় মাসে দু তিন দিন জ্বরে ভুগেই তিনি মারা গেছেন। আহা, এমন কি-ই বা বয়েস হয়েছিল! একেবারে বিনে চিকিৎসায় মারা গেলেন। অসুখে কে বা দিত পথ্য, আর কে বা করত শুশ্রূষা। এতখানি বয়েস পর্য্যন্ত একটা বিয়েও করল না।

শ্যামলের খুবই দুঃখ হল ঘটক ঠাকুর্দ্দার জন্য। বেশ লোকটি ছিল। মনটা তার ছিল উঁচু। গাঁয়ের সবার জন্যই ভাবনা ছিল তার।

উষীদের কথা শুনতে শ্যামলের ভারী ইচ্ছে হয়, কিন্তু কিছুতেই সে কথা মুখ ফুটে বলতে পারে না। শেষে আম্‌তা আম্‌তা ক'রে কোন মতে জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা পিসিমা, ঐ সেই চৌধুরীদের বাড়ীর সবাই ভাল আছে তো?

—ও বাড়ীর উষী তো এসেছে আজ কদিন হল শ্বশুরবাড়ী থেকে। তুই বুঝি ওর বিয়ের কথা শুনিস নি? প্রায় তিন বচ্ছর হল ওর বিয়ে হয়ে গেছে। একটি ছেলেও হয়েছে ও বছর কার্ত্তিক মাসে। জামাই কোথায় যেন চাকরী করে। দেখতে শুনতে মন্দ নয়। এ বিয়ের জন্য দীনু চৌধুরী ভিটে-বাড়ী, জমি-জমা, নরহরি সা'র কাছে বন্ধক রেখেছে। দীনু চৌধুরীর ছেলে বীরুকে দেখিস নি বুঝি? সে বিয়ের পর প্রতিজ্ঞা করে বাড়ী থেকে যায় যে, এ দেনা শোধ করতে না পারলে আর দেশে আসবে না। টাটানগরে এক কারখানায় চাকরী পেয়েছে সে। মাস মাস দশ পনর টাকা করে নরহরি সা'কে পাঠায় দেনার জন্য। সুদে আসলে অনেক টাকা শোধ করে ফেলেছে।

শ্যামলের মনটা ব্যথায় টন্ টন্ করে ওঠে। সেই ক'বছর আগে দেখা সুন্দর কচি মুখখানা তার মনে পড়ে। মনে পড়ে সেই একদিন বিকেলে প্রথম দেখা দীঘির ঘাটে—বাসন মাজছে কোমরে আঁচল জড়িয়ে। হাতের কাজ ফেলে কেমন বিস্মিত সলজ্জ নয়নে চেয়েছিল তার দিকে। ঘটক ঠাকুর্দ্দা তো উষীর সুমুখেই বলে ফেলেছিলেন তাদের বিয়ের কথা। এতে কি ওর মনে একটুও ছাপ পড়ে নি!

অনেক আশা করেই শ্যামল এবার চার বছর পরে দেশে এসেছে। উষীর সে চার বছর আগে দেখা মুখখানা আজও মনের মধ্যে আঁকা রয়েছে। এ ক বছর তার পড়াশুনার মধ্য দিয়ে যে কি করে কেটেছে সে তা নিজেই জানে না। শুধু মনটা তার বদলায় নি একটুও।

শ্যামলের আর ভাল লাগে না পল্লীর সবুজ শোভা। সব মুছে গিয়ে এসেছে একটা বিরাট শূন্যতা। এখন যেন গাঁ ছেড়ে যেতে পারলে বাঁচে। তাই কাল সে যাবে।

আজ দুপুরে ঘুম থেকে উঠে ঘরের বাইরে আসতেই দেখে বারান্দায় পিসিমা বসে কার সাথে যেন আলাপ করছেন। শ্যামল সেদিকে না তাকিয়ে সরে যাচ্ছিল। এমন সময় কে যেন ডাকলে—শ্যামলদা।

শ্যামল দাঁড়াল। একটি মেয়ে, কোলে তার ফুট্‌ফুটে একটি ছেলে, পরণে চওড়া লাল পেড়ে সাড়ি, কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথিতে সিঁদুর। মেয়েটি কোলের ছেলেকে বসিয়ে উঠে এল।

শ্যামল দেখলে এই সেই চার বছর আগের দেখা উষী! আরও বেশী সুন্দরী হয়েছে সে দেখতে। রং তার যেন ফেটে পড়ছে। ঠোঁট দুখানি পানের রংয়ে লাল। দেখলে সে উষী বলে চেনাই যায় না। চোখের সে সরল সলজ্জ চাউনি আর নেই—মুখখানি হয়েছে আরও বেশী সুন্দর, চোখ দুটি স্থির, অচপল। উষী এসে শ্যামলের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে দাঁড়ায়, বলে—শ্যামলদা চিনতে পারলে?

শ্যামল বড় বড় চোখে চেয়ে থাকে, কোন কথা বলতে পারে না সে। উষী হেসে ওঠে বলে—বাঃ রে! এরি মধ্যে ভুলে গেলে। পিসিমা বলেন—ও যে ওবাড়ীর উষী রে, চিনতে পারলি না?

শ্যামল চিনতে পেরেছে অনেক আগে, কিন্তু বলতে পারছে না কিছু। তার মনে হয় উষীর তো কোন ব্যথা নেই প্রাণে, দিব্য হাসিখুসি! তা হলে বেশ সুখী হয়েছে সে। শ্যামল মনে একটু যেন শান্তি পায়, কিন্তু ব্যথাও লাগে কম না। কোন মতে সে পাস কাটিয়ে বাইরে চলে আসে।

তার পর দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দেবার দিনটিতেও সবার সাথে পাড়াগাঁয়ের একটা জীর্ণ দীঘির ধারে দেখা পল্লীবালার সরল মধুর মুখখানি—আর স্নিগ্ধ সজল চোখ দুটি—মনের কোণে ভেসে ওঠে। সেই উষীর এ নতুন রূপ যেন সে মেনে নিতে পারে না নিজের মনের মধ্যে। কত তর্ক ওঠে তাকে নিয়ে—কত প্রশ্ন জাগে মনের ভেতর। সত্যই কি উষী সুখী হয়েছে? একটুও কি মনে হয় না তার কথা? এ কি শুধু চোখেরই দেখা, প্রাণে কি একটুও লাগেনি এর ছাপ। বার বার মনে পড়ে কেমন করে উষী চাইত তার দিকে! আজও শ্যামলের দেহ-মন পুলকিত হ'য়ে ওঠে পল্লীবালার সরল সলজ্জ চাউনি স্মরণ করে।

জাহাজ চলতে থাকে সাগরের বুকে আপন বেগে অধীর হ'য়ে।

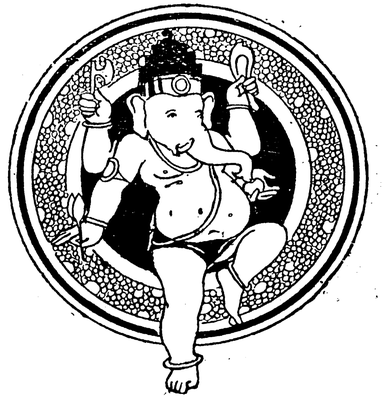

ভারতীয় চিত্রকলার তৃতীয় বার্ষিক প্রদর্শনী

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীঅতুল বসু প্রমুখ প্রসিদ্ধ শিল্পীগণের অধিনায়কত্বে কলিকাতা যাদুঘরে ভারতীয় চিত্রকলার তৃতীয় বার্ষিক প্রদর্শনী এইবার অপূর্ব্ব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, ইহা দেশের এবং শিল্পীগণের পক্ষে খুবই আশার কথা—ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ চিত্রকলা প্রদর্শনী আমাদের দেশে সম্পূর্ণ নূতন এবং নব-প্রতিষ্ঠিত হইলেও শিল্পাদর্শের অনুরূপ এই প্রদর্শনীগুলি এখনও অনেক নিম্নস্তরে থাকায় দেশের শিল্পীগণ এবং দেশবাসী বিশেষ দুইটি হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

বালির নদী — এম-ড্রেপার

ধোপার ঘাট —মিসেস এইচ, এস, এডমণ্ডসন্

প্রথমতঃ শিল্পীদের পক্ষে কিছু বলিবার পূর্ব্বে প্রাচীন ভারতে চিত্রকলা কিরূপ সমাদর পাইত সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। ঐতিহাসিক প্রমাণ যতদূর পাওয়া যায় তাহাতে দেখিতে পাই ভারতবর্ষে চিত্রকলার সম্যক উপলব্ধি প্রথম ধর্ম্ম হইতেই উদ্ভূত হয়। ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে অথবা ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য চিত্রকলা বিচিত্র সম্ভারে নিত্য-নূতন ভাবে সৃষ্ট হইতে থাকিলেও শিল্পী এখানে নিজস্ব প্রতিভা স্ফুরণের সুযোগ তেমনভাবে পায় নাই। সে সময়ে শিল্পীর 'অর্ডার' কাজের মত রাজা-মহারাজার জন্য গতর খাটাইয়া অখ্যাত অজ্ঞাত অনাদৃত হইয়া নীরবে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছে। তাহাদের প্রতিভার স্ফুরণ দেশবাসীর দেখিবার সুযোগ কোন দিন আসে নাই বলিয়াই আজ পর্য্যন্ত পটুয়ারা গ্রামে গ্রামে বাঁচিয়া রহিয়াছে, কিন্তু পাহাড়পুর, অজন্তা, ইলোরা, মহাবলীপুরম্, খজুরাহো ও কোণারকের শিল্পীদের নাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে আজ একেবারে নিশ্চিহ্ন।

কিন্তু আজ দেশে শিল্পীরা যে উচ্চ স্থান পাইতেছেন এবং জনসাধারণ তাঁহাদের শিল্পকলাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন উহা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যের অবদান—একেবারে অস্বীকার করিলে চলিবে না। এই মনোভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিবার জন্য উভয় পক্ষেরই যথেষ্টা চেষ্টা করা উচিত এবং এইরূপ চিত্রকলা-প্রদর্শনীই উহার একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা।

কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ ভারতীয় চিত্রকলার প্রদর্শনীর কক্ষে প্রবেশ করিলেই প্রথমে চোখে পড়িয়া থাকে চিত্র প্রসাধনের অভাব। দ্বিতীয়তঃ প্রদর্শনীগুলির প্রতি বিখ্যাত শিল্পীদের উদাসীনতা এবং অসহযোগিতা; তৃতীয়তঃ মনকে বিশেষভাবে পীড়া দেয় চিত্র-নির্ব্বাচন। এই সব কারণে জনসাধারণের চিত্রকলার সহিত ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হইবার আরও ব্যাঘাত ঘটিবে।

এতদিন প্রদর্শনীর অভাবের জন্যই হউক অথবা যে কারণেই হউক—প্রাচীনকালে যেমন জনসাধারণ অজন্তা প্রভৃতি শিল্পকলার সহিত সম্যকভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ না পাওয়ায় কেবলমাত্র লোকশিল্পের সহিত পরিচিত ছিল তেমনি আজ দেশবাসী উহার চেয়ে অতি নিকৃষ্ট চিত্রকলাকে লইয়া সন্তুষ্ট রহিয়াছে—ইহা একটি জাতির পক্ষে কলঙ্কের কথা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং যাহাতে মাসিক পত্রিকায় ছাপা ছবির মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারা যায় সেইরূপ ব্যবস্থা এবং সুযোগ জনসাধারণকে এই প্রদর্শনীগুলির মধ্য দিয়া শিল্পীদের দেওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক সময়েই প্রদর্শনীগুলি দেখিয়া মনে হয় যেন উহারই পুনরুল্লেখ হইতেছে মাত্র। ইহা শিল্পীদের এবং দেশবাসীর পক্ষে খুবই ক্ষতিকর।

ইহা ব্যতীত আর একটি গুরুতর সমস্যা ভারতীয় চিত্রকলায় দেখা দিয়াছে। ইহা শিল্পী শ্রীসুধাংশুকুমার রায়ের চোখে ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া আমরা খুবই সন্তোষলাভ করিয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন, "ইউরোপের চিত্র-জগতে পুরাতন ও আধুনিক-পন্থীদের মধ্যে একটা বিরাট সংগ্রাম চলেছে। আধুনিক-পন্থীরা পুরাতন-পন্থীদের অনেক দোষ ধরেছেন—পক্ষান্তরে পুরাতন-পন্থীরা একটু এগিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন—আধুনিক-পন্থীদের ছবি 'ওয়েষ্ট

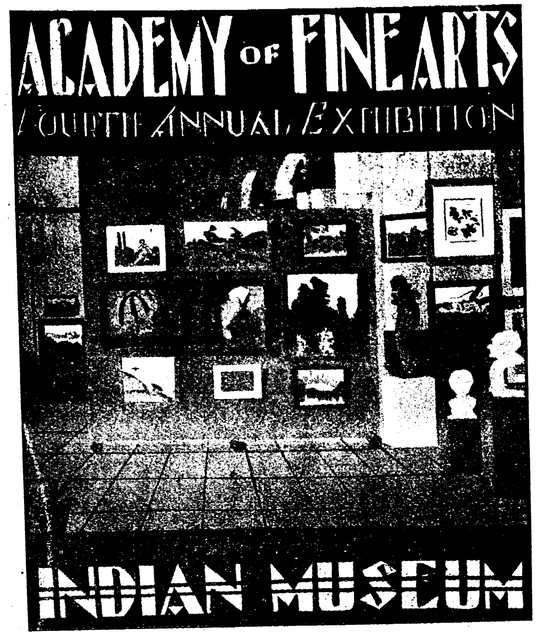

একখানি পোষ্টার—শিল্পী—জহর সেন

পেপার বাস্কেটে' ফেলে দাও।" সারা ইউরোপীয় চিত্রকলার রসাস্বাদন যাঁরা কর্ত্তে চান, বলা বাহুল্য তাঁরা এই দুটো

তৃষ্ণার্ত্ত—গোবর্দ্ধন

মতের কোনটাই না মেনে নূতন পুরাতন উভয়-পন্থীর ছবিকেই খতিয়ে দেখবেন।

ভারতবর্ষে কিন্তু সমস্যাটি একটু ঘোরাল। এখানে নূতন পুরাতনের দ্বন্দ্ব নেই; আছে পূর্ব্ব ও পশ্চিম-পন্থীর দ্বন্দ্ব। ইহা পদ্ধতিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষার কোন্দল—প্রতিভার ক্রমবিকাশের দ্বন্দ্ব নয়।

আমাদের দেশের চিত্রকলায় আধুনিক-পন্থীর সঙ্গে পুরাতন-পন্থীর দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ বলে কিছুই আশা কর্ত্তে পারি নে, কারণ 'আধুনিক' নামে কোন চিত্র-শিল্পের সৃষ্টিই আমাদের দেশে হয় নি। যাই হোক ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে ভারতীয় চিত্রকলার পরিচয় ঘটাবার মূলে বাধা সৃষ্টি করেছে—এই পদ্ধতিগত স্বাতন্ত্র্য বোধ। ভারতবর্ষে যেমন নিছক ভারতীয় ও নিছক ইউরোপীয় পদ্ধতিতে ছবি আঁকেন এমন দু'টি চিত্রকরের দল রয়েছে, তেমনি এই উভয় পন্থার মধ্যে ভাল মন্দ বিচারের ও তুলনামূলক আলোচনার জন্য দুইটি পক্ষপাতমূলক সমালোচকমণ্ডলীরও সৃষ্টি হ'য়েছে। কেউ নিছক ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্রকে দু'চক্ষের বালি মনে করেন। কেউ বা ভারতীয় চিত্রের পৃষ্ঠপোষক হ'য়ে ওঠেন। কিন্তু এ দু'টোর কোনটাই স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। আমাদের উচিত কোন প্রকারে পক্ষপাতদুষ্ট না হ'য়ে দু'রকম পদ্ধতির চিত্রেরই রসগ্রহণের চেষ্টা করা এবং উভয় সম্প্রদায়ের শিল্পীদেরও উচিত জনসাধারণকে তাদের ছবির অপক্ষপাতমূলক আলোচনার সুযোগ দেওয়া।"

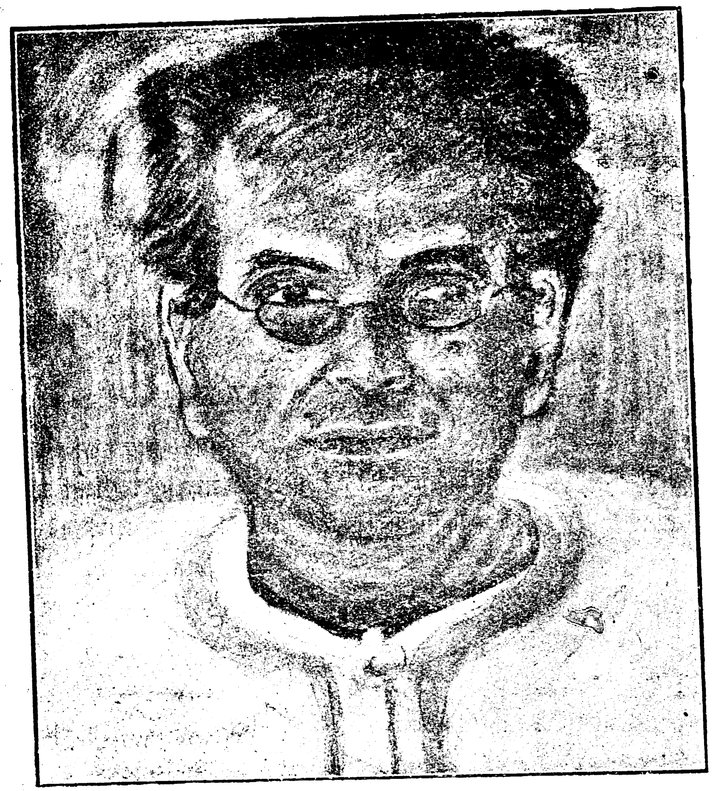

অবনীন্দ্রনাথের প্রোট্রেট —প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

ইহা যে কত বড় সত্য কথা—আশা করি উহা আর বিশদভাবে বুঝাইয়া না বলিলেও চলিবে। তাহা হইলে বর্ত্তমানের এইরূপ বিভক্ত পদ্ধতিগত বৈষম্যে প্রতিষ্ঠিত প্রদর্শনীগুলির পরিবর্ত্তে জনসাধারণ বৈচিত্র্যময় নিত্য-নূতন রস সৃষ্টির অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিয়া সুচারু রুচির পরিচয় দিতে সমর্থ হইবেন। তখনই সার্থক লাভ করিবে ভারতীয় চিত্রকলার রূপ এবং শিল্পীদের অন্তরলোকের চির-চেতনাময় মানসমূর্ত্তি—সে তখন বদ্ধ জলাশয় হইতে মুক্ত হইয়া আপন বেগে বাধা-বিঘ্নের অতীত স্রোতস্বিনীর মত নিত্য-রসে নিজেকে সৃষ্টি করিয়া ছুটিয়া চলিবে।

শিল্পীদের এই সার্থক প্রচেষ্টায় দেশবাসীর এতটুকু কার্পণ্য দেখাইলে চলিবে না। সম্পাদকগণের পত্রিকার জন্য চিত্র নির্ব্বাচনে অধিকতর মনোনিবেশ করিতে হইবে যাহাতে দেশবাসী সহস্র সহস্র কাকের কলরব হইতে একটি কোকিলের শব্দ শুনিয়া মোহিত হইতে পারে এবং নিজেদের সুস্থ মনের ও জাতিগত ভাবের সুরুচির "ষ্টাণ্ডার্ড" উঁচু করিতে সমর্থ হয়। যেমন জাপানে প্রত্যেক স্কুলে প্রত্যেক ছেলেমেয়েদের শিল্প সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়, প্রত্যেক ছেলে-মেয়েকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় কি করিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে

অনুভব, উপভোগ, উপলব্ধি করা যাইতে পারে—ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের দেশের প্রত্যেক ছেলেমেয়েদের বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শুধু স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য নয়।

ভারতীয় জীবনের একটি চিত্র —সারদা উকীল

সমগ্র জনসাধারণকে শিল্প-রসিক করিয়া তুলিবার জন্য দেশব্যাপী প্রচেষ্টা চাই। ইউরোপে প্রত্যেক সহরে, এমন কি প্রত্যেক ছোট ছোট নগরীতে মিউনিসিপ্যাল আর্ট গ্যালারি আছে, যেখানে বড় বড় শিল্পীদের ভাল ভাল চিত্র সযত্নে রাখিয়া দেওয়া হয়। এই সব আর্ট গ্যালারি প্রতিদিন খোলা থাকে, দর্শনী নাম-মাত্র—অধিকাংশই বিনা মূল্যে। এই সমস্ত শিল্পাগারের কল্যাণে প্রথমতঃ হইয়াছে শিল্পের সংরক্ষণ—যাহার ফলে আমাদের দেশের মত অকালে চারুশিল্প, লোকশিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই, দ্বিতীয়তঃ —দেশের মধ্যে শিল্প-বিকাশ ও শিল্পানুভূতির অনুকূলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তৃতীয়তঃ সাধারণ্যে শিল্পরস গ্রহিতার বিস্তার হইয়াছে। এই সমস্ত শিল্পাগার ব্যতীত অসংখ্য যাদুঘর, শত শত শিল্প-পরিষদ, শিল্পসভা ও শিল্পীদের ক্লাব আছে—যেখানে প্রতিনিয়ত শিল্পীদের সঙ্গে জনসাধারণের ভাবের আদানপ্রদান চলিতেছে। এইরূপ ভাবে আমাদের দেশেও শিল্পপ্রসারের দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করিতে হইবে।

কলিকাতার 'একাডেমি অফ ফাইন আর্টস্' উহার তুলনায় ক্ষুদ্র হইলেও এই সুযোগের সৃষ্টি করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

এইবার প্রদর্শনীতে যে সমস্ত চিত্রের সমাবেশ হইয়াছে তাহাকে মোটামুটিভাবে ৪টি পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যায়। (১) ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্রাবলী (২) ভাস্কর্য্য (৩) ইউরোপীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্রাবলী (৪) পুরাতন ইউরোপীয় চিত্রকরদের চিত্রাবলী।

প্রদর্শনীতে ভারতীয়-পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্রের সংগ্রহ দেখিলে মনে হয় 'দুধ ফেলিয়া জলের সংস্থান'। ইহার কারণ ভারতীয় পদ্ধতির শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, ক্ষিতীন্দ্রকুমার, বীরেশ্বর সেন, অসিতকুমার, দেবীপ্রসাদ, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ প্রভৃতি কেহই চিত্র প্রদর্শিত করেন নাই। অবশ্য যামিনী রায়ের নূতন পন্থায় অঙ্কিত ১৫খানি

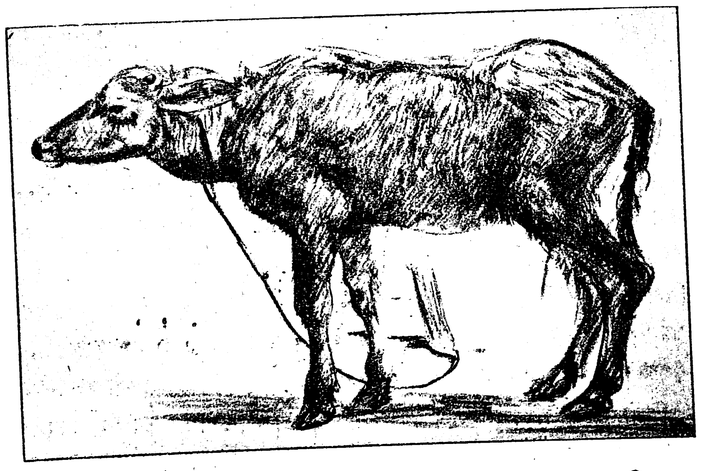

কাঠ-কয়লায় অঙ্কিত একখানি চিত্র —অবনী সেন

এবং পুরাতন পন্থায় অঙ্কিত ১খানি চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। যামিনীবাবুকে 'মা ও মেয়ে' ছবিখানির জন্য প্রদর্শনীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'ভাইসরয় মেডেল' দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই 'মা ও মেয়ে' চিত্রখানির ভাব ও ব্যঞ্জনা যামিনীবাবুর পটুয়া শিল্পের পন্থায় অঙ্কিত অন্যতম 'মা ও সন্তান' চিত্রখানি হইতে অনেক দুর্ব্বলতর; এই চিত্রখানির মধ্যে শিল্পীর সাধনার একাগ্রতা এবং চিত্রের ধর্ম্মের উপর অকপট শ্রদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায়। 'মা ও সন্তান' বলিতে কোটি কোটি নরনারীর হৃদয় যে ভাবে আন্দোলিত হয় সেই চিন্তাশক্তির গভীরতায় এই চিত্রখানি অতুলনীয়।

সাঁওতাল নৃত্য —রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

চিত্রাঙ্কনে কোথাও দুর্ব্বল কল্পনার অথবা অর্থহীন অত্যুগ্র বর্ণবিন্যাসের স্থান নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যামিনী রায়ের তুলিকায় পল্লী-শিল্পের নিজস্ব ভঙ্গী ও প্রতিভায় অঙ্কিত বলিয়াই বোধ হয় এই চিত্রখানিকে প্রথম পুরস্কার দিতে কর্ত্তৃপক্ষ সাহস করেন নাই।

শিল্পী শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর 'পদ্ম-চয়ন', 'সাঁওতাল নৃত্য', মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, সারদা উকীল, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পীর চিত্রাবলী দেখিলে দেশীয় কলা-বিজ্ঞানের অঙ্কন প্রণালীতে রসসৃষ্টির গভীরতা কিরূপ পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা বুঝা যায়।

তরুণ শিল্পীদের মধ্যে চিন্তামণি কর, আর্থার ঘোষ, কিরণময় ধর, এম, এল, দত্তগুপ্ত, তারক বসু, শীলা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির চিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য। চিরাচরিত পথ ত্যাগ করিয়া বিষয়বস্তুর উপাদানকে ব্যাপকভাবে লইয়া বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের নানা দৃশ্য ও ঘটনাকে ইহাঁরা চিত্রকলায় যে রূপ দান করিতে উদ্যত হইয়াছেন উহা আশা করি আধুনিক বঙ্গীয় চিত্রকলায় এক অনবদ্য রসের সন্ধান যোগাইতে সমর্থ হইবে। তাঁহাদের অঙ্কন প্রথায় দেবদেবীর বা যক্ষের যতটা স্থান আছে—তাহার চেয়ে বেশী চোখে পড়িয়া থাকে বাঙ্গালার মাঝি, ভিক্ষুক, গাড়োয়ান, আউলবাউল, ঝাড়ুদার, কুলীমজুর, মেছুনী, দোকানদার প্রভৃতি। সামান্যের ভিতর দিয়া বিরাটের এই যে উপলব্ধি—ইহা আধুনিক বঙ্গীয় চিত্রকলায় এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রদর্শনীতে ভাস্কর্য্য বিভাগের সংগ্রহ মোটেই উৎকৃষ্ট হয় নাই। বিশেষভাবে আনন্দদান করিবার মত দুই তিনখানি ভাস্কর-মূর্ত্তি চখে পড়িয়া থাকে কি না সন্দেহ। শিল্পী সুধীররঞ্জন খাস্তগীরের পরিপুষ্ট মনের প্রকাশ ভঙ্গীতে উদ্ভাসিত কোন মূর্ত্তিই নাই। তবে তাঁহার নূতন কাজের কয়েকখানি মূর্ত্তি বেশ ভাল হইয়াছে। প্রদর্শনীতে আরও বেশী এবং উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য্য নিদর্শনের ব্যবস্থা করা সঙ্গত।

ইহার পরেই ইউরোপীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্রের বিভাগ চোখে পড়িয়া থাকে। ইউরোপীয় পদ্ধতির চিত্র প্রায় বাঙ্গালী, বম্বেবাসী ও ভারতপ্রবাসী ইউরোপীয় অনেক শিল্পী দ্বারাই অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে শিল্পী ললিত-মোহন সেন তাঁহার 'বর্ম্মী মেয়ে' চিত্রখানিতে সামঞ্জস্যময় খুব সাহসিক-বর্ণ প্রলেপের পরিচয় দিয়াছেন—তাঁহার এই ধরণে অঙ্কিত চিত্রগুলি প্রায়ই খুব জীবন্ত স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া

থাকে। মূক ও বধির শিল্পী শ্রীবিমানবিহারী চৌধুরী অঙ্কিত রঙিন সেকচ' ও ক্ষিতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইটালীয়ান-প্রথায় অঙ্কিত তৈলচিত্রগুলি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। শিল্পী অতুল বসু তাঁহার অঙ্কিত প্রতিকৃতিগুলিতে যে বিশেষ হৃদয়াবেগ অনুভব করিয়া বর্ণের আলোকচ্ছায়ায় সামঞ্জস্যময় রূপ উদ্ভাসিত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার গভীর সহানুভূতির পরিচয় পাই। ইহাঁদের কম্পোজিসন বিদেশী হইলেও চিত্রের টেকনিক্ সম্পূর্ণ তাঁহাদের নিজস্ব। এই সংমিশ্রণের ফলেই তাঁহাদের এই চিত্রগুলির প্রত্যেকটি রেখা বিশেষ উদ্দেশ্য ও ভাব লইয়া আপন অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিয়াছে। অবনী সেনের চিত্রগুলিতে সতেজ ও ঝরঝরে ভাবের প্রকাশ আছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এবার 'পোষ্টার' চিত্র খুবই কম। আধুনিক যুগে 'পোষ্টার' শিল্পের প্রভূত উন্নতিসাধন হইয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশের শিল্পীরা এখনও ঠিক তেমন-ভাবে এই শিল্পটাকে গ্রহণ করেন নাই। এখন দেশে ইহার চাহিদা বেশ বাড়িয়া গিয়াছে, তরুণ শিল্পীদের এদিকেও অধিকতর মনোযোগ প্রদান করা সঙ্গত। প্রদর্শনীতে পোষ্টার চিত্রে জহর সেনকে পুরস্কার প্রদান করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ সুবিবেচনার কাজ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ইউরোপীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত আরও কয়েকখানি চলনসই চিত্র থাকিলেও বোম্বাই হইতে যে সব ছবি আসিয়াছে তাহার মধ্যে কোন বিশেষত্ব নাই—একেবারে সাধারণ চিত্র বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

অধিকাংশ পুরাতন ইউরোপীয় চিত্র মহারাজা প্রদ্যোৎ-কুমার ঠাকুর ও পাইকপাড়ার রাজষ্টেট্ দিয়াছেন। যদিও মহারাজা ঠাকুর প্রভৃতি তাঁহাদের সংগৃহীত ইউরোপীয় চিত্রকরদের অঙ্কিত চিত্রের কয়েকটি নমুনা দেখিবার সুযোগ দিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় বেশী এই সব চিত্র আর প্রদর্শিত না হওয়াই উচিত। ইউরোপীয় গ্যালারীর পৃথিবীবিখ্যাত চিত্রগুলি দেশবাসীর স্বচক্ষে দেখিবার সৌভাগ্য না আসিলে উহা উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকায় দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে নতুবা প্রদর্শনীতে টাঙ্গান পুরাতন ইউরোপীয় চিত্রগুলি হইতে আরও মূল উঁচুদরের এবং অতি আধুনিক পরীক্ষিত চিত্রের প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা উচিত।

ইংরাজী শিক্ষায় ধ্বনি-সমস্যা

অধ্যাপক শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য বি-এ

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে মাতৃভাষায় গৃহীত হইবে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে। তদনুসারে যে সকল বিভিন্ন বিষয় এ পর্য্যন্ত ইংরাজী ভাষার ভিতর দিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা বাঙ্গলা এবং অন্যান্য মাতৃভাষায় (উর্দ্দু, অসমীয়া বা হিন্দী) তর্জ্জমা করিয়া ও প্রয়োজন মত পুস্তকাদি রচনা করিয়া কাজ আরম্ভের বিশেষ আয়োজনও চলিতেছে। স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনব্যাপী যত্ন ও চেষ্টা তাঁহার পরবর্ত্তী কর্ম্মীদের অন্তরে জীবিত থাকিয়া আজ যে ফলে পরিণত হইতে চলিয়াছে তাহা বাঙ্গালার বিশেষ সৌভাগ্য ও গৌরবের কথা তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভাষাই জাতির প্রাণ। মাতৃভাষা লোপ পাইলে, নিজস্ব জাতীয় জীবন বলিয়া আর কিছুই থাকে না। বিদেশী ভাষার প্রভাবে আমাদের মাতৃভাষা ক্রমশঃ প্রাণহীন হইয়া পড়িতেছিল; এমন সময়ে এই লুপ্তপ্রায় ভাষার তথা জাতীয়শিক্ষাপদ্ধতির পুনরুদ্ধারের বিশিষ্ট চেষ্টা দেশের ভবিষ্যতকে সুদৃঢ়ভাবে গড়িতে পারিবে বলিয়া বিশেষ আশা করা যায়। অন্যান্য বিদেশীয় জাতির মধ্যেও এইরূপ শিক্ষা প্রণালীই প্রচলিত আছে এবং তাহা জাতীয় সমৃদ্ধির যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। জাপানের এত দ্রুত উন্নতির একটি প্রধান কারণ—মাতৃভাষার উপর শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন। জাপান বেশ বুঝিয়াছিল যে, বিদেশীভাষার সাহায্যে শিক্ষা দিয়া আধুনিক জগতের সমকক্ষ হইয়া চলা অসম্ভব এবং সেইজন্যই বিশিষ্ট নবীশদের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ের তর্জ্জমা ও পুস্তক রচনা করাইয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল। বিশ্বভাষা (Lingua Franca) হিসাবে প্রয়োজনমত ইংরাজী গৌণভাবে স্কুল ও কলেজে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে মাত্র। অবশ্য এ ভাবের শিক্ষা দ্বারা জাতীয় উন্নতি স্বাধীন দেশে যতটা সহজসাধ্য ও সম্ভবপর, পরাধীন দেশে মোটেই ততটা নহে। তাহা হইলেও এই বর্ত্তমান সুযোগকে সর্ব্বান্তঃকরণে বরণ

করিয়া ভাষা ও জাতির ক্রমোন্নতির চেষ্টা আমাদের সকলকেই করিতে হইবে।

মাতৃভাষায় অন্যান্য সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কমিটী আরও স্থির করিয়াছেন যে, স্কুলগুলিতে ইংরাজী ভাষাও বিশিষ্ট শিক্ষক দ্বারা প্রকৃতভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং প্রয়োজনমত শিক্ষকদিগকে এ বিষয়ে বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া হইবে। ইংরাজী শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে পারদর্শী ও অভিজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত করা হইবে বলিয়া কমিটী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে সমীচীন ও প্রশংসনীয়। এ পর্য্যন্ত স্কুলগুলির উচ্চ চারিটি শ্রেণীতে সমস্ত বিষয় ইংরাজীতে শিক্ষা দেওয়া হইত; ফলে কেবল ইংরাজী শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা না থাকিলেও ভাষায় অল্প-বিস্তর দখল প্রত্যেকেরই হইত। তবে বিশেষজ্ঞ দ্বারা শিক্ষা দেওয়ার দিকে বিশেষ দৃষ্টি না থাকায় উচ্চারণ ও অন্যান্য ব্যবহারিক ত্রুটি থাকিয়া যাইত। কিন্তু এখন সকল বিষয় মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার দরুণ এক দিকে যেমন মাতৃভাষার বিশেষ উন্নতি হইবে, অন্য দিকে তেমনি বিশেষ ব্যবস্থা না থাকিলে ইংরাজীর সুচারু শিক্ষা মোটেই সম্ভবপর হইবে না। যে কোন বিদেশী ভাষা শিখিতে হইলে সেই ভাষার ধ্বনি ও উচ্চারণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ দ্বারা শিক্ষা হওয়াই প্রয়োজন, নচেৎ বিদেশী ভাষা শিক্ষার যে উদ্দেশ্য তাহা সর্ব্বতোভাবে সফল হইতে পারে না। ধ্বনি ও শব্দের উচ্চারণ বিশুদ্ধভাবে আয়ত্ত করিতে না পারিলে, কোন বিদেশীয়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনা মোটেই সম্ভব বা সহজ হয় না; অন্ততঃ যতদিন সেই বিদেশীয় অশুদ্ধ উচ্চারণের সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত না হইয়া উঠেন। কোন নবাগত ইংরাজকে Fan (পাখা) কথাটি বলা হইলে তিনি স্বভাবতঃই Pan (পাত্র) বুঝিবেন, তাহার কারণ আমরা স্কুল কলেজে যেভাবে ইংরাজী শিক্ষা পাইয়া থাকি তাহাতে ইংরাজী ভাষার যে সকল ধ্বনি (Sounds of the letters) বাঙ্গালা বা সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালার অন্তর্গত নয় তাহাদের বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া হয় না। নবাগত ইংরাজটির বুঝিতে না পারার কারণ—ইংরাজী বর্ণমালার 'F'এর ধ্বনি বাঙ্গলায় নাই এবং তৎপরিবর্ত্তে আমরা 'ফ'এর ধ্বনি ব্যবহার করিয়া থাকি; আর এই 'ফ'এর ধ্বনি অনেকটা ইংরাজী 'P'এর ধ্বনির ন্যায়। পরে ধ্বনিতত্ত্ব (Phonetics) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব যে ইংরাজী বর্ণমালার কোন্ কোন্ ধ্বনি আমাদের আংশিক ও সম্পূর্ণভাবে অশুদ্ধ উচ্চারণ হইয়া থাকে।

এইরূপ বিশুদ্ধভাবে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে হয়ত বিভিন্ন মত থাকিতে পারে। কেহ বা বলিতে পারেন বিদেশী ভাষা শুদ্ধভাবে শিখিবার জন্য আমরা এত কষ্ট স্বীকার করিব কেন? বিভিন্ন জাতিগুলি কি ইংরাজী বিশ্বভাষা হওয়া সত্ত্বেও বিশেষভাবে শিক্ষা না করিয়া তাহাদের জাতীয় ভাষার দ্বারা কাজ চালাইতে সমর্থ হয় না? সেইরূপ আমরাও বিশেষভাবে ইংরাজী শিক্ষা না করিয়া কেবলমাত্র বাঙ্গলা দ্বারা কেন সকল কাজ নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইব না?' কথাগুলি কিয়ৎ পরিমাণে ঠিক হইলেও আমাদের ইংরাজী শিক্ষা অন্ততঃ এ সময়ে নিতান্ত প্রয়োজন। কেন না আধুনিক জগতের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের জন্য ইংরাজী পুস্তক ব্যতীত আমাদের আপাততঃ কোনই উপায় নাই; এ ছাড়া রাজভাষা হিসারে ইহার কতক পরিমাণে প্রয়োজন আছে। সে জন্য যখন শিখিতেই হইবে তখন অন্ততঃ যদি সাধ্যাতীত না হয়, তাহা হইলে ভাষা যথার্থ ও শুদ্ধভাবে শিখি না কেন! বিশেষ শুদ্ধভাবে ইংরাজী শিখিতে হইলে উক্ত ভাষা ভাষীর দ্বারা শিক্ষা হওয়াই ইহার প্রকৃষ্ট উপায়, কিন্তু এস্থলে শুধু যে সে ব্যবস্থা হওয়া সম্ভবপর নয় তাহা নহে, বিশেষ প্রয়োজনও নাই। কেবলমাত্র স্বদেশীয় যাঁহারা এবিষয়ে শিক্ষকতা করিবেন পূর্ব্বে তাঁহাদেরই ইংরাজী বর্ণমালার ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, কেন না পূর্ব্ব হইতে এইরূপ ব্যবস্থা থাকিলে ইংরাজী উচ্চারণে এতটা অশুদ্ধতা আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত কি না সন্দেহ।

অধিকাংশ জাতির মধ্যেই দেখা যায় যে, ভিন্ন ভাষার যে ধ্বনিসমূহ নিজ ভাষার বর্ণমালার মধ্যে নাই তাহা আয়ত্ত করিতে গিয়া প্রায়ই শুদ্ধভাবে উচ্চারিত হয় না। যেমন ইংরাজেরা "তুমিকে টুমি", ফরাসীরা "ব্যাড (bad)কে ব্যাদ", জার্ম্মাণীরা "ট্রি (tree)কে ত্রী", চীনারা "রুপী (rupee)কে লুপী", জাপানীরা "রিয়েলী (really)কে রিয়েরী, এবং আমরা Fanকে Pan বা water কে ওয়াটার ইত্যাদি বলিয়া থাকি। ধ্বনির এইরূপ অশুদ্ধতা কোন কোন জাতি স্বল্প চেষ্টায় শুদ্ধ করিয়া লইতে সমর্থ হয়, আর কোন কোন জাতির পক্ষে বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন হয়। এই যে একই ধ্বনির উচ্চারণ কোন জাতির পক্ষে সহজ ও অন্যের পক্ষে কঠিন অনুভব হয় তাহার অবশ্য যথেষ্ট কারণ আছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা সামান্য প্রবন্ধে সম্ভব নয়; কেবল বিষয়োপযোগী কারণ দেখাইলেই এস্থলে যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে করি।

সাধারণতঃ কোন একটি জাতি কয়েকটি ভিন্ন ভাষার মধ্যে হয়ত একটি ভাষার ধ্বনি অতি সহজেই আয়ত্ত করিয়া প্রায় শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইল; অন্য কয়টির হয়ত কিছু কষ্টে এবং অপরটির হয়ত কোন কোন ধ্বনি মোটেই উচ্চারিত হইল না। ইহার প্রধান কারণ, যে ভাষার ধ্বনি স্বল্প কষ্টে উচ্চারিত হইল তাহার বর্ণমালার ধ্বনিসমূহ নিজ ভাষার ধ্বনিসমূহের সঙ্গে সমধ্বনিত্বের দিক দিয়া প্রায় এক বা সামান্য পৃথক, এবং যে ভাষার ধ্বনি আয়ত্ত করা কিছু কষ্টসাধ্য বা অসম্ভব মনে হইল সেই ভাষার বর্ণমালার কোন কোন ধ্বনি নিজ ভাষার বর্ণমালার মধ্যে ত না-ই—এতদ্ব্যতীত সেই সেই বর্ণের উচ্চারণ অদ্ভুত ধ্বনি বলিয়া মনে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন আমরা উর্দ্দুর 'জলাসা' শব্দটি ইচ্ছা করিলেই শুদ্ধভাবে বলিতে পারি— কেন না 'স্' ধ্বনি আমাদের বর্ণমালায় বর্ত্তমান এবং তাহার প্রকৃত উচ্চারণ আমরা জানি ও প্রয়োজন মত 'আস্তে, বাস্তবিক' প্রভৃতি শব্দে শুদ্ধ উচ্চারণ করিয়াও থাকি; কিন্তু উক্ত জলসা' শব্দে 'স'এর উচ্চারণ নিতান্ত তাচ্ছিল্যবশতঃ বর্ণের মৌলিক ধ্বনির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া উহার বিকৃত ধ্বনি 'শ' ব্যবহার হইয়া থাকে। যদিও বাঙ্গালার 'স'এর

এইরূপ বিকৃত উচ্চারণ আর কটু শুনায় না, কারণ ধ্বনি-বিজ্ঞান মতে উচ্চারণ-প্রাদেশিকত্বের (provinc alism in tongue) এবং সহজ উচ্চারণ (easiness in articulation)এর দিক দিয়া এইরূপ পরিবর্ত্তন কখন কখন অবশ্যম্ভাবী ও গ্রহনীয়। কিন্তু আবার উর্দ্দুর 'গুল' কথাটি বলিতে বিশেষ চেষ্টা ও অভ্যাসের প্রয়োজন—যেহেতু বাঙ্গালা বর্ণমালায় ঐ জাতীয় কোন ধ্বনি-নির্দ্দেশক বর্ণ নাই। সেজন্য সেই ভাষাভাষী অথবা ধ্বনিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ দ্বারা শিক্ষিত হইতে পারিলে ভিন্নভাষার সহজ ও কঠিন ধ্বনিগুলি আয়ত্ত করা মোটেই অসম্ভব হয় না।

ভাষার সমৃদ্ধি ধ্বনি সংখ্যার পরিমেয়ত্ব ও পরিপূর্ণতার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। সংস্কৃত ভাষা অপরাপর ভাষা হইতে এ কারণে বিশেষভাবে উন্নত এবং বাঙ্গালাভাষাও ঐ ধ্বনিসমূহের অধিকারী হওয়ায় প্রকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তিদের চেষ্টায় এত শীঘ্র বিশেষ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে। অন্যদিকে ইংরাজীর বর্ণ-সংখ্যা অত্যন্ত অপরিমেয় বলিয়া—ভাষার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি সংখ্যা বর্ণসমূহের সংখ্যা হইতে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় মৌলিকবর্ণসমূহ ব্যতীতও wh, th (thin), th^5 (this), sh, ch s^3 (zh—Pleasure), ng এবং স্থানে স্থানে বর্ণমালার সমধ্বনি থাকা সত্ত্বেও n—Pn, Kn ; s—Ps, F—Ph প্রভৃতি ধ্বনির জন্য একবর্ণ বা যুক্তবর্ণের (diagraph) দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। স্বরবর্ণের প্রায় প্রত্যেক ধ্বনিটিই বিভিন্ন শব্দে একাধিক ধ্বনি লইয়া বর্ত্তমান—'a' একটি মাত্র বর্ণ হইলেই— Cat (ক্যাট), Call (কল), Car (কার), Cane (কেন) প্রভৃতি বিভিন্ন ধ্বনি লইয়া প্রকাশ। ইংরাজীতে c, q ও x ক্রমান্বয়ে K ও S, K, এবং K+S ও G+Zএর সমধ্বনি হওয়ায় ছাব্বিশটি বর্ণের মধ্যে মাত্র তেইশটি বর্ণ থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনমত হয়ত ধ্বনি সংখ্যা বাড়িয়াই যাইবে, আর আমাদের বর্ণমালার ধ্বনি সংখ্যা নিজ ভাষাকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য পরিমেয় হওয়া সত্ত্বেও তাহার ধ্বনি সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস করিয়া মাতৃভাষাকেও দুর্ব্বল করিতেছি, এতদ্ভিন্ন বিদেশীয় ভাষার ধ্বনি শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিবার পথও রুদ্ধ করিতেছি। "ই ও ঈ", "উ ও ঊ" বর্ণসমূহের আর পৃথক উচ্চারণ হয় না; "অন্তস্থ য় ও অন্তস্থ ব বর্ণ দুইটির মৌলিক ধ্বনি সম্পূর্ণরূপে হারাইয়াছি এবং তাহার ফলে হইয়াছে কি Fill (ই) ও Feel (ঈ) এবং Book (উ) Food (ঊ) প্রভৃতির স্বরবর্ণগুলিকে মাত্রা পার্থক্য না রাখিয়া একই ভাবে উচ্চারণ করিতে হয়; আর water—বটার এর পরিবর্ত্তে ওয়াটার ও yes—য়স এর পরিবর্ত্তে ঈয়েস বলিয়া সারিতে হয়। এ ছাড়া যে সকল ধ্বনি বাঙ্গালায় নাই অথচ বাঙ্গালা সাহিত্যে সেই সকল ধ্বনিযুক্ত শব্দ নির্ব্বিবাদে স্থান পাইতেছে কিন্তু তাহাদের উচ্চারণ শুদ্ধতার দিকেও আমাদের কোনরূপ চেষ্টা বা যত্ন পরিলক্ষিত হয় না। Examination, Fit, Third, Bus প্রভৃতির Z, F, th, u ধ্বনি খুব কম লোকেরই শুদ্ধ উচ্চারণ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত উচ্চারণ বিকৃতির ত অভাবই নাই—Persist (পারসিষ্ট)কে পা-ছিছ্‌ট্, actual (এ্যাকচুয়ল)কে একচুয়ল, Examination (এগজা (z) মিনেশন)কে এ্যাগজামিনেশন ইত্যাদি। যাহা হউক, এইরূপে বিভিন্ন কারণে বিদেশীয় ধ্বনি ও শব্দ যখন সকল—ভাষাতেই স্থান পায় এবং তাহার স্বাভাবিক গতি রোধ করিবার যখন কোনও উপায় নাই—তখন যে সকল নূতন ধ্বনি নিজ ভাষায় সুদৃঢ়ভাবে স্থান পাইতেছে, তাহা চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা শুদ্ধ করিয়া লওয়া উচিৎ নয় কি?

যে কোন ভিন্ন ভাষার কোন বিশিষ্ট ধ্বনি নিজভাষার একটি ধ্বনির সঙ্গে সমধ্বনিভাবে শ্রুত হইলেও অতি সূক্ষ্ম পার্থক্যও তাহাতে বর্ত্তমান থাকে। অনেকক্ষেত্রে হয়ত কেবলমাত্র ধ্বনিটি শুনিয়া এই প্রভেদ বুঝিতে পারা যায় না—কিন্তু ভাষার ব্যবহারের বিশিষ্ট ধারায় ইহার প্রকাশ পায়। এই পার্থক্যের জন্মগত স্বাভাবিক কারণ অত্যন্ত সূক্ষ্ম— জাতি, ব্যক্তি, রক্ত ও শ্বাসের গুণ-পরিমাণ ও গতি, বাক্য ও শ্রবণ যন্ত্রের গঠন, স্থান এবং আবহাওয়া প্রভৃতি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করিয়া নিয়ন্ত্রিত। কোন্ জাতির ধ্বনিতে অনুনাসিকের রেশ, কাহারও শ্বাসের উষ্ণতা, কাহারও বা ধ্বনি কণ্ঠ-স্বর-ময় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাব পরিলক্ষিত হয়।

নানা কৃত্রিম উপায়ে ভিন্ন ভাষা শিখিলেও এই পার্থক্যের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য থাকিয়া যাইবেই। এতদ্ব্যতীত অনেকক্ষেত্রে ভিন্ন ভাষার ধ্বনির সমতার সামান্য অভাবকে অগ্রাহ্য করিয়াও শিক্ষা করা প্রয়োজন হয়, নচেৎ প্রায় সকল ধ্বনিরই আমূল পরিবর্ত্তন ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। সাধারণতঃ আমরা মনে করি—ইংরাজীর প্রায় সকল ধ্বনিই বাঙ্গালার বিভিন্ন ধ্বনির সমধ্বনি—কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মোটেই তাহা নয়। পার্থক্য প্রায় সকল ধ্বনিতেই আছে—এ ছাড়া ইংরাজীতে বাঙ্গালা হইতে কতকগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধ্বনিও বর্ত্তমান।

ধ্বনিতত্ত্বের বিচারমতে বাঙ্গালার সহিত তুলনায় ইংরাজীর ধ্বনিগুলিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়।—প্রথম সূক্ষ্ম পার্থক্যযুক্ত, দ্বিতীয় সমতার সামান্য অভাবযুক্ত এবং তৃতীয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধ্বনি। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের সূক্ষ্ম পার্থক্য ও সমতার সামান্য অভাবকে অগ্রাহ্য করিয়া শিক্ষা করা ছাড়া বোধ হয় উপায় নাই—আর তৃতীয় ভাগের জন্য নির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বনে চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা ধ্বনির শুদ্ধতা আয়ত্ব করা প্রয়োজন। প্রবন্ধে সংক্ষেপ ও সুবিধার জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের ধ্বনিসমুহের জন্য বিশেষভাবে ধ্বনিতত্ত্ব বিচার না করিয়া সামান্য আলোচনাই যথেষ্ট; আর তৃতীয় ভাগের ধ্বনিগুলিকে সম্যক বুঝাইবার জন্য প্রয়োজন মত প্রতিকৃতি (diagram) তুলনামুলক ব্যাখ্যা দ্বারা ধ্বনিতত্ত্বের বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য ধ্বনির সমস্যা ও তাহার বিচার—সে জন্য একই ধ্বনির জন্য শব্দে বিভিন্ন বর্ণের ব্যবহার এবং উচ্চারণ ও উহের বিশিষ্টতা, মাত্রাভেদ (accent) প্রভৃতির দৃষ্টান্ত উল্লেখে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া লাভ নাই। ইংরাজী পুস্তকের বর্ণ বিন্যাস অসম্পূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক—সেই হেতু বর্ণের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া ধ্বনির বিজ্ঞানসম্মত রচনা এস্থলে বর্ণিত হইবে।

প্রথমভাগ

স্বরধ্বনি ঃ—a—অ (all,) a—আ (Path), e—ঈ (eve),—
o—উ (do), e—এ (end), o—ও (obey), a—এ্যা (mar) এবং যুগ্মধ্বনি (dipthong)—i—আঈ (isle)।

a in man এই "এ্যা" ধ্বনিটি বাঙ্গালা বর্ণমালার অন্তর্গত না হইলে ও ইহাতে আমরা স্বাভাবিক ভাবেই উপার্জ্জন করিয়াছি। বাঙ্গালায় বহু শব্দে লিখিত চিহ্ন 'এ' থাকিলেও তাহার প্রকৃত ধ্বনি না দিয়া—এক, দেখ, বেলা প্রভৃতি শব্দে "এ্যা" ধ্বনি দেওয়া হয়।

ব্যঞ্জনধ্বনি ঃ—h, b, d, g, m, n, S (c), Sh, ng, l, r, ch, J (g) ক্রমান্বয়ে হ, ব, ড, গ, ম, ন, স, শ, ঙ, ল, র, চ, জ এর সমধ্বনি।

মূলে ch ও J—t+sh ও d+zh ভাবের ব্যঞ্জন-যুগ্মধ্বনি (consonantal dipthongs) হইলেও ঐরূপ ব্যবহার আর হয় না। কোন কোন ধ্বনিতাত্ত্বিকের মতে ch, J, sh ধ্বনি তিনটি উচ্চারণ জন্য ওষ্ঠদ্বয় সামান্য গোলাকৃতি (slightly protruded) হওয়া উচিৎ, কিন্তু অন্যান্য ধ্বনিতাত্ত্বিক এইরূপ গঠনকে (fromation) বিকৃত (affected) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। "r"এর ধ্বনি ইংরাজীতে দুইভাবে সাধারণত ব্যবহৃত হয়। একরূপ বাঙ্গালা 'র'এর ন্যায় বা স্বল্পকম্পিত (slightly trilled), আর দ্বিতীয় রূপে 'r'এর কম্পিত ভাব থাকে না। এই অকম্পিত '।'এর জন্য জিহ্বা গঠনস্থানে যায় মাত্র কিন্তু কোনরূপ কম্পন না দিয়া ফিরিয়া আসে এবং শব্দে 'r'এর পূর্ব্ববর্ত্তী "আ" স্বরধ্বনিটি দীর্ঘভাবে উচ্চারিত হয়—arm (আ—ম), Car (কা—র) প্রভৃতি। r এর ধ্বনিও কেহ কেহ বিকৃতভাবে ওষ্ঠদ্বয় গোলাকৃতি (Fro ruded) করিয়া দিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় ভাগ

স্বরধ্বনি ঃ—i—ই (sit) এবং u—উ (pull); যুগ্মধ্বনি (dipthongs) ঃ—ou—আউ (thoü), এবং oi—অই (oil); ঈষৎ যুগ্মধ্বনি (semi-dipthongs or glide sound) ঃ—
a-e—এই (age) এবং O—ও উ (old)

বাঙ্গালায় ই, ঈ এবং উ, উ ক্রমান্বয়ে ঈ এবং উ ধ্বনিতেই পরিণত—হইয়াছে, নচেৎ i এবং u এর ধ্বনির জন্য চিন্তা করিতে হইত না।

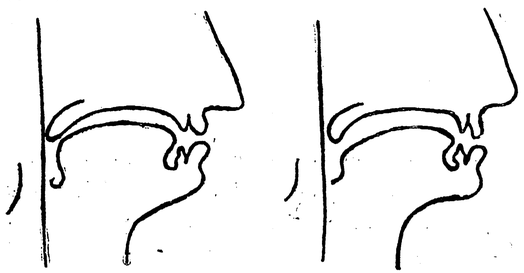

ঈ—e (eve)

ই—i (sit)

e (eve)—ঈ উচ্চারণের জন্য গঠন হইতে জিহ্বা সামান্য নামাইয়া স্বর দিলে যে ধ্বনি পাওয়া যাইবে তাহাই i—ই (sit) এর প্রকৃত শুদ্ধ ধ্বনি। ওষ্ঠদ্বয়ের অবস্থা স্বাভাবিকভাবেই থাকিবে। গঠনের পার্থক্য উপরের প্রতিকৃতি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

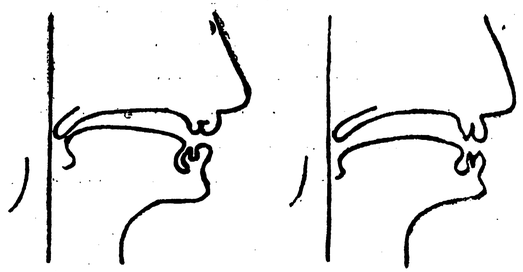

উ—o (do)

উ—u (pull)

o (do)—'উ' উচ্চারণের গঠন হইতে জিহ্বার পশ্চাৎভাগ সামান্য নামাইয়া ও সেই সঙ্গে ওষ্ঠদ্বয়ের গোলাকৃতি ফাঁক সামান্য বড় করিয়া স্বর দিলে যে ধ্বনি পাওয়া যাইবে তাহাই u (pull)—উ এর প্রকৃত শুদ্ধ ধ্বনি। উপরের তুলনামূলক প্রতিকৃতি হইতে পার্থক্য সম্যক বুঝিতে পারা যাইবে।

ou—আউ এবং oi—অই যুগ্মধ্বনি দুইটির কোন আলোচনার প্রয়োজন নাই—কেন না ধ্বনি কয়টি ভিন্নভাবে পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

এই—a-e (age) এবং ওউ—o (old) এই দুইটি ঈষৎযুগ্ম ধ্বনির জন্য ক্রমান্বয়ে এ এবং ও পূর্ণমাত্রায় ধ্বনি দিয়া ই এবং উ উচ্চারণ স্থানে জিহ্বা পৌঁছিবে মাত্র। এই কারণে ই এবং উ বর্ণদুটি এ এবং ও হইতে ছোট করিয়া লেখা হইয়াছে। এই ঈষৎযুগ্মধ্বনিদুটি আমরা মোটেই শুদ্ধভাবে দিই না এবং তাহার পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র এ এবং ও দিয়া থাকি।

ব্যঞ্জন ধ্বনি ঃ—P, T, K (Q) এর জন্য আমরা ক্রমান্বয়ে প, ট ও ক ধ্বনি দিয়া থাকি। প, ট, ও ক হইতে উক্ত ধ্বনিগুলি অধিক শ্বাসযুক্ত। কোন কোন অভিধানে বা ধ্বনিতাত্ত্বিক দ্বারা বর্ণগুলির উপরে h চিহ্ন দিয়া Ph, Th, Kh এইভাবে শ্বাস নির্দ্দেশিত হইয়াছে। P, T, K, অনেকটা ফ, ঠ ও খ এর ন্যায়—পার্থক্য এই যে ফ, ঠ ও খ এর শ্বাস (breath) বর্ণগুলির ধ্বনির সহিত জড়িত অবস্থায় পশ্চাৎবর্ত্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়, কিন্তু P, T, ও K ধ্বনি কয়টির শ্বাস পশ্চাৎবর্ত্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলিত হইবার পূর্ব্বেই সামান্যক্ষণ স্থায়ী হইয়া শ্রুত হয়। যেমন—

ফ্যান—ফ্যান (ভাতের মাড়) ;
Pan (Phan)—ফ—্যান (পাত্র)। (—শ্বাস চিহ্ন।)

Q এর মূলধ্বনি K র ন্যায়—antique, etiquette প্রভৃতি শব্দে K ধ্বনিই শ্রুত হয়। Q বর্ণ টি u ব্যতীত ব্যবহৃত হয় না এবং Q এর পরে u এর ধ্বনি ব্যঞ্জনান্ত বলিয়া Quit, quantity প্রভৃতি শব্দে K+W অথবা K+wh ধ্বনিভাবে উচ্চারিত হয়। (w এবং whএর ধ্বনি তৃতীয়ভাগে থাকিবে।)

X ব্যঞ্জনান্ত যুগ্মধ্বনি K+S ও G+Z দুইভাবে উচ্চারিত হয় (Z এর ধ্বনি তৃতীয় ভাগে থাকিবে)।

তৃতীয় ভাগ

স্বরধ্বনি ঃ—U in but, O in hot, এবং E in her ধ্বনি তিনটি বাঙ্গালায় আদৌ নাই এবং ইহাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য এত সামান্য যে সেই সূক্ষ্ম পার্থক্য বজায় রাখিয়া বিদেশীয়ের পক্ষে আয়ত্ত করা সুকঠিন। এতদ্‌কারণে অন্ততঃ u in but এর ধ্বনি আয়ত্ত করিয়া ও তদনুযায়ী অন্য ধ্বনি দুইটি সমধ্বনিভাবে ব্যবহার করিলেও কিয়ৎ-পরিমাণে শুদ্ধতা বজায় থাকিবে এবং এমন কি কোন ইংরাজের পক্ষেও বুঝিতে কষ্টকর হইবে না।

U in but এই ধ্বনিটির জন্য 'আ' উচ্চারণের গঠন হইতে জিহ্বা সামান্য উপরে উঠাইয়া ও ওষ্ঠের ফাঁক সামান্য কমাইয়া স্বর দিলে যে ধ্বনি পাওয়া যাইবে তাহাই ইহার প্রকৃত শুদ্ধ ধ্বনি। বাঙ্গালায় কোন কোন চলতি কথায় এই ধ্বনিটির শুদ্ধ উচ্চারণ হইয়া থাকে—যেমন, 'বস্, তোমাকে আর যেতে হবে না।' এই 'বস্' শব্দটির 'ব' ধ্বনির সঙ্গে যে অ মিশ্রিত আছে সেই স্বর ধ্বনিটিই প্রায় U in but এর ধ্বনি। এই ধ্বনি-টির জন্য প্রতিকৃতি দিতে পারিলে ভাল হইত কিন্তু X—Ray Photo-graph ব্যতীত পরিষ্কারভাবে বোঝান কঠিন বলিয়া রেখা প্রতিকৃতি দেওয়া হইল না।

ব্যঞ্জনধ্বনি ঃ—Y এবং W স্বর ও ব্যঞ্জন দুই ভাবেই ব্যবহৃত হয়। ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহারেও পূর্ণব্যঞ্জন (ure Consonantal) ধ্বনি না দিয়া অর্দ্ধস্বর ধ্বনি (Semi-Vowel) দেয়।

'ঈ' অথবা long 'e' ধ্বনির গঠন হইতে জিহ্বা আরও তালুর সন্নিকটে স্থাপন করিয়া স্বর দিলে ঘর্ষণযুক্ত যে ধ্বনি পাওয়া যায় তাহাই y এর প্রকৃত ব্যঞ্জনান্ত ধ্বনি।

উ অথবা long 'oo' উচ্চারণজন্য গঠন হইতে জিহ্বার পশ্চাৎ ভাগ উপরে উঠাইয়া এবং সেই সঙ্গে ওষ্ঠদ্বয় অপেক্ষাকৃত কুঞ্চিত (narrow) করিয়া স্বর দিলে ঘর্ষণযুক্ত যে ধ্বনি পাওয়া যাইবে তাহাই w এর প্রকৃত ব্যঞ্জনান্ত ধ্বনি।

Wh ধ্বনির জন্য w গঠনের কুঞ্চিত ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্য দিয়া অ-স্বরান্ত (non-vocal) শ্বাস দিলে যে ধ্বনি পাওয়া যায় তাহাই ইহার প্রকৃত ধ্বনি। অনেক ধ্বনিতাত্ত্বিক এই ধ্বনিটিকে—hw (oo) ভাবেও প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং অনেক ক্ষেত্রে h এর ন্যায় ধ্বনিও দেয়-যেমন, whose—hooze, whole—hole প্রভৃতি।

Z in Zinc ধ্বনিটির গঠন সম্পূর্ণ S (স) এর গঠনের অনুরূপ, কেবলমাত্র Z এর জন্য শ্বাসকে স্বরান্ত (Vocalized) করিতে হইবে।

Z in azure অথবা S in measure প্রভৃতির ধ্বনি Z বা S স্বরান্ত (Vocalised) হইতে উষ্ণ বা শ্বাসযুক্ত—সেজন্য ধ্বনিটিকে 'Zh' যুক্ত বর্ণদ্বারা নির্দ্দেশ করা যায়। এই Zh এর ধ্বনি Sh (শ) ধ্বনিটিকে স্বরান্ত (Vocalized) করিলেই ইহার প্রকৃত ধ্বনি পাওয়া যাইবে।

F এবং V।

নিম্ন ওষ্ঠের উপরে উপরের দন্তসমূহ স্থাপন করিয়া শ্বাস দিলে ঘর্ষণযুক্ত যে শ্বাস ধ্বনি শ্রুত হয় তাহাই F এর প্রকৃত শুদ্ধ ধ্বনি। Ph (Phantom), gh (rough), U (lieutenant)—F ধ্বনির সমধ্বনিভাবে উচ্চারিত হয়।

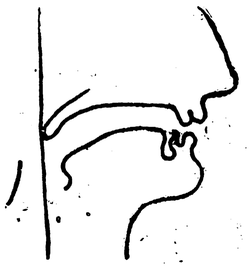

V, F ধ্বনির স্বরান্ত (Vocalized) রূপ।

Th´ (think) এবং th (this)

th´ ধ্বনির গঠন প্রায় বাঙ্গালা ত বর্গের ধ্বনির গঠনের ন্যায়, পার্থক্য এই যে 'ত' এর জন্য জিহ্বা উপরের দাঁতের সঙ্গে সম্পূর্ণ আবদ্ধ থাকে, আর th´ ধ্বনি দিতে জিহ্বা ও দাঁত এর মধ্যে সামান্য পাতলা ফাঁক থাকিবে এবং তাহা দ্বারা ঘর্ষণযুক্ত যে শ্বাস বাহির হইবে তাহাই th´ এর প্রকৃত শুদ্ধ ধ্বনি।

th, th´ এর স্বরান্ত (Vocalized) ধ্বনি।

ভিন্ন ধ্বনির জন্য লিখিত রূপ পৃথকভাবে না থাকিলে তাহার শুদ্ধতা বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন। নিজভাষার বর্ণমালা হইতে ভিন্ন ধ্বনির জন্য প্রতিবর্ণ নির্দ্দেশ করিলে ভিন্ন ধ্বনি শুদ্ধভাবে শিখিয়াও ক্রমশঃ ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। এতদ্ব্যতীত নিয়মিতভাবে শিক্ষা না করিয়া বাঙ্গালার নির্দ্দেশিত বর্ণের সাহায্যে শিক্ষা করিলে শুদ্ধ অশুদ্ধের বিচার মোটেই সম্ভব হয় না। ইহা ব্যতীতও নানা কারণের স্বাভাবিক প্রভাবেও আসিবার সম্ভাবনা আছে। সেজন্য যতদূর সম্ভব বর্ণের রূপ প্রয়োজন মত পরিবর্ত্তন বা নূতন করিয়া লওয়াই উচিৎ।

প্রথম বিভাগের ধ্বনিসমূহের জন্য বাঙ্গালায় সমধ্বনি আছে। দ্বিতীয় বিভাগের স্বরধ্বনি "i এবং u" এর জন্যও ই এবং উ বর্ত্তমান। P, T, K (Q) এবং X এর জন্য ক্রমান্বয়ে ফ, ঠ, খ এবং খ্‌স্ ব্যবহার করিতে পারিলে ধ্বনির শুদ্ধতা এবং লিখিত বর্ণের সঙ্গে কিয়ৎপরিমাণে সামঞ্জস্য থাকিত।

তৃতীয় বিভাগের ধ্বনি সমুহের জন্য সম্পূর্ণ নূতন বর্ণ প্রয়োজন। এই সব ধ্বনির জন্য বাঙ্গালায় যে সকল নির্দ্দেশক বর্ণ ব্যবহৃত হয় তাহাদের সঙ্গে কোনরূপ নূতন চিহ্ন দিয়া বর্ণ তৈয়ারী হইতে পারে। যাহাতে অন্য বর্ণের সহিত ব্যবহারে কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য w ব্যতীত বাঙ্গালার নির্দ্দেশক বর্ণের নীচে একটি চিহ্ন ব্যবহার করা হইবে। যথা—u—অ, y—ঈ, w—ব, Z—জ, Zh—ঝ, F—ফ, v—ভ, th´—থ, th—দ।

ভাষা শিক্ষায় ধ্বনির শুদ্ধতা একান্ত প্রয়োজন। আমরা ইংরাজী শিখি এবং তাহাতে দখলও ভালই হয়। কিন্তু ধ্বনির শুদ্ধাশুদ্ধতা সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকায় শিক্ষায় যথেষ্ট ত্রুটি থাকিয়া যায়। এই শিক্ষায় যে সময় ব্যয়িত হয়, ইংরাজী ধ্বনিতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে তাহা ধ্বনির শুদ্ধতা আয়ত্তের পক্ষে অত্যন্ত পরিমেয়। যাঁহারা শিক্ষকতা করিবেন তাঁহাদের আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার একমাত্র উপায়।

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ইংরাজী ধ্বনির শুদ্ধতা সম্বন্ধে নির্দ্দেশ করা মাত্র, সেজন্য এই সংক্ষিপ্ত প্রয়াসের মধ্যে বিষয়ের সম্পূর্ণতা বা অন্যান্য উচ্চারণ-গত জটিলতার সমাধান কেহ যেন আশা না করেন।

যাহা কাব্য নহে

শ্রীমতিলাল দাস এম-এ, বি-এল্

(১)

পত্নীর রোগ-শয্যার পার্শ্বে সুরেশ জাগিয়া আছে।—সারাদিনের হাড়-ভাঙা খাটুনি ক্লান্ত চোখ দুটিকে তন্দ্রাতুর করিয়া তোলে।

গত জীবনের ছবি মনে জাগে। তরুণী সপ্তদশী লীলা—আর সে এম-এ ক্লাশের পড়ুয়া। রূপ, যৌবন, কাব্য ও গান জটলা করিয়া আসে।

বিহগ কুজনের মত প্রেমের অশ্রান্ত গুঞ্জন। রাত্রির ভিতর অন্ততঃ দশবার জিজ্ঞাসা করে "তুমি আমায় ভালবাস?" লীলা কৌতুক করিয়া বলে "না"। মান অভিমানের পালা চলে।

চলচ্চিত্রের ছবির মত সেই ছবি জাগে। বার বার কাণে কাণে কত যে কথা—কত যে কৌতুক, কত যে ছল, কত লুকোচুরি—এক কথায় সে ছিল কাব্য, আর—

সত্যকার জীবন—রসহীন নির্ম্মম অভিশাপ। এম-এ পাশ করিয়া আজ দশ বৎসর সুরেশ মাষ্টারি করে। তিন মাইল দূরে স্কুল—রোজ হাঁটিয়া যায়, হাঁটিয়া আসে। খাতায় লেখে পঞ্চাশ টাকা—পায় চল্লিশ। শেলি, ব্রাউনিং, টেনিসনের যুগ গেছে। দিনের পর দিন ছেলেদের শিখায় গণিত, ইতিহাস, ভূগোল। লীলা চার পাঁচ ছেলের মা হইয়া শেষ সন্তান প্রসব করিয়া মৃত্যু-শয্যায় পড়িয়াছে।

কি যে রোগ কেহ জানে না। হরকুমার কম্পাউণ্ডারি শিখিতে গিয়াছিল—সেখান হইতে ফিরিয়া H. M. B. নাম দিয়া ডাক্তার সাজিয়াছে—সাতখানি গ্রামের সে-ই ধন্বন্তরী।

তাকে তাকে ঔষধের শিশি সাজানো—এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি দুই ঔষধেই চিকিৎসা চলে। সুরেশ নিরুপায়, দূর সম্পর্কের এক পিসি ছেলেগুলিকে আগলায়—সে পত্নীর সেবা শুশ্রূষা করে।

নিদ্রায় চোখ ভাঙিয়া আসে। তবু জাগিতে হয়, কিন্তু ভালবাসার যে শৌর্য্য—শরীরের আবেদনকে সে জয় করিতে পারে না। কাতর চোখ বুজিতে চায়।

না, সুরেশ আর পারে না; এমন করিয়া সেবায় সৌখীনতা তাহার সহে না। ইহার চেয়ে—

ভাবিতে ও বলিতে লজ্জা এবং সঙ্কোচ। কিন্তু তথাপি মন ভাবে।

এত যন্ত্রণা না দিয়া লীলা মরুক।

তাহার সকল ইন্দ্রিয় বিকল হয়। মনের প্রবুদ্ধ ও অপ্রবুদ্ধ চৈতন্যে দ্বন্দ্ব চলে, কিন্তু এই ইচ্ছাকে সে কিছুতেই দমন করিতে পারে না।

কখন যে চিন্তা স্রোতে শমতা হইয়া সে নিদ্রাতুর হইয়া পড়িল, সুরেশ নিজেই তাহা জানে না।

ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখে। দুঃসহ জীবনের দুর্নিবার ব্যথার কি বিপরীত ছবি।

সে গিয়াছে স্বর্গলোকে। কি সুন্দর ছবি—যেদিকে চায় সেদিকেই সুন্দরের ছড়াছড়ি। গন্ধ ও গান মনকে শীতল করে—আনন্দ অফুরন্ত, ভাণ্ডার অফুরন্ত।

সে পারিজাতের বিকচ ফুল পাড়ে, মালা করে, মালা করিয়া গলায় পরায়। কার? সে যেন লীলা—কিন্তু লীলাও নয়—চির-তরুণী চির-সুন্দরী সে—সে যেন নারীর চিরন্তন লীলা—।

লীলার আর্ত্তনাদ তাকে জাগায়। ক্ষীণ ও বেদনামথিত কণ্ঠ—"দেখ আমার বুকটা জ্বলে যাচ্ছে।"

অভ্যাসমত সে ঔষধের তাকের দিকে হাত বাড়ায়—

লীলা কাতরভাবে বলে—"ঔষধ না—আমি গেলে ওদের দেখো"—বলিয়াই ভাবের আতিশয্যে লীলা অচেতন হইয়া পড়ে।

মৃত্যুর অপরিচিত পদধ্বনি—

আকাশে তারা জাগে—লীলা বেলফুলের কেয়ারি করিয়াছিল তাহার গন্ধ আসে—। তবু শঙ্কায় মন ভরে।

সুরেশের ব্যাকুল বেদনায় জগতের কোনই ব্যথা নাই। সে পিসিকে ডাকে। ধীরে ধীরে জীবন মিলাইয়া যায়।

জীবন্ত খোকা-খুকুর হাহাকার—কিন্তু লীলার শবদেহ নীরব ও নিঃসাড়।

(২)

রমেশ বলে "তোমার কাছে এ আশা করতে পারি নে ভাই—বৌদি মরতে না মরতে—"

সসঙ্কোচ প্রশ্ন। বন্ধুর মুখের দিকে উদাস দৃষ্টি ফেলিয়া সুরেশ বলে—"তা সত্য, কিন্তু···"

"কিন্তু কি?"

"আমার পাঁচ পাঁচটি ছেলেমেয়ে—এদের দেখে কে? পিসি ত বাড়ী যাওয়ার নুটিস দিয়েছেন—এখন উপায়?"

"উপায়ের কথা পরে ভাবব, কিন্তু তোমার কাছে—এটা কি প্রচণ্ড নির্ম্মমতা বলে মনে হচ্ছে না?"

সুরেশ চুপ করিয়া থাকে। বন্ধুর আনন্দ-ভাস্বর মুখের দিকে তাকায়, পরু বলে—"আমিও তোমার মত ভাবতাম, কিন্তু জান কি, সমস্তই একটা প্রচণ্ড তামাসা—"

"কি তামাসা?"

"সমস্তই—আমাদের কাব্য ও ধর্ম্ম, আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা—উদ্দেশ্যহীন সংগ্রামের মধ্যেই জীবনের চলা ফেরা—"

"তাহলে তুমি বিয়ে করছ?"

"করছি বই কি, খেতে পাবে না অথচ কেউ আশ্রয় দেবে না—পয়সার দাসদাসী ওদের দেখবে না—"

"তাই বিনা পয়সার দাসী আনতে যাচ্ছ—যে তোমার পদসেবাকে পুণ্য মনে করবে—এই ত?"

সুরেশ আস্তে আস্তে বলে—"রাগ করিস নে, জীবনকে তলিয়ে দেখলে তোর অনেক কাব্যই উল্টে যাবে। ফুল যে রূপ ও গন্ধ দেয়, সে মৌমাছিকে ভুলাবার জন্য—"

রমেশ বলে—"না, তুই পণ্ডিত, তোর সঙ্গে তর্কে পারব না—কিন্তু এ কাজ একান্ত পাশবিক বলে মনে হয়।"

সুরেশ বেদনা-বিহ্বল ধীরতায় উত্তর দেয়—"আমরা যে আদবেই পশু, সে কথা ভুললে চলবে কেন?"

"না আমি শুনতে চাই নে—পরলোক থেকে সতীলক্ষ্মী তাকিয়ে দেখবে—তার ঐকান্তিক ভালবাসার এই শেষ পরিণাম?"

"পরলোক, জানিস ভাই—ওটা মস্ত একটা ফাঁকি—!"

রমেশ লাফাইয়া ওঠে।

সুরেশ বলে—"আমি অনুভব করেছি। লীলার রোগ-শয্যায় যখন সেবার শ্রান্তি আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলছিল—আমি ওর মৃত্যু কামনা করছি—তখন স্বর্গ দেখতে পেলাম—"

রমেশের ঔৎসুক্য প্রকট হইয়া ওঠে।

"সত্য—একটুও মিথ্যে নয়। দুনিয়ায় জ্বালায় পরলোক একটা মিথ্যার প্রলাপ—"

"হয়েছে, আর নয়"—বলে রমেশ বিদায় লয়।

(৩)

বিবাহ হইয়াছে।

নববধূর নাম ক্ষমা। কিন্তু তার প্রকৃতি ঠিক উল্টা। পাঁচ পাঁচটির হাঙ্গামা মা-ই পোহাইতে পারে না—ক্ষমা না পারিলে দোষ দেওয়া যায় না।

মেয়েটি বড়, সেই ভাই বোনগুলিকে আগলায়।

সুরেশকে পুনরায় যৌবনের ভাণ করিতে হয়। অস্বচ্ছল সংসারেও প্রসাধন কিনিতে হয়।

কিন্তু কি উপায়?

ক্ষমার সাধ-আহ্লাদ ত আর শেষ হয় নাই।

তাই খিটিমিটি লাগে।

ছোট মেয়েটির জ্বর। অঘোর অচৈতন্য—

ক্ষমার সেদিকে দৃষ্টি নাই। অতি-দূর সম্পর্কের নিমাই আসিয়াছিল—তাহাকে লইয়া সে ফষ্টি নষ্টি করে।

সুরেশ আসিয়া দেখে। কলহের পঙ্কিল আবর্ত্ত জাগে।

মেয়েটি বিনা চিকিৎসায় ও বিনা শুশ্রূষায় যায়।

সুরেশ পারে না। অভাব ও অনাটন—রোগ, শোক ও দারিদ্র্য সবাই যেন তাহার পিছনে লাগিয়াছে।

তার উপর রূপসী পত্নীর জন্য হিংসা ও সন্দেহের দাবানল।

ক্ষয় অলক্ষ্যে কবে আরম্ভ হইয়াছিল কেহ জানে না। তিলে তিলে প্রাণশক্তিকে ধ্বংস করিয়া সে যেদিন প্রকট হইল, সেদিন যাহা কিছু পুঁজি ছিল তাহা চিকিৎসায় নিঃশেষ হইল।

তারপর একদিন যাহা ঘটে তাহাই ঘটিল। সুরেশ অতি নাবালক দুইটি ছেলে ও দুইটি মেয়ে এবং ভোগ-সমুৎসুক পত্নীকে রাখিয়া সংসার খেলায় বিদায় নিল।

নিঃসম্বল নিরুপায় সুরেশ ভবিষ্যতের জন্য কিছুই রাখিতে পারে নাই।

সুরেশের মৃত্যু তাই আকস্মিক না হইলেও অতি নিদারুণ দুর্দ্দৈবের মত দেখা দিল।

(৪)

সংসার যে কেবল নির্ম্মম তাহাই বা বলি কিরূপে। স্কুলের ছেলেরা শোক-সভা করিয়া নয় টাকা তের আনা চাঁদা তুলিয়া পাঠাইয়াছে। যে আনিয়াছিল সে চার আনা ভালমানুষি বলিয়া আদায় করিয়া নিয়া চলিল।

সংসারে সহানুভূতি আছে।

কিন্তু ক্ষমা—সে মনে করে এই জগৎ বিকট দৈত্যের বিকট অভিশাপ।

জীবনে আশা ও আনন্দের পুষ্প মুকুলিত হয় নাই।

বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা সে। কিন্তু সেখানে অধিকারের চেয়ে সে পাইয়াছে অভাবের লাঞ্ছনা।

তাহার সমস্ত অন্তর বিদ্রোহী হইয়া ওঠে।

পড়শীরা বলে—শ্রাদ্ধ কর। ঘটা করিয়া শ্রাদ্ধ না করিলে কি হয় কে জানে? সে দিন মাধু পিসী রাতে পথে ফিরিতে গা ছম ছম করিয়া ঘুরিয়া পড়িয়াছিল। আবছায়া—কিন্তু মাধু পিসি দিব্য করিয়া বলিয়াছে—"সে সুরেশের আবছায়া।"

পড়শীদের উপদেশ—উপদেশ নয়। আদেশের মত তাহাকে মানিতে হয়। দরিদ্রের যাহা কিছু ছিল তাহা দিয়া পরলোকগত আত্মার সদ্গতি করিতে হয়।

ক্ষমা জগার ঠাকুমাকে বলিয়াছিল—"কিন্তু আমরা খাব কি?"

জগার ঠাকুমা জবাব দিয়াছিল—"জীব দিয়েছেন যিনি—আহার দিবেন তিনি, তাই বলে কি সুরেশ জলবিন্দু না পেয়ে তৃষ্ণায় কাঠ হয়ে গাছে গাছে ঘুরে বেড়াবে?"

অকাট্য যুক্তি। তিলোৎসর্গ ও বৃষোৎসর্গ যথানিয়মে হয়।

ক্ষমার চোখে মৃত্যুর পর পড়ে অন্ধকার যবনিকা। সেখানে সে কিছুই দেখে না। তাহার প্রেম জন্মে নাই, কাজেই প্রেমের মিথ্যা কল্পনা দিয়া সে সুরেশের তৃষিত বেদনা অনুভব করিতে পারে না।

তথাপি যুগ-যুগান্তরের সনাতন সংস্কার—ঋষিদের কল্পিত সংস্কার—তাহাকে সে বিড়ম্বনা বলিবে কোন্ দুঃসাহসে। শ্রাদ্ধ হইল, কিন্তু তাহাদেরও শ্রাদ্ধের বাকি রহিল না কিছু?

(৫)

যিনি জীব দিয়াছেন তিনি আহার দেন কই, ছোট দুটি ছেলেমেয়েকে রমেশ নিয়া গিয়াছে।

বড় মেয়েটি, বড় ছেলেটি—আর ক্ষমা। কচুশাক আর ভাত—তাহাও জোটান দায় হইয়া ওঠে।

পরণের কাপড় জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া যায়। কাপড় নাই—বাহির হইবার উপায় কোথায়।

উপায়—ভিক্ষা বা দাসীত্ব। কোনটাই সুলভ নহে। প্রলোভন আসে।

কামনার।—আদিম কামনার, যে কামনা সমস্ত বুদ্ধিকে ব্যাহত করিয়া অপ্রতিহত হইয়া চলে—সেই জীবনের আকর্ষণ—ক্ষমার মনে সংস্কারের বেদনা জাগে।

অভাবের নির্ম্মম তাড়না সে বোধকে ক্ষীণ করে। লাঞ্ছনা আর কামনা তাহাকে যুগপৎ বিহ্বল করিয়া তোলে।

প্রলোভনই জয়লাভ করে।

প্রলোভনের পথ মসৃণ। ক্ষমা ভাসিয়া যায়।

গ্লানি আছে অবশ্য, কিন্তু হয়ত একটি আদিম পাশবিক আনন্দ আছে।

কথা কাণে কাণে প্রচার হইয়া পড়ে।

ক্ষমা ভাবে—আর ভাবে।

কেহ গালি দেয়।

"সে কেন গলায় দড়ি দিয়া মরে না?"—যে কোনও দিন ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে নাই—গালি দিবার সময় তাহার কণ্ঠই শতমুখ হইয়া ওঠে।

ক্ষমা কথা কহে না।

কি হইবে, কি করিবে কিছুই বুঝিয়া পায় না।

কুৎসার আক্রমণ সূক্ষ্ম, কিন্তু বেদনা অতি গভীর। ক্ষমা তাই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল।

বাড়ীতে একটি আমের গাছ ছিল। সেখানে সে গলায় দড়ি দিয়া মরিল।

ফাল্গুনের আম্রমুকুলের সৌরভ হয়ত তাহার জ্বালা জুড়াইল।

রাত্রে কেহ জানিল না।

ভোরের আলো জ্বলিল। দিকে দিকে জীবনের সাড়া জাগিল। ছেলে মেয়ে দুটি উঠিয়া ক্ষমাকে দেখিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"মা! মা!"

অতলস্পর্শ সে কান্না।

কেহ সে কান্না শোনে না—না শোনে দুঃখীর ভগবান, না শোনে সমাজ, না শোনে রাষ্ট্র।

দিগন্ত মুখর করিয়া সে কান্না বহিয়া চলে।

নিষ্পাপ, শুচি ওই শিশু দুইটির কান্নার উত্তর কে দেয়? ভাগ্য? দুর্দ্দৈব? বিধাতা—না শয়তান?

জীবনের রথ বহিয়া চলে—আশা, আলো ও আনন্দ জাগে। কিন্তু উহাদের কান্না থামে না—; আশাহীন—অনির্ব্বাণ—নিরুত্তর বেদনা; তবু রথ থামে না—সে চলে; কে পিষ্ট হইল, কে আশ্রয় পাইল—রথ তাহা দেখে না।

জোনাকীর জন্মকথা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

'জোনাকি পোকা' না ব'লে 'জোনাকী' বললুম এই—জন্য যে 'পোকা' 'মাকড়' আখ্যাগুলোর মধ্যে কেমন যেন একটা হেয় এবং অশ্রদ্ধেয় ভাব উঁকি মারে। অথচ, আমাদের ভাষার এমনই মারপ্যাঁচ যে, ঐ 'পোকা' কথাটুকু বাদ দিলেই কেবলমাত্র 'জোনাকী' শব্দটি বেশ একটু মধুর, রহস্যময়, কৌতূহলোদ্দীপক এবং মর্য্যাদা-সম্পন্ন হয়ে ওঠে!

অবশ্য সংস্কৃতভাষায় জোনাকীর অসংখ্য ভাল ভাল নাম আছে—যেমন খদ্যোত, খদ্যোতিকা, দীপমক্ষিকা, জ্যোতিরিঙ্গল, প্রভাকীট, কীটমণি ইত্যাদি। কিন্তু পাড়ার পরিচিত ছেলে পটলার নাম প্রদ্যোতকুমার ব'ললে যেমন তাকে আমরা চিনতে পারি নি তেমনি সর্ব্বজানিত জোনাকীর কোন পোষাকী নাম এখানে ব্যবহার না করাই বোধ হয় ভাল।

আমাদের অতিপ্রাচীন মহাবৃদ্ধ প্রপিতামহদের আমলে নাকি বিষধর ভুজঙ্গ পর্য্যন্ত 'পোকা' ব'লেই গণ্য হ'ত। অর্থাৎ, যে কোন সরীসৃপজাতীয় প্রাণী মাটীতে মুখ থুবড়ে বুকে হেঁটে চ'লত—তারা যত বড় বা যত ছোটই হোক্ না, সাবেক কালের কর্ত্তারা তাদের ঘৃণাভরে 'কীট' ব'লেই উল্লেখ ক'রতেন। কাজেই, 'গুটিপোকা' 'শুঁয়ো-পোকা' থেকে সুরু ক'রে বৃশ্চিক ও সর্প পর্য্যন্ত সকল সরীসৃপই 'কৃমিকীটের' ন্যায় একটা হীনজাতির অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে পড়েছিল।

'জোনাকী'কে তাচ্ছিল্যভরে আমরা 'পোকা' বলে উল্লেখ করি বটে, কিন্তু, প্রাণীতত্ত্ববিদেরা বলেন—'জোনাকী' কীট বা সরীসৃপ নয়। ওরা 'ফড়িং' বা 'পতঙ্গ' শ্রেণীভুক্ত! অবশ্য, একথা ঠিক যে স্ত্রী-জোনাকীর দল, যাদের আলোর দীপ্তিই সব চেয়ে বেশী, তাদের আকৃতি কিন্তু মোটেই পতঙ্গ-সদৃশ নয়! কারণ তাদের পৃষ্ঠদেশে পক্ষপুট তো নেইই—এমন কি পাখ্না ঢাকা এক জোড়া শক্ত খোলাও তাদের পিঠে নেই, সেটা সাধারণতঃ এই জাতীয় পতঙ্গদের একটা প্রধান বিশেষত্ব!

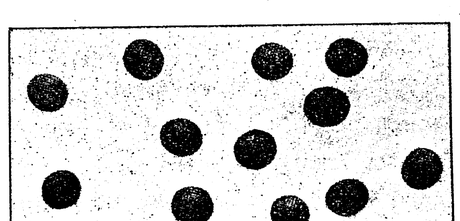

জোনাকীর ডিম—(চিত্রে স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে আট গুণ বড় ক'রে দেখান হয়েছে। প্রত্যেক ডিমটি সৌরলোকের জ্যোতিষ্কের মতই জ্বল্ জ্বল্ করে)

চৈতালী সন্ধ্যায় গ্রাম্যপথে তরুকুঞ্জের পত্রপুঞ্জ ঘিরে লক্ষ লক্ষ দীপকণার সেই রহস্যময় সন্ধ্যারতি আমরা অনেকেই মুগ্ধনয়নে চেয়ে দেখেছি। হয়ত' কত কৌতূহলোচ্ছলা তরুণী তাঁদের অঞ্চল ফাঁদে এই চঞ্চল-দ্যুতি

পতঙ্গদের বন্দী ক'রে আনন্দ পেয়েছেন, কত না অনুসন্ধিৎসা-ব্যাকুল বালক ঐ আলোক-কণার রহস্য উৎস সন্ধান ক'রে

শৈশবকোষে জোনাকী—
(ডিম ফুটে জোনাকীর
বাচ্ছা এই কৃমি সদৃশ
আকারে বেরিয়ে
আসে।
ছবিতে
স্বাভাবিক
আকৃতির চার গুণ
বড় করে দেখান হয়েছে)

ফিরেছে! কিন্তু একথা বোধ হয় জোর ক'রেই বলা যেতে পারে যে তাদের মধ্যে অতি অল্প জনেই জানে—স্ত্রী-জোনাক ও পুং জোনাকের পূর্ণ পরিচয়। অথচ এ পরিচয় পাওয়া এমন কিছু দুরূহ বা দুঃসাধ্য নয়। জোনাকীবহুল স্থানে যাঁরা বাস করেন তাঁরা যদি সন্ধ্যা রাত্রে বাতায়ন উন্মুক্ত রেখে গৃহকোণে একটি দীপ জেলে দেন, ক্ষণকালের মধ্যেই তাঁদের কক্ষাভ্যন্তরে শ্রীযুক্ত জোনাক মহাশয় এসে প্রবেশ করবেন। কিছুক্ষণ তিনি দীপের চারিধারে উড়ে উড়ে নৃত্য ক'রে যখন ক্লান্ত হ'য়ে বিশ্রাম নেবেন, সেই সুযোগে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়া অত্যন্ত সহজ।

পরিণতদেহা স্ত্রী-জোনাকের আলোর দীপ্তিই যদিও সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখায়, তাহ'লেও আলোর অস্তিত্ব এই পতঙ্গের অঙ্গে সকল অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকে। এমন কি ডিম্বাকারে সবে মাত্র যখন তারা ভূমিষ্ঠ হয়, তখনই সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার ডিমগুলির ভিতর থেকেই মৃদু আলোক রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। শ্রাবণ আরম্ভেই জোনাকীরা ডিম পাড়তে সুরু করে; ভাদ্রের মাঝামাঝি ডিমগুলি ফুটে কৃমির মত ক্ষুদ্র বাচ্ছা হয়। এই বাচ্ছাগুলাও অল্প একটু আলো দেখিয়ে ঝিকমিক্ করে। পক্ষোদ্গমের পূর্ব্বাবস্থা পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে এদের অবয়ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আলোর জ্যোতিও বাড়তে থাকে।

আমরা অনেকেই হয়ত জানি নি যে গেঁড়ি গুগ্‌লি শামুকের আজীবনের শত্রু হ'চ্ছে জোনাকী পোকা। এদের অস্থিহীন দেহের সুকোমল মাংসপিণ্ডই জোনাকীর জীবন-ধারণের একমাত্র সম্বল! এ ছাড়া অপর কিছু খাদ্য তাদের নেই! কিন্তু শামুকের মত অতিমাত্রায় স্পর্শ-সচেতন প্রাণীকে আয়ত্ত করা জোনাকীর পক্ষে যে কতদূর কঠিন কাজ এটা সহজেই অনুমেয়। একটা সরু সুতার ঈষৎ ছোঁয়া লাগলেই যে শামুক বিদ্যুৎবেগে তার খোলের মধ্যে ঢুকে আত্মগোপন করে, তাকে ভক্ষ্যরূপে ব্যবহার করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু জোনাকী ডিম ফুটে বেরুতে না বেরুতেই এই অসাধ্যসাধনে আত্মনিয়োগ করে। শামুকের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে তারা প্রায় আধখানা খোলের মধ্যে ঢুকে পড়ে। শামুক তখন নিজের খোলের মধ্যে বন্দী, বেরুবার উপায় নেই! জোনাকীর বাচ্ছারা তাকে কোনঠাসা ক'রে তাদের আহার-পর্ব্ব সুরু ক'রে এবং শামুকের খোলাটি নিঃশেষে চেঁচে খেয়ে—তবে ছেড়ে দেয়। অসংখ্য শূন্য শামুকের খোল যা আমরা ঘাটের ধারে পুকুর পাড়ে বেড়ার পাশে দেখতে পাই, তার প্রত্যেকটির এই শোচনীয় পরিণামের জন্য জোনাকীরাই সম্পূর্ণ দায়ী। যে সব শামুকের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে তাদের খোলটি নিঃশেষ করে পিপীলিকার দল।

জোনাকীর অঙ্গে আলো জ্বলে কেন? সে

কৈশোর কোষে জোনাকী—
শৈশব কোষ বর্জ্জন ক'রে
বেরিয়ে আসে জোনা-
কীর বাচ্ছা এই
কৈ শো র-কো ষে র
আ কা রে। এটি পুং
জোনাকের কোষ—কারণ
কাঁধে ডানার কাঠাম রয়েছে)

আলো সম্ভব হয় কেমন ক'রে? এ প্রশ্নের আজও কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় নি। অনেকেই অনেক

রকম ব'লেছেন বটে, কিন্তু তার কোনটাই সঠিক ব'লে মেনে নেওয়া চলে না। প্রাণী ও উদ্ভিদ রাজ্যে যেখানেই মানুষ কোন কিছুর মধ্যে আলোক বা একটা দীপ্ত দ্যুতি বিকীর্ণ হ'তে দেখেছে সেখানেই তারা সেটাকে স্ফুরক-প্রভা (Phosphorescence) ব'লে ব্যাখ্যা ক'রতে চেষ্টা করেছে; কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান অধ্যুষিত যুগে ওটা নিশ্চয়রূপে গ্রাহ্য হয় নি। প্রাণী বা উদ্ভিদের এই দীপ্তি বা জ্যোতির যথার্থ কারণ নির্ণয়ের জন্য এখনও অনুসন্ধান চলেছে। এই আলোকের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কেউ কেউ অনুমান করেন যে পক্ষযুক্ত পুরুষ জোনাকীরা যাতে পক্ষহীন স্ত্রী জোনাকীদের সহজেই খুঁজে নিতে পারে, তারই জন্য এই আলোর ব্যবস্থা। হ'তে পারে হয়ত এ একটা কারণ, কিন্তু সেটাই যে মুখ্য উদ্দেশ্য নয়—তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হ'চ্ছে জোনাকীর ডিমের ভিতরেও আলো জ্বলে কেন? কৃমির মত ক্ষুদ্র বাচ্ছাগুলারও এ আলো বয়ে বেড়াবার সার্থকতা কি? তা'ছাড়া প্রাণী-তত্ত্ববিদেরা এটা বেশ নিশ্চিতরূপেই জানতে পেরেছেন যে এদের স্ত্রীপুরুষের মিলন ব্যাপারে আলোকের সাহায্য যতটা প্রয়োজন না হোক্ এদের পরস্পরের গায়ের গন্ধের আকর্ষণই এদিক দিয়ে বেশী কাজ করে। তাঁরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে একটা স্ত্রী জোনাককে টেবিলের উপর ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে রাখলেও একাধিক পুরুষ জোনাকের কাছে তার অস্তিত্ব অগোচর থাকে না এবং তারা এসে ঠিক সেই জায়গায় ঘুরে বেড়ায়! সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে নারী জোনাকের অঙ্গসৌরভেই পুরুষ জোনাক আকৃষ্ট হয় বেশী!

স্ত্রী জোনাকের আকৃতি জোনাকের বাচ্ছাঅবস্থার সেই কৃমি-সদৃশ সৌষ্ঠবেরই হুবহু অনুরূপ। প্রভেদের মধ্যে তারা কেবল অপেক্ষাকৃত বড় দেখতে! জোনাক বাচ্ছার আকৃতি অবিকল শূঁয়া-পোকার মত। তফাতের মধ্যে কেবল যা একটু বেঁটে এবং গায়ে রোঁয়া নেই। নইলে, ঠিক সেই তাদের মতই পাকানো-পাকানো গোল গোল টুক্‌রো টুক্‌রো স্তরবিভক্ত শরীর, যেন কে টুকরোগুলো জোড়া লাগিয়ে ছেড়ে দিয়েছে! কাজেই, এরা দেহটাকে যে ভাবে ইচ্ছা সঙ্কুচিত ও প্রসারিত ক'রতে পারে এবং যে দিকে ইচ্ছা অনায়াসে বেঁকাতে পারে। এই শরীরের উর্দ্ধাংশের দুপাশে এদের তিন জোড়া পা আছে। এই জাতীয় সমস্ত কীট পতঙ্গরাই প্রায় দেখা যায় ষট্‌পদ! শরীরের নিম্নাংশ থেকে বাচ্ছা জোনাকরা ইচ্ছা করলেই একগোছা সাদা লম্বা ছুঁচলো শুঁড় বার করতে পারে। এই শুঁড়ের গোছা ঝাড়ু বা ব্রাশের কাজ করে। জোনাকীর জীবনে এই শুঁড়ের গুচ্ছ দিয়ে তাদের যুগ্ম প্রয়োজন সাধিত হয়। প্রথমতঃ এদের দ্বারা আক্রান্ত গেঁড়ি শামুকরা যখন আত্মরক্ষার জন্য এদের গায়ে একরকম চট্‌চটে আঠা নিক্ষেপ ক'রে—তখন এরা ঐ শুঁড়ের গোছা বার ক'রে তার সাহায্যে সেই আঠা পরিষ্কার ক'রে ফেলে। আবার এই

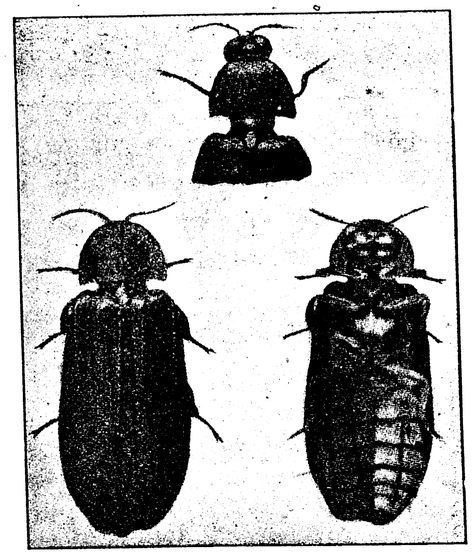

পুং জোনাকী—(কৈশোর-কোষও বর্জ্জন ক'রে বেরিয়ে এসে পুং জোনাকী এই বিচিত্র রূপান্তর গ্রহণ ক'রে) উপরে মুণ্ড, (বাহির করা অবস্থা)
বামে—কঠিন আবরণে আবৃত পক্ষ
—পূর্ণাবয়ব জোনাক। দক্ষিণে—
জোনাকের বুক পেট ও
পশ্চাদ্দেশ এবং
প্রান্তদীপ!)

শুঁড়ের গোছার সাহায্যেই জোনাকীর বাচ্ছারা গেঁড়ি ও শামুকের মসৃণ ও পিচ্ছিল খোলের উপর হামাগুড়ি দিয়ে

উঠতে পারে! খো'ল থেকে শামুক তার দেহটি যেই বার ক'রে—অমনি পৃষ্ঠারূঢ় জোনাকীর বাচ্ছারা পিছন থেকে তাকে আক্রমণ করে! তিন জোড়া সূক্ষ্ম পা নিয়েও সে

স্ত্রী জোনাকী—(স্ত্রী-জোনাকের পক্ষ নেই এবং আকারেও তারা শৈশব কোষের মূর্ত্তি থেকে যে খুব বেশী রূপান্তরিত হয়, তা নয়। স্ত্রী-জোনাকের লাঙুল প্রান্তেও দীপ এবং পুং জোনাকী অপেক্ষা তার জ্যোতি উজ্জ্বলতর)

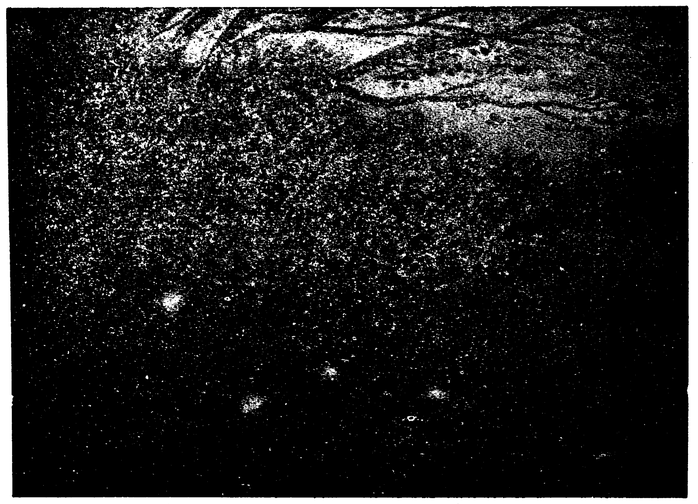

জোনাকীর আলো—(সন্ধ্যার অন্ধকারে অরণ্য প্রান্তে জ্বলে উঠেছে জোনাকীর রহস্যময় দীপ!)

শামুকের মসৃণ খোলের উপর চড়তে পারে না। এই শুঁড়ের গুচ্ছ না থাকলে তারা শামুকের একটুখানি গা ঝাড়াতেই খোলের উপর থেকে এক মুহূর্ত্তে পিছলে বা হড়কে নীচেয় পড়ে যেত। জোনাকীর বাচ্ছাগুলোর মুখু দেখতে পাওয়া যায় কেবল খাবার সময়! নইলে অন্য সময় তারা মুখটা শরীরের প্রথম স্তরের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে পড়ে থাকে। বাইরে থেকে দেখা যায় না।

বাচ্ছা জোনাকী ক্রমে যখন বড় হয়, তাদের পূর্ণ পরিণতি লাভের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বাবস্থায়—অর্থাৎ পক্ষোদ্গমের আগে তারা কিছুদিন একেবারে নিষ্ক্রিয় হ'য়ে পড়ে। শরীরটাকে যথা-সম্ভব গুটিয়ে নিয়ে তারা পাশ ফিরে বা কাত হ'য়ে শুয়ে থাকে। সেই সময় তা দে র সেই শিশুকোষের (Grub skin) চামড়া পাশ থেকে ফাট্‌তে সুরু হয় এবং ধীরে ধীরে তাদের সেই কৃমি আবরণ বা শিশুকোষ খসে গিয়ে তারা এক নূতনরূপ লাভ করে। অবশ্য এই রূপান্তরের জন্য তাদের রীতিমত পরি-শ্রম করতে হয়। চামড়া ফাটতে সুরু হ'লেই তারা অনবরত সমস্ত শরীরটা সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করতে থাকে এবং সেই আক্ষেপের ফলে তাদের কৃমি খোলাটা খ'সে পড়ে ও তারা সেই শিশুকোষ থেকে নব কলেবরে বেরিয়ে আসে। কিন্তু সেটাও তাদের পূর্ণ অবয়ব নয়; সেটাকে তাদের কৈশোর-কোষ (chrysalis stage) বলা যেতে পারে। কারণ তখনও তাদের পাখনা এবং তার ঢাকনা দেখা যায় না। তা'ছাড়া পক্ষোদ্গমের পূর্ব্বে এদের স্ত্রী-পুরুষের কোন যৌন প্রভেদও চ'খে পড়ে না। পক্ষোদ্গমের পর তবেই এদের স্ত্রী ও পুং চিহ্ন লক্ষ্যগোচর হয়। তবে স্ত্রী জোনাকদের পাখা হয় না এবং পুরুষ জোনাকদের পাখা থাকে—এই একটা স্থূল পার্থক্য থাকায় পক্ষোদ্গমের

পূর্ব্বাবস্থাতেও অর্থাৎ কৈশোর-কোষেও এদের স্ত্রীপুরুষ ভেদ সহজেই ধরতে পারা যায়; কেন না, পাখনা না গজালেও তার একটা কাঠামো পুরুষ জোনাকদের কৈশোর কোষাবয়বে সংলগ্ন আছে দেখা যায়।

পাখনা সম্পূর্ণভাবে গজাতে মাত্র দিন পনের সময় লাগে এবং এই পনেরদিনের মধ্যে তাদের কৈশোর কোষাবয়বের অভ্যন্তরেও আর একটা বিরাট পরিবর্ত্তন চলতে থাকে। আর একবার তাদের এই দ্বিতীয় খোলসটাও অর্থাৎ কৈশোর-কোষ বিদীর্ণ হ'য়ে যায় এবং তার ভিতর থেকে এবার পূর্ণাবয়ব জোনাকী আবির্ভূত হয়।

পূর্ব্বেই বলেছি যে কৈশোর কোষস্থ পুরুষ জোনাকের সঙ্গে একজোড়া পক্ষপুটের কাঠাম থাকে। এদের যে পরিবর্ত্তন ঘটে তা যথার্থই বিচিত্র। এরা বেরিয়ে আসে একেবারে একজোড়া সূক্ষ্ম পেলব পক্ষপুট ও তার উপরের কঠিন আবরণে তাদের কোমল অঙ্গটি আবৃত ক'রে। অনেকে হয়ত মনে করবেন পাখনার উপর আবার একজোড়া এই ঢাক্‌নার প্রয়োজন কি ছিল? ওটা নেহাৎ বাহুল্য মাত্র! কিন্তু এদের সেই অতি সূক্ষ্ম পেলব পক্ষদ্বয় যাঁরা একটু মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করবেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন যে একে অক্ষতভাবে রক্ষা ক'রতে হ'লে একজোড়া পুরু শক্ত ঢাকনা একেবারে অত্যাবশ্যক, নচেৎ সামান্য আঘাতেই তা ছিন্ন হ'য়ে যেতে পারে। ভগবানের সৃষ্ট এই বিচিত্র জগতে পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, মানুষ ও কীটপতঙ্গ কোন কিছুরই অনাবশ্যক বাহুল্য এতটুকু নেই। যার যা আছে তার সব কিছুরই এক একটা উদ্দেশ্য, প্রয়োজন ও নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে। স্ত্রী-জোনাকের আকার বড় হওয়া ছাড়া তার গঠনের আর বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যায় না।

জোনাকীর অঙ্গে আলো থাকা সত্ত্বেও সে কেন আলোর দিকে ছুটে আসে? এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদয় হ'তে পারে। প্রাণীতত্ত্ববিদেরা বলেন এর কারণ আর অন্যকিছুই নয়, দীপ্ত আলো দেখে নির্ব্বোধ পুরুষ-জোনাকেরা তাকে কোন অসামান্যা রূপসী স্ত্রী জোনাকী মনে ক'রে তার সঙ্গলাভের জন্য ছুটে আসে এবং বহুক্ষণ তার চারপাশে নৃত্য ক'রে তার মন হরণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। কিন্তু দীপের আলো সে প্রেম নিবেদনের কোনই প্রত্যুত্তর দেয় না। জোনাকী তখন ক্লান্ত হ'য়ে ভূমিতল আশ্রয় করে এবং হয়ত তাদের এই ভুলের জন্য মনে মনে অনুতাপও করে!

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা সহরে যে পরিবারটি গত শতাধিক বৎসর কাল বিদ্যা ও অর্থগৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া সমগ্র বাঙ্গালার—এমন কি সমগ্র ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, যে বংশে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার পঙ্ক হইতে জাতিকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, যে বংশের তিলকস্বরূপ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে আজিও সমগ্র জগতের নিকট ভারতের স্থান অম্লান করিয়া রাখিয়াছেন, এবার আমরা প্রচ্ছদপটে সেই বংশের এক উজ্জ্বলরত্ন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চিত্র প্রকাশ করিলাম। ইতিপূর্ব্বে ১৩৩১ সালের মাঘ মাসে 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদপটে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবং ১৩৩৯ সালের পৌষ মাসে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র। মহর্ষির ৯ পুত্র ও ৪ কন্যা প্রায় সকলেই কোন না কোন ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলেও প্রসিদ্ধ দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী দেবীর নাম বাঙ্গালীমাত্রেরই নিকট সুপরিচিত।

১২৫৫ সালের ২২শে বৈশাখ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম হয়। সে সময়ে ইহাঁদের বাড়ীতে একটি পাঠশালা ছিল; তথায় এক গুরুমহাশয়ের নিকটেই সকলকে বিদ্যারম্ভ করিতে হইত।

তাহার পর বাড়ীতে মাষ্টারের নিকট ইংরাজি পড়া আরম্ভ হয় ; সে সময়ে তাঁহার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ তাঁহার অভিভাবক হন ; হেমেন্দ্রবাবু জ্যোতিবাবুকে মুগুর-ভাঁজা, ডন-ফেলা প্রভৃতি অনেক রকম ব্যায়াম অভ্যাস করাইতেন এবং ক্রীড়াচ্ছলে তাঁহাকে সন্তরণ-বিদ্যাও শিখাইয়াছিলেন। বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে বাড়ীতে এইরূপে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন ; প্রথমে সেণ্ট পল্‌স স্কুল, তাহার পর মণ্টেগুর একাডেমী ও তাহার পর হিন্দু স্কুল। স্কুলের শিক্ষার প্রতি জ্যোতিবাবুর একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল ; স্কুলের পড়ায় তিনি একেবারেই মন দিতে পারিতেন না। তিনি যে সময়ে হিন্দু স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র, তখন তাঁহার উপনয়ন হয় ; সে সময়ে তিনি ক্লাসে বসিয়া ছবি আঁকিতেন ; একবার তিনি মাষ্টার জয়গোপাল শেঠের যে ছবি আঁকিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের সহিত লর্ড সিংহের পিতৃব্য প্রতাপনারায়ণ সিংহের মণিরামপুরস্থ বাড়ীতে যাইয়া প্রতাপবাবুর একখানা ছবি আঁকিয়াছিলেন ; সকলেই মুক্তকণ্ঠে বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অঙ্কন-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়াছিল।

বাল্যকালে জ্যোতিবাবু একবার সত্যেন্দ্রনাথের সহিত কৃষ্ণনগরে সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের বাড়ীতে যাইয়া কিছুদিন তথায় বাস করিয়াছিলেন।

শৈশবাবস্থাতেই তিনি নিজেদের অভিনয়ের জন্য একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন ; পুরাতন "সংবাদ প্রভাকর" হইতে কতকগুলি কবিতা জোড়াতাড়া দিয়া এই "অদ্ভুত নাট্য" পুস্তক খাড়া করা হইয়াছিল। মনোমোহন ঘোষ মহাশয় সে সময়ে তাঁহাদের বাড়ীতেই বাস করিতেন ; তথনই রাষ্ট্রীয় উন্নতিসাধনের দিকে তাঁহার প্রবল ঝোঁক ছিল এবং সে উদ্দেশ্যে তিনি মহর্ষির অর্থসাহায্যে "ইণ্ডিয়ান মিরার" নামক একখানি ইংরাজি সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।

হিন্দু স্কুল হইতে জ্যোতিবাবু ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত 'কলিকাতা কলেজ' নামক স্কুলে ভর্ত্তি হন ও সেখান হইতে এণ্ট্রাস পরীক্ষা পাশ করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। কলেজে বিহারীলাল গুপ্ত ও রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। স্কুলে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ডবলিউ, সি, ব্যানার্জ্জির পিতৃব্য ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত প্রভৃতি শিক্ষকদিগের নিকট তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। কলেজে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির নিকট তাঁহাকে থড়িতে হইয়াছিল। কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পাঠ শেষ করিবার পর তিনি ফি জমা না দিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বোম্বায়ে পলাইয়া গিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তখন সিভিল সার্ভিস পাশ করিয়া আসিয়া বোম্বায়ে কার্য্য করিতেছিলেন। বোম্বাই অবস্থানকালে জ্যোতিবাবু সেতার বাদ্য শিক্ষা করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কৃষ্ণবিহারী সেন, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কে লইয়া একটি নাট্য-সমিতি গঠন করেন এবং মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী নাটকে নিজে জননীর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। পরে 'একেই কি বলে সভ্যতা' নাটকে জ্যোতিবাবু সার্জ্জেন সাজিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাট্য-সমিতির অনুরোধে 'কুলীনকুল সর্ব্বস্ব'-রচয়িতা পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় 'নবনাটক' রচনা করিয়া দিয়া ৫ শত টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। ঐ নাটকখানি দর্শকগণকে এত মোহিত করিয়াছিল যে তাঁহাদের অনুরোধে একাধিক রজনী 'নবনাটক' অভিনীত হইয়াছিল।

যে সময়ে নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনুকূল্যে বঙ্গদেশে প্রথম হিন্দুমেলা নাম দিয়া জাতীয় শিল্পপ্রদর্শনী হয়, তখন জ্যোতিবাবু জাতীয় ভাবের কবিতা লিখিয়া তথায় পাঠ করিয়াছিলেন।

'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নামক একখানি প্রহসন রচনা করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন ; ইহাই তাঁহার রচিত সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ। ন্যাশান্যাল থিয়েটারে বইখানি অভিনীত হইয়াছিল।

জ্যোতিবাবু স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন ; গঙ্গার ধারে কোন বাগানবাড়ীতে সস্ত্রীক অবস্থানকালে তিনি নিজের স্ত্রীকে নিজেই অশ্বারোহণ শিখাইয়াছিলেন ; তাহার পর দুইটি আরব ঘোড়ায় দুইজনে পাশাপাশি চড়িয়া জোড়াসাঁকোর বাড়ী হইতে গড়ের মাঠ পর্য্যন্ত প্রত্যহ বেড়াইতে যাইতেন ও ময়দানে যাইয়া দুইজনে সবেগে ঘোড়া ছুটাইতেন।

জমীদারী পরিদর্শন উপলক্ষে কটকে যাইয়া বাসকালে তিনি 'পুরুবিক্রম' নামক নাটক রচনা করেন ; তাহা গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটার ও বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইত। কটক হইতে কলিকাতা আসিয়া জ্যোতিবাবু 'সরোজিনী' রচনা করেন। কলিকাতার সাধারণ থিয়েটারে বইখানি অভিনীত হইলে নাট্যকার বলিয়া জ্যোতিবাবুর খ্যাতি রটিয়া গিয়াছিল।

তিনি 'মানভঙ্গ' নামক যে গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলেন 'ভারত সংগীত সমাজ' স্থাপনের পর পরিবর্ত্তিত করিয়া 'পুনর্বসন্ত' নামে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে 'কালমৃগয়া' অভিনয়কালে জ্যোতিবাবু দশরথের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় তিনি কোন পাঠ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার উপর সঙ্গীত ও কনসার্টের ভার ছিল।

অন্যান্য ঝোঁক গিয়া কিছুদিন জ্যোতিবাবুর শিকারের ঝোঁকটাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতি রবিবারে সদলবলে তিনি শিকারে বাহির হইতেন। শিকারের জায়গা ছিল ধাপার মাঠ। বাঙ্গালীদের মধ্যে সৎসাহস বর্দ্ধিত করিবার জন্য তিনি বন্দুক-ছোঁড়া ও শিকারের প্রবর্ত্তন করিতে গিয়াছিলেন।

জ্যোতিবাবুর উদ্যোগে কলিকাতায় 'সঞ্জীবনী-সভা' নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। জাতীয় হিতকর ও উন্নতিকর সমস্ত কার্য্য করাই সভার উদ্দেশ্য ছিল—বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু সভার অধ্যক্ষ ছিলেন। সভা হইতে সার্ব্বজনিক একটি পোষাক চালাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। শিল্প বাণিজ্যের প্রসার উদ্দেশ্যে সভার উদ্যোগে সর্ব্বপ্রথম দেশালাইএর একটি কল প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক আয়াসে ও বহু অর্থব্যয়ে কয়েক বাক্স দেশলাই প্রস্তুত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা সাধারণের পক্ষে ক্রয়সাধ্য বা ব্যবহারোপযোগী হয় নাই। সভায় এক নূতন কাপড়ের কল আনা হইয়াছিল। একখানি গামছা ছাড়া ঐ কলে আর কিছুই প্রস্তুত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ যখন 'বালক' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন তখন জ্যোতিবাবু তাহাতে মুখ-সামুদ্রিক (Physiognomy) ও শির-সামুদ্রিক (Phrenology) সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

ইহার পর জ্যোতিবাবু আর একটি সভা স্থাপন করেন। দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিসাধনের জন্য তাহা স্থাপিত হয় নাই—বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। সভার নাম হইল– "কলিকাতা সারস্বতসম্মিলনী"। সভার উদ্দেশ্য ছিল তিনটি—(১) বঙ্গভাষার অভাব মোচন (২) বঙ্গীয় গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিসাধন ও উৎসাহবর্দ্ধন (৩) বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগীদিগের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্দ্য স্থাপন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় সভার প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন—কিছুদিন পরে সভা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

জ্যোতিবাবু মধ্যে মধ্যে পাবনা ও কুষ্ঠিয়া অঞ্চলে জমীদারী দেখিতে যাইতেন ও শিলাইদহের কুঠীতে বাস করিতেন। সে সময়ে প্রায়ই তিনি পাখী শিকার করিয়া আত্ম-বিনোদন করিতেন।

এই সময়ে জ্যোতিবাবু হাটখোলায় এক পাটের আড়ত খুলিয়াছিলেন। অংশীদার ছিলেন—তাঁহার ভগিনীপতি জানকীনাথ ঘোষাল। দুইজনে প্রতিদিন সকালে হাটখোলায় গিয়া অফিস করিতেন, কিন্তু পাটের বাজার খারাপ হওয়ায় ঐ কাজ বন্ধ করিতে হয়। ব্যবসায়ে যে লাভ হইয়াছিল সেই টাকা লইয়া জ্যোতিবাবু শিলাইদহে নীলের চাষ আরম্ভ করেন। নীলেও বেশ লাভ হইয়াছিল ; কিন্তু জার্ম্মাণী হইতে কৃত্রিম নীল আমদানী হওয়ায় এদেশে নীলের বাজার খারাপ হইয়া যায় ও জ্যোতিবাবু টাকা লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন।

এই সময়ে কলিকাতা হইতে খুলনা পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। জ্যোতিবাবু সরোজিনী, বঙ্গলক্ষ্মী, স্বদেশী, ভারত ও লর্ড রিপন নামক ৫খানি জাহাজ ক্রয় করিয়া খুলনা হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত যাত্রী বহনের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। সময় সময় জাহাজগুলি মাল লইয়া কলিকাতায় আসিত। ঐ সময়ে তিনি জাহাজেই বাস করিতেন। প্রথম প্রথম বরিশালবাসীরা স্বদেশী কোম্পানীর ষ্টীমারেই চড়িত। কিন্তু একটি বিদেশী কোম্পানীর জাহাজ যাইয়া তথায় প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিল—ফলে ভাড়া কমিয়া যাওয়ায় উভয় পক্ষেরই লোকসান হইতে লাগিল। সেই সময়ে জ্যোতিবাবুর একখানি মালপূর্ণ জাহাজ কলিকাতার গঙ্গায় ডুবিয়া যায়—তাহাতে তিনি হতাশ

হইয়া পড়েন ও রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে ৪খানি জাহাজ ও কোম্পানীর সকল সরঞ্জাম বিদেশী কোম্পানীকে বিক্রয় করিয়া ফেলেন। ঐ সময়ে সার তারকনাথ পালিত মহাশয় জ্যোতিবাবুর সব পাওনাদারকে ডাকিয়া ঋণ মিটাইবার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে ঋণমুক্ত করিয়া দিয়া প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা দেশে সঙ্গীতশিক্ষা, সঙ্গীতঅধ্যাপনা, তাহার প্রচার এবং বাঙ্গালার অভিজাত ও মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন উদ্দেশ্যে জ্যোতিবাবু কলিকাতায় চাঁদা সংগ্রহ করিয়া 'ভারতসঙ্গীতসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। সঙ্গীত সমাজের সহিত জ্যোতিবাবুর সম্বন্ধ যখন খুব ঘনিষ্ঠ, তখন দোয়ার্কিন-দিগের ব্যয়ে 'বীণাবাদিনী' নামে তিনি সঙ্গীতবিষয়ক একখানি মাসিকপত্র সম্পাদন করেন—বৎসর দুই চলিয়া উহা বন্ধ হইয়া যায়। পরে ত্রিপুরার মহারাজা রাধা-কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের অর্থসাহায্যে জ্যোতিবাবু 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' নামে সঙ্গীতবিষয়ক আর একখানি মাসিকপত্র বাহির করেন। মহারাজা বাহাদুরের মৃত্যুর পর ঐ কাগজও বন্ধ হইয়া যায়।

মধ্যে তিনি আবার কিছুদিন বোম্বায়ে সত্যেন্দ্রনাথের নিকটে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন। তথায় তিনি মারাঠি ভাষা শিক্ষা করেন এবং 'ঝাঁসির রাণী' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তথায় তিনি 'হিতে-বিপরীত' নামক একখানি ক্ষুদ্র নাটকও রচনা করিয়াছিলেন।

সহজ ও সরল প্রণালীতে কিরূপে গানের স্বরলিপি লিখিত হইতে পারে সেইদিকে জ্যোতিবাবুর দৃষ্টিই প্রথম আকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রথম প্রথম-'ভারতী'তে তিনি সংখ্যামাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি প্রকাশ করিতেন। পরে তাহা অপেক্ষা সহজ, সরল ও শিক্ষার্থীর বোধগম্য করিবার জন্য তিনি আকার-মাত্রিক স্বরলিপি আবিষ্কার করেন। সে গুলি ঐ সময়ে 'সাধনা'তে প্রকাশিত হইত। এই শেষোক্ত পদ্ধতিই এখন সর্ব্বসাধারণে গৃহীত ও প্রচলিত।

সঙ্গীত সমাজের সংস্রবে থাকিতে থাকিতেই তিনি সংস্কৃত নাটকগুলিকে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া ফেলেন। ১৮০৬ হইতে ১৩১১ সালের মধ্যেই যথাক্রমে "অভিজ্ঞান-শকুন্তলা" (১৩০৬), 'উত্তর চরিত', 'মুদ্রা-রাক্ষস', 'রত্নাবলী' 'মালতী মাধব' (১৩০৭), 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়', 'বেণী সংহার', 'মহাবীর চরিত', 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'বিক্রমোর্ব্বশী', 'চণ্ড-কৌশিক' (১৩০৮), 'নাগানন্দ' (১৩০৯) 'বিদ্ধশাল-ভঞ্জিকা' 'ধনঞ্জয়-বিজয়' (১৩১০), 'কর্পূর-মঞ্জরী' ও 'মৃচ্ছকটিক' (১৩১১) অনুবাদিত ও প্রকাশিত হয়।

তাঁহার রচিত "মিলিতোনা", "বসন্তলীলা", "অশ্রুমতী", "অবতার", "মার্কাস ওরিলিয়াসের আত্মচিন্তা" প্রভৃতি নাটকও এককালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

জ্যোতিবাবু স্বাস্থ্যলাভের জন্য ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার রাঁচী গিয়াছিলেন; রাঁচী তাঁহার খুব ভাল লাগিয়া-ছিল। সে জন্য তিনি তথায় মোরাবাদী পাহাড়ের উপর 'শান্তিধাম' নির্ম্মাণ করিয়া শেষ জীবনে তথায় বাস করিয়াছিলেন।

১৩৩১ সালের ২০শে ফাল্গুন তারিখে রাঁচীতেই তিনি পরলোকগত হইয়াছেন।

স্থান ভ্রষ্ট

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

চাচর চিকুর রাজি নারীর মস্তকে
সহস্র নরের চিত্ত করে আকর্ষণ।
সহস্র নারীর কেশ শিরোভ্রষ্ট যবে
একটি মানব-প্রাণে না আনে স্পন্দন॥

বঙ্গপঞ্জিকা-সমন্বয় ও সূক্ষ্মলগ্ন নিরূপণ

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

রাজা-মন্ত্রী

দেশে রাজা বা রাজপ্রতিনিধি না থাকিলে যেমন অরাজকতা উপস্থিত হয় বর্ত্তমানে জ্যোতিষশাস্ত্রের কোন সর্ব্বজনমান্য নিয়ন্তা না থাকায় ইহার অবস্থাও হইয়াছে তদ্রূপ। কোন কোন পঞ্জিকাকারের মতে রবি রাজা বুধ মন্ত্রী, আবার কেহ বা বুধ রাজা শনি মন্ত্রী বলিয়া প্রচার করিতেছেন। এই বৈষম্যের হেতু কোন পঞ্জিকার উপরই আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না। যেহেতু একই সময়ে একই দেশে বিভিন্ন রাজা ও মন্ত্রী হইতে পারে না—ইহা ধ্রুব সত্য। ভাষাবিশেষে এক জলেরই বিভিন্ন নাম, যথা—সলিল, প্রাণ, বারি, অপ্, ওয়াটার ইত্যাদি হইয়া থাকে। সেইরূপ পঞ্জিকাকারগণও যদি একই রাজা ও মন্ত্রীকে ইঁহাদের লোক-প্রসিদ্ধ বিভিন্ন নামে নির্দ্দেশ করিতেন তবে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারিত না। কিন্তু তাহা না করিয়া বিভিন্ন গ্রহকেই একই বৎসরে একই চক্রবালে এক রাজা বা মন্ত্রী পদ দিয়া বহু রাজা ও বহু মন্ত্রীর অবতারণা করিয়া অরাজকতা বা অরাজকতার সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জন্যই জ্যোতিষ শাস্ত্র হইতে শিক্ষিত সমাজের আস্থা চলিয়া যাইতেছে। ভবিষ্যতে এরূপ করিয়া যাহাতে প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রের অবমাননা না হয় তৎপ্রতি পঞ্জিকাপ্রণেতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

প্রতীয়মান সূর্য্য

আমরা যে সূর্য্যের কিরণ পাই উহাকে প্রতীয়মান সূর্য্য বা স্পষ্ট সূর্য্য (Apparent Sun) বলে। প্রতীয়মান সূর্য্যের প্রাত্যহিক গতি দ্বারা যে সময় নির্ণয় করা হয়—অর্থাৎ সূর্য্যের পর্য্যবেক্ষণ লইয়া যে সময় নির্ণয় করা হয় তাহাকে প্রতীয়মান সৌরকাল (Apparent time) বলে। কাল্পনিক সূর্য্যের প্রাত্যহিক গতি দ্বারা যে সময় নির্ণয় করা হয় তাহাকে মধ্যম সাবন কাল (Mean time) বলে। প্রতীয়মান সৌরকাল হইতে মধ্যম সাবন কাল কখনও বেশী, কখনও বা কম হইয়া থাকে এবং ইহাদের অন্তরকে সমীকরণ বলে।

কাল্পনিক সূর্য্য

প্রতীয়মান সূর্য্য বিষুবরেখার (equator) লম্বভাবে না ঘুরিয়া ক্রান্তিবৃত্তের (ecliptic) উপর দিয়া আবর্ত্তন করে এবং পৃথিবীর কক্ষের (Orbit) অসম-কেন্দ্রতা হেতু প্রতীয়মান সূর্য্যের গতি সমান নহে; সেইজন্য প্রতীয়মান সূর্য্যের উদয় হইতে পরদিন সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত যে দিন (Apparent solar day) তাহার পরিমাণ সমান থাকে না অর্থাৎ সূর্য্য হইতে পৃথিবী সর্ব্বদা সমদূরবর্ত্তী না থাকায় প্রতীয়মান সৌর দিবসের পরিমাণ সমান থাকে না। ঘটিকা-যন্ত্র দ্বারা এরূপ অসমান ঘণ্টা প্রদর্শন করা অসুবিধা হয় বলিয়া একটি কাল্পনিক সূর্য্য (Mean Sun) বিষুবরেখার উপর দিয়া সমভাবে আবর্ত্তন করিতেছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। কাল্পনিক সূর্য্য ঘুরিতে ঘুরিতে কোনও দ্রাঘিমা ছাড়িয়া পুনরায় সেই দ্রাঘিমায় উপস্থিত হইতে যে সময় লাগে, তাহাকে মধ্যম সাবন দিন, মীন টাইম বা স্থানীয় সময় বলে। এই সময়ই জ্যোতিষ গণনা-কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; প্রতীয়মান সূর্য্যের উদয় ও কাল্পনিক সূর্য্যের উদয়ের সময়ের যে তারতম্য হইয়া থাকে তাহাকে সমীকরণ (equation of time) বলে। (The difference between the right ascension of the true sun and that of the mean sun is known as equation of time.)

আদি বিন্দু

সূর্য্য, গ্রহ ও নক্ষত্রাদির অবস্থান নিরূপণ করার জন্য বিষুবরেখা ও গ্রিণউইচের দ্রাঘিমায় সমান্তর নভোমণ্ডলীয় বিষুবরেখা (celestial equatoror equinoctial) ও নভোমণ্ডলীয় দ্রাঘিমা (celestial meridian) নামক আরও দুইটি রেখা কল্পনা করিয়া লইতে হয়। প্রায় ৩৬৫ দিনে পৃথিবী সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া বৃত্তাভাস পথে ঘুরিয়া আসে, সূর্য্য এই বৃত্তাভাসের একটি মধ্য বিন্দু (Focus)। পৃথিবীর এই ভ্রমণ পথ উত্তর-পূর্ব্ব কোণ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বিস্তৃত, ইহা নভোমণ্ডলীয় বিষুবরেখার সহিত ২৩½ ডিগ্রী কোণে অবস্থিত। নভোমণ্ডলীয় বিষুবরেখা এবং পৃথিবী যে দুই বিন্দুতে অবচ্ছেদ করে, তাহার উপরের বিন্দুকে মেষের আদি বিন্দু (First point of Aries) বলে। মেষের আদি বিন্দু হইতে সূর্য্য, গ্রহ ও নক্ষত্রাদির রাইট এসেন্‌শান (Right ascension) গণনা করা হয়।

রাইট এসেন্‌শান

মেষের আদি বিন্দু হইতে সূর্য্য বা কোনও গ্রহনক্ষত্র যতটুকু পূর্ব্ব দিকে সরিয়া থাকে অর্থাৎ মেষ রাশি দ্রাঘিমা পার হইয়া গেলে সূর্য্য বা কোনও নক্ষত্র যতক্ষণ পরে সেই দ্রাঘিমার উপর আসিয়া থাকে, সেই সময়টুকুকেই রাইট এসেন্‌সান বলে।

সৌরজগৎ

গ্রহ, উপগ্রহাদি সমস্তই বৃত্তাভাস পথে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সূর্য্য এই বৃত্তাভাসের একটি মধ্যবিন্দু। সূর্য্য, গ্রহ ও উপগ্রহাদি লইয়া যে জগৎ কল্পনা করা হয়, তাহাকেই সৌর জগৎ বলে।

দিবা, রাত্রি, এবং সূর্য্যনক্ষত্রাদির উদয়াস্তের কারণ

গ্রহ, উপগ্রহাদি এবং সূর্য্য ও নক্ষত্রসমূহ পৃথিবী হইতে সমদূরবর্ত্তী নয় এবং একই তলের উপরেও স্থাপিত নয়। সমুদয়ই শূন্যের উপর

ঝুলিতেছে, কিন্তু অনেক দূরে থাকা নিবন্ধন এই শূন্যেই জড়ীয়রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। বোধ হইতেছে যেন সমুদয়ই একটি গোলাকার খিলানের উপর স্থাপিত রহিয়াছে; এই খিলানটিকে আকাশ বলে। আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যেন সূর্য্য ও নক্ষত্রসমূহ পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে; সূর্য্য ও নক্ষত্রসমূহ অচল। পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে বিষুব রেখার লম্বভাবে পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্ব দিকে ঘুরিয়া যাইতেছে। আমরাও পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন কোনও নক্ষত্র বা সূর্য্যকে চক্রবালের উপরে দেখিতে পাই, তখন তাহার উদয় বলি এবং যখন পশ্চিম দিকে চক্রবালের নীচে যাইতে দেখি, তখন তাহার অস্ত বলি। এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে যতক্ষণ আমরা সূর্য্যকে দেখিতে পাই, ততক্ষণকে দিবা এবং যতক্ষণ সূর্য্যের কিরণ পাই না ততক্ষণকে রাত্রি বলি। পৃথিবীর সকল স্থানেই একই সময়ে দিবা বা রাত্রি হয় না এবং সকল নক্ষত্রই একই সময়ে উদয় হইয়া একই সময়ে অস্ত যায় না। দিবা রাত্রিতে ক্রমে উদয় হইতেছে, ক্রমে অস্ত যাইতেছে। দিবা ভাগে সূর্য্যের প্রখর কিরণের জন্য আমরা নক্ষত্রাদি দেখিতে পাই না।

সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত

প্রত্যহ পূর্ব্ব দিকের ঠিক এক জায়গা হইতে সূর্য্যোদয় হয় না। বর্ত্তমান ১৩৪২ বাং সনের ৭ই চৈত্র (২০শে মার্চ্চ) ও ৮ই আশ্বিন (২৫শে সেপ্টেম্বর) যে দুই দিন উষ্ণ মণ্ডলের (Torrid Zone) সর্ব্বত্র দিবা রাত্রি সমান হইবে সেই দুই দিন সূর্য্য ঠিক পূর্ব্ব দিক হইতে উদিত হইবে অর্থাৎ বিষুবরেখার উপর উদিত হইবে। অয়ন বা ক্রান্তিপাত (equinox) নভোমণ্ডলীয় বিষুবরেখাকে (celestial equator) ঠিক বিপরীতভাবে প্রায় ২৩°-২৮′ কোণ করিয়া যে দুই বিন্দুতে অবচ্ছেদ করে, তাহার এক বিন্দুকে বাসন্তী ক্রান্তিপাত (Vernal equinox) কহে। কারণ চৈত্রমাসে সেই বিন্দুতে সূর্য্যোদয় হয়। অপর বিন্দুকে শারদীয় ক্রান্তিপাত (Autumnal equinox) কহে, যেহেতু আশ্বিন মাসে ঐ বিন্দুতে সূর্য্যোদয় হয়। ২১শে মার্চ্চ হইতে সূর্য্য প্রত্যহ বিষুবরেখা হইতে একটু একটু উত্তরে উদিত হইতে থাকে; এইরূপ হইতে হইতে ২২শে জুন সূর্য্য বিষুবরেখা হইতে ২৩½ ডিগ্রী উত্তরে অর্থাৎ কর্কটক্রান্তির (Tropic of cancer) উপর উদিত হয়, সেই দিন উত্তর গোলার্দ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বড় দিন—সুতরাং দক্ষিণ গোলার্দ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট দিন। তাহার পর সূর্য্য আবার বিষুবরেখার দিকে আসিতে থাকে ও ২৫শে সেপ্টেম্বর শারদীয় ক্রান্তিপাতের উপর সূর্য্য উদিত হয় ও সর্ব্বত্র দিবারাত্রি সমান হয়। ২৩শে সেপ্টেম্বর হইতে সূর্য্য প্রত্যহ বিষুবরেখা হইতে একটু একটু দক্ষিণে উদিত হইতে থাকে; এইরূপ হইতে হইতে ২৪শে ডিসেম্বর সূর্য্য বিষুবরেখা হইতে ২৩½ ডিগ্রী দক্ষিণে অর্থাৎ মকরক্রান্তির (Tropic of capricorn) উপর উদিত হয়। সেইদিন দক্ষিণ গোলার্দ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বড় দিন ও উত্তর গোলার্দ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট দিন। তাহার পর সূর্য্য আবার বিষুবরেখার দিকে আসিতে থাকে ও ২০শে মার্চ্চ বাসন্তী ক্রান্তিপাতের উপর সূর্য্য উদিত হয় এবং সর্ব্বত্র দিবারাত্রি সমান হয়। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে বিষুবরেখা হইতে ২৩½ ডিগ্রী উত্তরে ও ২৩½ দক্ষিণে এই সীমানার মধ্যেই সূর্য্যোদয় হয়। কাজেই অক্ষাংশের তারতম্য অনুসারে সূর্য্যোদয়েরও তারতম্য হইয়া থাকে অর্থাৎ সকল দেশের অক্ষাংশ (Latitude) সমান নহে, এই হেতু সকল স্থানে একই সময়ে সূর্য্যোদয় হয় না। সূর্য্যাস্তও এই নিয়মেই হইয়া থাকে। (The sun-rise and sun-set of different places vary directly as the latitude; of course this will have no effect on those places where the time is observed from a particular meridian within that area.)

লোকাল টাইম

যখন যে দ্রাঘিমার উপর দিয়া কাল্পনিক সূর্য্য অতিক্রম করে সেই সময় হইতেই সেই স্থানের লোকাল টাইম (স্থানীয় সময়) গণনা করা হয়। কাল্পনিক সূর্য্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দ্রাঘিমা অতিক্রম করা নিবন্ধন আমরা পৃথিবীতে অসংখ্য লোকাল টাইম পাইয়া থাকি বটে, কিন্তু যদি বাস্তবিক পক্ষে তাহা ব্যবহৃত হইত, তবে সময়ের একটা বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি হইত। যদি প্রত্যেক দেশের সহরে বা গ্রামে স্ব স্ব স্থানীয় সময় ব্যবহৃত হইত তবে আমাদিগকে একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে আমাদের ঘড়ীর সময় পরিবর্ত্তন করিতে হইত। বঙ্গদেশের কেহ ব্রহ্মদেশে যাইয়া তাঁহার ঘড়ীর সময় মিলাইয়া রাখিলেই ইহার সত্যতা অনুভব করিতে পারিবেন। এই সমস্ত কারণে সম্প্রতি ক্রমে গ্রীণ-উইচের দ্রাঘিমাকে ষ্ট্যাণ্ডার্ড দ্রাঘিমা ও ০ ডিগ্রী নির্দ্দেশ ক্রমে তাহার পূর্ব্বে ও পশ্চিমে ১৮০ ডিগ্রী ধরিয়া ৩৬০ ডিগ্রীর বিভাগ করা হইয়াছে। গ্রীণ-উইচ হইতে যে সময় গণনা করা হয় তাহাকে ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম, গ্রীণ-উইচ মীনটাইম বা ইংলণ্ডের লোকাল টাইম বলা হয় এবং সে সময় হইতেই অন্যান্য স্থানের লোকাল টাইম গণনা করা হয়। পৃথিবী যখন তাহার মেরুদণ্ডের উপর দিয়া সমভাবে ঘুরিতেছে এবং দ্রাঘিমাও যখন পৃথিবী বেষ্টন করিয়া গ্রীণ-উইচের দ্রাঘিমা হইতে পূর্ব্বে ও পশ্চিমে সমভাবে মাপ করা হইয়াছে, কাজে কাজেই ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে গ্রীণ উইচ মীনটাইমও যে কোন স্থানের লোকাল টাইমের যে তারতম্য তাহা গ্রীণ-উইচের দ্রাঘিমা ও সেই স্থানের দ্রাঘিমার তারতম্যের সমান। (The difference between Greenwich mean time and the local time of any place is equal to the longitude of that place i, e, to say the local time of different places varies directly as the longitude.)

অনেক স্থান ব্যাপিয়া কোনও একটি দ্রাঘিমা নির্দ্দেশ ক্রমে সেই দ্রাঘিমা হইতেই ঐ সমস্ত স্থানের লোকাল টাইম গণনা করা হয় এবং তাহাকেই সেই স্থান বা দেশের ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম বলা হয়। আধুনিক সহর কলিকাতা (দ্রাঘিমা ৮৮°-২০-২′ মিনিট পূর্ব্ব ও অক্ষাংশ ২২°-৩৫′ উত্তর) ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইমকে বঙ্গদেশের স্থানীয় সময় বলিয়া

নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আবার সিংহলের (দ্রাঘিমা ৮২°-৩৫′ মিনিট পূর্ব্ব) স্থানীয় সময়কে ভারতবর্ষের ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। সেজন্য বঙ্গদেশের স্থানীয় সময় ভারতবর্ষের ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম হইতে ২৩′—২০·৮″ সেকেণ্ড বেশী। তার বিভাগের, পোষ্ট অফিসের ও রেলওয়ের ঘড়ীতে যে সময় দৃষ্ট হয় তাহা ভারতবর্ষের ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম ও অন্যান্য ঘড়ীতে যে সময় দৃষ্ট হয় তাহা বঙ্গদেশের স্থানীয় সময়—কাজেই বঙ্গদেশে আমরা দুইটি সময় পাইয়া থাকি। বঙ্গদেশের লোকাল টাইম ভারতবর্ষের ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম হইতে কেহ বা ২৩′-২৪″ কেহ বা ২৪′ বেশী ধরিয়া গণনা করিয়া থাকেন। ইহা ভুল; উল্লিখিত কারণে নিঃসন্দেহ চিত্তে ২৩′-২১″ সেকেণ্ড ধরিয়া গণনা করাই সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হয়।

ব্রহ্মদেশের ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম দ্রাঘিমা ৯৭°-৩০′ পূর্ব্ব ও অক্ষাংশ ২০° ডিগ্রী উত্তর ধরিয়া একটি কাল্পনিক স্থানের জন্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্রই সেই সময় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশের ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম ভারতবর্ষের ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম হইতে ১ ঘণ্টা বেশী—কারণ এই দুই স্থানের দূরত্ব ১৫° ডিগ্রী। (The standard time of Calcutta which is the local time of Bengal is reckoned from the meridian E 88°-20-2′ and the Standard time of India from the meridian E 82°-30′. Hence the Calcutta l cal time is 23′-20-8″ seconds in advance of the standard time in Indja. Similarly the standard time in Burma is reckoned from the meridian E 97°-30′, Hence the standard time in Burma is one hour in advance of the standard time in India.) জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনা কার্য্যে কোন কোন পঞ্জিকাকারক নবদ্বীপের দ্রাঘিমাকেই স্বদেশীয় মধ্যরেখা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু তাহা না করিয়া কলিকাতার দ্রাঘিমাকেই স্বদেশীয় মধ্যরেখা ধরিয়া গণনা করাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়, যেহেতু বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই কলিকাতার স্থানীয় সময় ব্যবহৃত হয়।

দিবামান ও রাত্রিমান

সকল পঞ্জিকাতেই সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের যে সময় ধরিয়া দিবামান ও রাত্রিমান গণনা করা হইয়াছে তাহাও অনুসন্ধেয়।

সূক্ষ্ম-লগ্ন নিরূপণ

লগ্ন নিরূপণ করার নিয়ম সকলেই বিদিত আছেন বটে, কিন্তু পুনরালোচনা করার কারণ নিম্নে প্রকাশ করা হইতেছে। লগ্ন নিরূপণ করা সম্পূর্ণ—সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের উপর নির্ভর করে। ঘটিকাযন্ত্রে সূক্ষ্ম সময় পাওয়া যায়। যদি বিশুদ্ধভাবে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত নিরূপণ করা না হয় তবে লগ্নমান যে ভুল হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মৎদেশীয় অনেক আচার্য্যের সঙ্গে আলোচনাক্রমে দেখা যায় যে, কোন কোন আচার্য্য সকল স্থানের জন্যই—পঞ্জিকার লিখিত সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত ধরিয়া লন, আবার কেহ বা কলিকাতার সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সঙ্গে কলিকাতার পূর্ব্বদিকের স্থানগুলির জন্য পঞ্জিকায় দেশভেদে অক্ষাংশ ও সময়নির্ণয়ের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কলিকাতায় ১২টার সময় যে স্থানে যত সময় বেশী দেখান হইয়াছে তাহা কলিকাতার সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে যোগ করিয়া সেই—স্থানের সূর্য্যোদয় নির্ণয় করিয়া থাকেন। এই উভয় প্রণালীই ভুল। যেস্থানের সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্ত নির্ণয় করিতে হইবে উক্ত তালিকায় ১২টার সময় সে স্থানে যত সময় দেখান হইয়াছে তাহা ১২টা হইতে যত সময় বেশী তাহা কলিকাতার সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত হইতে বাদ দিয়া, আবার যে স্থানে ১২টা হইতে যত সময় কম দেখান হইয়াছে তাহা কলিকাতার সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সঙ্গে যোগ দিয়া স্থান বিশেষের সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত নির্ণয় করিলেই বিশুদ্ধভাবে নিরূপিত হইবে। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই কলিকাতার স্থানীয় সময় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কাজেই বিভিন্ন অক্ষাংশের জন্য সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের যে তারতম্য হইয়া থাকে তাহা ধর্ত্তব্য নহে। ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, কলিকাতার পূর্ব্বদিকের স্থানসমূহের পূর্ব্বে ও কলিকাতার পশ্চিমদিকের স্থানসমূহে পরে সূর্য্যোদয় হয় বলিয়া কলিকাতায় যখন ১২টা—তখন কলিকাতার পূর্ব্বদিকের স্থানসমূহের ১২টা হইতে বেশী সময় ও পশ্চিমদিকের স্থানসমূহে ১২টা হইতে কম সময় দৃষ্ট হয়। এই বেশী কম কলিকাতা হইতে দ্রাঘিমার দূরত্বানুযায়ী প্রতি ডিগ্রীতে ৪′ মিনিট হিসাবে হইয়া থাকে; ব্রহ্মদেশের জন্য উক্ত নিয়ম ব্যবহৃত হইবে না। যেহেতু ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্রই ব্রহ্মদেশের ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশবাসী বাঙ্গালীদের সুবিধার্থ ব্রহ্মদেশের (দ্রাঘিমা পূর্ব্ব ৯৭°-৩০′ ও অক্ষাংশ উত্তর ২০° ডিগ্রী।) দৈনিক সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত যাহাতে পঞ্জিকায় সন্নিবেশিত করা হয় তৎপ্রতি পঞ্জিকাপ্রণেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ একান্ত বাঞ্ছনীয়। ব্রহ্মদেশের যে স্থান হইতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম ধরা হয় সে স্থান হইতে রেঙ্গুন ৫′-২০″ ও আকিয়াব ১৮′-২৪° দূরে অবস্থিত; কাজেই ব্রহ্মদেশের যে স্থান হইতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম ধরা হয় সে স্থানের সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সঙ্গে উক্ত সময় যোগ দিলে যথাক্রমে রেঙ্গুন ও আকিয়াবের সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত নির্ণীত হইবে।

লগ্নমান

কোন পঞ্জিকাতেই আকিয়াবের অয়নাংশ শোধিত লগ্নমান দেওয়া হয় নাই। কেবলমাত্র রেঙ্গুনের লগ্নমান দেওয়া হইয়াছে। উক্ত লগ্নমান আকিয়াবের জন্যও কেহ কেহ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহা সম্পূর্ণ ভুল। যেহেতু রেঙ্গুনের অক্ষাংশ ১৬°-৪৬′ উত্তর। আকিয়াবের অক্ষাংশ ২০°-৮′ উত্তর বিধায় প্রায়ই পুরীর অক্ষাংশের নিকটবর্ত্তী, কাজেই স্থূলভাবে পুরীর লগ্নমান ধরিয়া গণনা করা যাইতে পারে। অক্ষাংশভেদে সূর্য্যোদয়ের ন্যায় লগ্নমানেরও তারতম্য হইয়া থাকে। কাজেই নিম্নে আকিয়াবের লগ্নমান দেওয়া গেল।

মেষ	৪।১১।৫৪	সিংহ	৫।২৩।০	ধনু	৫।১৮।৪৭
বৃষ	৪।৫৪।৪৫	কন্যা	৫।১৯। ৯	মকর	৪।৩৪।৪৮
মিথুন	৫।৩১।৪৫	তুলা	৫।২৯।৪৫	কুম্ভ	৩।৫৯।১৩
কর্কট	৫।৩৬।৫৬	বৃশ্চিক	৫।৩৮।৩৭	মীন	৩।৫০।৪১

লগ্নের উদয় অস্ত

পঞ্জিকায় কলিকাতার লগ্নমান ধরিয়া দৈনিক লগ্নের উদয় অস্ত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কাজেই সকল স্থানের লগ্নমানের জন্য সেই উদয় অস্ত ধরিয়া গণনা করা ও যুক্তিসঙ্গত নহে। বিশুদ্ধ লগ্নমান গণনা করিতে হইলে যে দিন যে স্থানের লগ্নমান ধরিয়া গণনা করিবে, সেই দিন সেই স্থানের লগ্নমান ধরিয়া উদয় অস্ত নির্ণয় করিয়া লওয়াই শাস্ত্রসঙ্গত।

উল্লিখিত বিষয়গুলি প্রচার-উপযোগী মনে করিয়াই প্রচার করা হইতেছে। ইহাতে যদি একজন লোকও উপকৃত হন, তবেই পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও জাতিভেদ

রায় শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর

"It is fatal to fly straight at him with ready-made analogies. We must see him in his own atmosphere.

Gilbert Murray.

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (শ্রীচৈতন্য) একাধারে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আরাধ্য দেবতা এবং ভক্তিসাধনের ক্ষেত্রে প্রধান আদর্শ। অবৈষ্ণব বাঙ্গালীরা তাঁহাকে আদর্শ ভক্তরূপে গভীর শ্রদ্ধা করেন। শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসে এক নব যুগের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। এই যুগের স্রষ্টার কীর্ত্তির সম্যক পরিচয় প্রদান করা বাঙ্গালার ইতিহাসলেখকের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। বাঙ্গালায় যে সকল ধর্ম্মসংস্কারক আবির্ভূত হইয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীচৈতন্য যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী সুতরাং সর্ব্ব প্রধান. এই বিষয়ে মতদ্বৈধের অবসর নাই। অনেক ঐতিহাসিক তাঁহাকে সমাজসংস্কারকরূপেও প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। জাতিভেদের উচ্ছেদসাধনের চেষ্টা সমাজসংস্কার ক্ষেত্রে তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি বলিয়া কথিত হয়। শ্রীচৈতন্য জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন কি না ইহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে বর্ত্তমানে যে বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছে "ভারতবর্ষে"র পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। এই বাদানুবাদে সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ না করিয়া আমি এই প্রস্তাবে বিষয়টি আলোচনা করিব। ঐতিহাসিক হিসাবে শ্রীচৈতন্য একজন বিরাট আদর্শ (representative) বাঙ্গালী। সুতরাং মানুষ শ্রীচৈতন্যকে চিনিতে না পারিলে বাঙ্গালী আপনাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিবে না।

বৃন্দাবনদাস "চৈতন্য ভাগবতে" লিখিয়াছেন—

ভক্তিবিনা প্রভুর জিজ্ঞাসা নাহি আর।
ভক্তি-রসময় শ্রীচৈতন্য অবতার॥

(অন্ত্য ৯।১৫৫)

ধর্ম্মের তিন মার্গ—কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি। কর্ম্মমার্গে বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। জ্ঞানমার্গের দুই শাখা, বৈদিক এবং অবৈদিক। বৈদিক জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মজ্ঞানসাধন বিহিত হইয়াছে। বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি ধর্ম্ম অবৈদিক জ্ঞানমার্গের অন্তর্গত। বৈদিক কর্ম্মমার্গে এবং জ্ঞানমার্গে জাতিভেদানুসারে অধিকারী ভেদ করা হইয়াছে। স্ত্রী এবং শূদ্র যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং উপনিষদোক্ত ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনের অধিকারী নহে, স্মৃতিশাস্ত্রে যাহাদিগকে অনুলোমজ এবং প্রতিলোমজ শঙ্কর জাতি বলা হইয়াছে তাহারা ত নহেই। কিন্তু ভক্তিমার্গে জাতিভেদানুসারে অধিকারী ভেদ নাই এবং ভক্ত যে জাতীয়ই হউক না কেন সকল জাতির পূজ্য। "হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডাল দ্বিজশ্রেষ্ঠরূপে গণনীয়" (চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ) এই প্রবচনে জাতিভেদ সম্বন্ধে ভক্তিমার্গীর অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য, নীচ জাতির লোকও ভক্তি-সাধনের অধিকারী এবং সে ভক্তি লাভ করিতে পারিলে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের তুল্য পূজনীয়। জাতিভেদ সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিধি-ব্যবস্থা জানিতে হইলে গোপালভট্টের "হরিভক্তিবিলাস" দেখিতে হইবে। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া যায়েন নাই। তিনি গ্রন্থ রচনার ভার দিয়াছিলেন রূপ, সনাতন, গোপাল ভট্ট আদি গোস্বামীগণের উপর। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুসরণীয় স্মৃতিনিবন্ধ "হরিভক্তিবিলাস" সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন গোপালভট্ট এবং স্বয়ং সনাতন গোস্বামী তাহার টীকা লিখিয়াছেন। গোপালভট্ট "হরিভক্তিবিলাসের" প্রথম বিলাসে অধিকারী নির্ণয়ে প্রথমতঃ এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

তান্ত্রিকেষু চ মন্ত্রেষু দীক্ষায়াং যোষিতামপি।
সাধ্বীনামধিকারোঽস্তি শূদ্রাদীনাঞ্চ সদ্ধিয়াং॥

তান্ত্রিক মন্ত্রে ও দীক্ষায় সাধ্বী স্ত্রী ও সদ্বুদ্ধি শূদ্রাদির অধিকার আছে।

শূদ্রাদি শব্দের দ্বারা এখানে শূদ্র এবং দ্বিজ ভিন্ন আর সকল জাতিই বুঝাইয়াছে। গোপালভট্টধৃত শ্রীরামের মন্ত্ররাজের উদ্দেশে উক্ত অগস্ত্যসংহিতার বচনে এই কথা পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে। যথা—

শুচিব্রততমাঃ শূদ্রা ধার্ম্মিকা দ্বিজসেবকাঃ।
স্ত্রিয়ঃ পতিব্রতাশ্চাগ্রে প্রতিলোমানুলোমজাঃ॥
লোকাশ্চণ্ডালপর্য্যন্তাঃ সর্ব্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ॥

পবিত্রব্রতবান্, ধর্ম্মনিষ্ঠ, গুরুসেবা পরায়ণ শূদ্রগণ, পতিপরায়ণা স্ত্রীগণ এবং অন্যান্য প্রতিলোমজ ও অনুলোমজ চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই ইহাতে অধিকারী হইতে পারেন।*

শূদ্রের "দ্বিজসেবক" বিশেষণ হইতে দেখা যায়, এই বচনে সাধন-ভজন সম্বন্ধে সকল জাতির সমান অধিকার বিহিত হইলেও অন্যান্য বিষয়ে জাতিভেদের ভিত্তি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুসরণের বিধি সূচিত হইয়াছে। পারলৌকিক মঙ্গল বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য। পারলৌকিক ব্যাপারে জাতিভেদ উপেক্ষা করিয়া লৌকিক ব্যাপারে তাহার অনুসরণ এ কালের ঐহিকসর্ব্বস্ব (secularist) লোকের নিকট বিস্ময়কর মনে হইতে পারে। কিন্তু সে কালের ধর্ম্মসংস্কারকগণ ঐহিক ব্যাপার সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন; তাঁহারা পারত্রিক ব্যাপারে জাতিভেদ অস্বীকার করিলেও ঐহিক ব্যাপার সম্বন্ধে জাতিভেদের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই।

"হরিভক্তিবিলাসে" বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধের প্রধান কার্য্য, যে অন্ন বিষ্ণুকে নিবেদন করা হইয়াছে বিষ্ণুর সেই প্রসাদ পিতৃগণকে নিবেদন করা। বৈদিক শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজনের ন্যায় বৈষ্ণব শ্রাদ্ধে বৈষ্ণবভোজনের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এখানেও ব্রাহ্মণবৈষ্ণবের প্রতি পক্ষপাত দেখা যায়। যথা—

ব্রহ্মপুরাণে শ্রীব্রহ্মবচন—

শঙ্খাঙ্কিততনুর্বিপ্রো ভুঙ্‌ক্তে যস্য চ বেশ্মনি।
তদন্নং স্বয়মশ্নাতি পিতৃভিঃ সহ কেশবঃ॥

ব্রহ্মপুরাণে ব্রহ্মা বলিতেছেন, যে ব্রাহ্মণের শরীর শঙ্খের চিহ্ন-ভূষিত সেই ব্রাহ্মণ যে গৃহে ভোজন করেন, পিতৃগণের সহিত স্বয়ং বিষ্ণু (সেই গৃহে) অন্ন ভোজন করেন।

গোপালভট্ট প্রধানতঃ পুরাণের বচন অনুসারে বৈষ্ণবের ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে কি আচার প্রচলিত ছিল এবং তিনি স্বয়ং কিরূপ আচরণ করিতেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার প্রামাণিক জীবনচরিত বৃন্দাবনদাসের "চৈতন্যভাগবতে" এবং কৃষ্ণদাসকবিরাজের "চৈতন্যচরিতামৃতে"। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বাবধিই যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা হরিভক্তের জাতি বিচার করিতেন না, ঠাকুর হরিদাসের জীবনী তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত। "চৈতন্য ভাগবতের" আদিখণ্ডের ষোড়শ অধ্যায়ে হরিদাসের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। তিনি জাতিতে যবন বা মোসলমান ছিলেন। যবন শব্দে আদৌ যবন (Ionian) গ্রীকদিগকে বুঝাইত। তারপর পশ্চিম দিক হইতে আগত অনেক আক্রমণকারীকে যবন নামে অভিহিত করা হইয়াছে। হরিদাস ঠাকুরের মোসলমান নাম কি ছিল আমরা জানি না এবং তিনি কি উপায়ে যে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাহাও জানা যায় না। তিনি যশোহর জেলার অন্তর্গত বুড়ন গ্রামে* জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর ফুলিয়া-শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। সেইখানে তাঁহার শান্তিপুরনিবাসী অদ্বৈত আচার্য্যের সহিত মিলন হইয়াছিল। তারপর মোসলমান মুলুকের পতি (ফৌজদার?) স্বধর্ম্ম ত্যাগের জন্য হরিদাসকে কি কঠোর সাজা দিয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন। বৃন্দাবনদাস হরিদাসের প্রতি মুলুকপতির যে উক্তি লিখিয়াছেন তাহার কয়েকটি পংক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে—

আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা ছাড় হই তুমি মহাবংশজাত॥
জাতি-ধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার।
পরলোকে কেমনে বা পাইবা নিস্তার?
না জানিয়া যে কিছু করিলা অনাচার।
সে পাপ ঘুচাহ করি কল্মা উচ্চার॥

* 'শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস," শ্যামাচরণ কবিরত্ন সম্পাদিত, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, ৩৮ পৃঃ।

* গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত "শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত", ৩৩৯ পৃঃ, টীকা।

নিমাই পণ্ডিত গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন সঙ্কীর্ত্তন এবং নামপ্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন অদ্বৈত আচার্য্যের সহিত হরিদাস ঠাকুর তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন। নিমাই পণ্ডিত কাটোয়াতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধারণ এবং সন্ন্যাসগ্রহণ করতঃ তিন দিন অনাহারে রাঢ় দেশে ভ্রমণ করিয়া গঙ্গা পার হইয়া নিত্যানন্দের সহিত শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের ঘরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অদ্বৈত শ্রীচৈতন্যের এবং তাঁহার ভক্তগণের আহারের প্রচুর আয়োজন করিলেন এবং পূজা ও আরতি সমাপ্ত করিয়া অভ্যাগতগণকে আহার করিবার জন্য ডাকিলেন।

দুই ভাই আইলা তবে করিতে ভোজন।
গৃহের ভিতরে প্রভু করেন গমন॥

দুই ভাই এখানে শ্রীচৈতন্য এবং নিত্যানন্দ। অদ্বৈত মুকুন্দ এবং হরিদাসকেও শ্রীচৈতন্যের সহিত আহার করিতে ডাকিলেন।

মুকুন্দ, হরিদাস, দুই প্রভু বোলাইল।
যোড়হাতে দুই জন কহিতে লাগিল॥
মুকুন্দ বলে, মোর কিছু কৃত্য নাহি সরে।
পাছে মুঞি প্রসাদ পামু, তুমি যাহ ঘরে॥
হরিদাস বলে, মুঞি পাপিষ্ঠ অধম।
বাহিরে এক মুষ্টি পাছে করিমু ভোজন॥

শ্রীচৈতন্যের আহার শেষ হইলে অদ্বৈত তাঁহার পদসেবা করিতে চাহিলেন। তখন—

সঙ্কুচিত হঞা প্রভু বলেন বচন॥
বহুত নাচাইলে তুমি, ছাড় নাচন।
মুকুন্দ হরিদাস লইয়া করহ ভোজন॥
তবে ত আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুই জনে।
করিল ভোজন, ইচ্ছা যে আছিল মনে॥

(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

হরিদাস ঠাকুরের দৈন্য বিফল হইল। তিনি অদ্বৈত আচার্য্যের এবং মুকুন্দের সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজন করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু সাধারণ মোসলমানের সঙ্গে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের এইরূপ পংক্তি ভোজনের কোন প্রমাণ নাই।

শ্রীচৈতন্য যখন নীলাচলে (পুরী) গেলেন, গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গে হরিদাস ঠাকুর তথায় উপস্থিত হইলেন। পুরীতে পৌঁছিয়া ভক্তগণ জগন্নাথ দর্শন না করিয়াই শ্রীচৈতন্যের বাসার দিকে চলিলেন এবং সেইখানে (কাশী মিশ্রের ভবনে) একে একে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মুরারিগুপ্ত বাহিরে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য অনুসন্ধান করিলে বহু ভক্ত গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিল।

মুরারি দেখিয়া প্রভু আইলা মিলিতে।
পাছে ভাগে মুরারি লাগিল কহিতে॥
মোরে না ছুঁইহ, প্রভু, মুঞি ত পামর।
তোমার স্পর্শযোগ্য নহে এই কলেবর॥
প্রভু কহে, মুরারি, কর দৈন্য সম্বরণ।
তোমার দৈন্য দেখি মোর বিদীর্ণ হয় মন॥
এত বলি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।

তারপর আরও কয়েকজন ভক্তের সহিত সাক্ষাতের পর শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁহা হরিদাস।" হরিদাস তখন রাজপথপ্রান্তে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভক্তগণ ধাইয়া গিয়া হরিদাসকে বলিলেন, "প্রভু তোমায় দেখিতে চাহে, চলহ ত্বরিত।" তখন—

হরিদাস কহে, আমি নীচ জাতি ছার।
মন্দির নিকটে যাইতে মোর নাহি অধিকার॥
নিভৃতে টোটা-মধ্যে স্থান যদি পাঙ।
তাঁহা পড়ি রহোঁ, একলে কাল গোঙাঙ॥
জগন্নাথ সেবকের মোর স্পর্শ নাহি হয়।
তাঁহা পড়ি রহোঁ, মোর এই বাঞ্ছা হয়॥

শ্রীচৈতন্য এই সংবাদ পাইয়া হরিদাসের নিকট গেলেন এবং দণ্ডবৎ পতিত হরিদাসকে আলিঙ্গন করিয়া উঠাইলেন।

হরিদাস কহে, প্রভু না ছুঁইও মোরে।
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে॥

শ্রীচৈতন্য কহিলেন, আমিও তোমার তুল্য পবিত্র নহি,

দ্বিজ-ন্যাসী হইতে তুমি পরম পাবন।

এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে একটি (৩।৩৩।৮) শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই শ্লোকের প্রথম দুই চরণ—

অহো বড় শ্বপচোহতো গরীয়ান
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।

হে ভগবন, যাঁহার মুখে তোমার নাম উচ্চারিত হয় সে শ্বপচ হইলেও শ্রেষ্ঠ।

শ্রীচৈতন্য হরিদাসঠাকুরকে এক বাগানে লইয়া গিয়া বলিলেন,

এই স্থানে রহি কর নাম সংকীর্ত্তন।
প্রতি দিন আসি আমি করিব মিলন॥
মন্দিরের চক্র দেখি করিহ প্রণাম।
এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন॥

(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, একাদশ পরিচ্ছেদ)

হরিদাস ঠাকুরের যেমন অদ্বৈতের মত গৃহস্থ বৈষ্ণবের সহিত পংক্তি ভোজনে বাধা ছিল না, তেমন জগন্নাথের মন্দির প্রবেশেরও বাধা ছিল না। কিন্তু তিনি দৈন্যতা-বশতঃ নিজেকে জগন্নাথসেবকেরও অস্পৃশ্য জ্ঞান করিলেন, এবং মন্দির হইতে দূরে রহিলেন। দীন ভক্ত হরিদাস মন্দির চূড়ার চক্র দেখিয়াই কৃতার্থ হইতেন। বৈষ্ণব সুলভ দৈন্যতা বশতঃ কেবল অস্পৃশ্য জাতির বৈষ্ণব অস্পৃশ্য থাকিতে চাহিতেন না, ব্রাহ্মণ এবং করণ জাতীয় বৈষ্ণবও আপনা-দিগকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। উড়িষ্যার করণ জাতি ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য নহে। শ্রীচৈতন্য যখন করণ রামানন্দ রায়ের পিতা ভবানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করিলেন, তখন—

ভবানন্দ রায় বলিলেন—

আমি শূদ্র, বিষয়ী অধম।
মোরে তুমি স্পর্শ, এই ঈশ্বর লক্ষণ॥

(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১০।৪)

বৈষ্ণবোচিত দৈন্যের চরম উদাহরণ সনাতন গোস্বামী। রূপ-সনাতনের পূর্ব্বপুরুষের বিবরণ তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামীর "লঘুতোষিণী" গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। নরহরি চক্রবর্ত্তী "ভক্তিরত্নাকরে" এই বিবরণ উদ্ধৃত এবং বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়াছেন। রূপ-সনাতনের পূর্ব্বপুরুষ কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। সনাতন (সাকর মল্লিক) এবং রূপ (দেবীর খাস) গৌড়ের সুলতান হুসেন সাহর পাত্র ছিলেন। গৌড়ের নিকটবর্ত্তী রামকেলি গ্রামে শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলনের পর দুই ভাই রাজকার্য্য এবং বিষয় ত্যাগ করিয়া মথুরা চলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য যখন নীলাচলে বাস করিতেছিলেন তখন তাঁহার সহিত মিলনের জন্য ঝারিখণ্ড-বনপথে সনাতন পুরী আসিয়াছিলেন।

ঝারিখণ্ড বনপথে আইলা একেলা চলিয়া।
কভু উপবাস, কভু চর্ব্বণ করিয়া॥
ঝারিখণ্ডের জলের দোষে উপবাস হৈতে।
গাত্রে কণ্ডু হৈল, রসা পড়ে খাজুয়াইতে॥

পুরী পৌঁছিয়া সনাতন হরিদাস ঠাকুরের বাসায় গেলেন। শ্রীচৈতন্য হরিদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সেইখানে গিয়া সনাতনকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন। পাছে হটিয়া সনাতন বলিলেন—

মোরে না ছুঁইহ, প্রভু, পড়োঁ তোমার পায়।
একে নীচজাতি অধম আর কণ্ডুরসা গায়॥

শ্রীচৈতন্য সনাতনের নিষেধ না মানিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সনাতন হরিদাসের সঙ্গে রহিলেন এবং মন্দিরে না গিয়া মন্দিরের চক্র প্রণাম করিতে লাগিলেন। একদিন শ্রীচৈতন্য সনাতনকে নিজের বাসস্থানে মধ্যাহ্ন ভোজন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। হরিদাসের আশ্রম হইতে শ্রীচৈতন্যের বাসস্থানে পৌঁছিতে হইলে জগন্নাথের মন্দিরের সিংহদ্বারের নিকট দিয়া যাইতে হইত। সনাতন সেইপথে না গিয়া সমুদ্রের পার দিয়া ঘুরিয়া গেলেন। মধ্যাহ্নের সূর্য্যকিরণে তপ্ত বালুকার উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে সনাতনের দুই পায়ে ফোস্কা পড়িল।

প্রভু কহে, "তপ্ত বালুকাতে কেমনে আইলা?
সিংহদ্বারের পথ শীতল, কেনে না আইলা?"

সনাতন উত্তর করিলেন—

সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার।
বিশেষ ঠাকুরের তাঁহা সেবকের প্রচার॥
সেবক গতাগতি করে, নাহি অবসর।
তার স্পর্শ হৈলে সর্ব্বনাশ হবে মোর॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন, এইকথা শুনিয়া শ্রীচৈতন্য সন্তুষ্টই হইলেন এবং বলিলেন—

যদ্যপিও তুমি হও জগৎপাবন।
তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় দেবমুনিগণ॥
তথাপি ভক্তস্বভাব মর্য্যাদা রক্ষণ।
মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ॥

মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ॥
মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন।
তুমি ঐছে না করিলে করে কোন জন?

(চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

কি নিমিত্ত যে সনাতন নিজেকে নীচজাতি এবং অস্পৃশ্য-জ্ঞান করিতেন নরহরি চক্রবর্ত্তী "ভক্তিরত্নাকরে" তাহা আলোচনা করিয়াছেন। সনাতন সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

পিতা-পিতামহাদির যৈছে শুদ্ধাচার।
তাহা বিচারিতে মনে মানয়ে ধিক্কার॥
যবন দেখিলে পিতা প্রায়শ্চিত্ত করয়।
হেন যবনের সঙ্গে নিরন্তর রয়॥
করি মুখাপেক্ষা যবনের গৃহে যান।
এ হেতু আপনা মানে ম্লেচ্ছের সমান॥
যৈছে মনোবৃত্তি তাহা কিছু নাহি হয়।
ইথে অতি দীনহীন আপনা মানয়॥
যবে মগ্ন হন দৈন্য সমুদ্র মাঝারে।
ম্লেচ্ছাদিক হৈতে নীচ মানে আপনারে॥
নীচজাতি সঙ্গে সদা নীচ ব্যবহার।
এই হেতু নীচজাত্যাদিক উক্তি তাঁর॥
বিপ্ররাজ হৈয়া মহাখেদযুক্তান্তরে।
আপনাকে বিপ্রজ্ঞান কভু নাহি করে॥
শ্রীচৈতন্য কৃপা যাঁরে তাঁর ঐছে রীত।
আপনা উত্তম বুদ্ধি নহে কদাচিৎ॥
সদা একরস আপনাকে নীচ মানে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সে ভক্তের তত্ত্বজানে॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যৈছে দৈন্য করে তৈছে না করয়ে অন্য॥
তার ভক্ত দৈন্যরসে নিমগ্ন সদায়।
দৈন্যে যে আনন্দ তাহা জানে গৌররায়॥" *

যাঁহারা দৈন্যরসে নিমগ্ন হইয়া আপনাদিগকে নীচজাতি এবং অস্পৃশ্য জ্ঞান করিয়া আনন্দ অনুভব করেন তাঁহাদিগকে ঠিক জাতিভেদের বিরোধী বলা যায় না। "চৈতন্য-চরিতামৃতে"র যে পরিচ্ছেদে (অন্ত্য, ৪) সনাতনের দৈন্য বর্ণিত হইয়াছে সেই পরিচ্ছেদে জাতিভেদ ও দীনতা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য সনাতনকে বলিতেছেন—

নীচজাতি নহে কৃষ্ণ ভজনের অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন-পণ্ডিত-ধনীর বড় অভিমান॥

কৃষ্ণভজন সম্বন্ধে সকল জাতির সমান অধিকার স্বীকৃত হইলেও দীনভাব সেই সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে সমাজের সর্ব্বনিম্ন স্তরের ভিত্তির উপর। সুতরাং বৈষ্ণবের দীনতা পরোক্ষভাবে অস্পৃশ্যতার পৃষ্ঠপোষণ করিয়াছে। জাতিভেদ সম্পর্কে রাজা রামমোহন রায় মৃত্যুঞ্জয়াচার্য্যের "বজ্রসূচি"র প্রথম নির্ণয় বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ যেমন কৃষ্ণভজনে সকল জাতির সমান অধিকার প্রচার করিয়াছেন, মৃত্যুঞ্জয়াচার্য্য প্রকারান্তরে ব্রহ্মজ্ঞানসাধনায় চতুর্বর্ণের সমান অধিকার প্রচার করিয়াছেন। তিনি "বজ্রসূচি"র প্রথম নির্ণয়ের উপসংহারে লিখিয়াছেন—

"শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ সেই ব্রহ্ম যাঁহাকে জানিলে ব্রাহ্মণ হয়। সেই জ্ঞানের ন্যূনাধিক্য দ্বারা ক্ষত্রিয় বৈশ্য—আর তাহার অভাব দ্বারা শূদ্র এই সিদ্ধান্ত।" (রামমোহন রায়ের অনুবাদ)।

ইহার তাৎপর্য্য, চতুর্বর্ণের লোকই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী, এবং জ্ঞানের তারতম্যানুসারে বর্ণভেদ হওয়া উচিত। জাতিভেদ বা সামাজিক বৈষম্য ভাঙ্গিয়া সামাজিক সাম্য এবং ঐক্যস্থাপনের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে। জাতিভেদজনিত অনৈক্য যে হিন্দুদিগের অধঃপতনের একটি কারণ এ দেশীয় লোকের মধ্যে এই তথ্য বোধহয় প্রথম অনুভব করিয়াছিলেন রাজা রামমোহন রায়। প্রশ্নচ্ছলে হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রের দোষ দেখাইয়া লিখিত একব্যক্তির একখানি পত্র ১৮২১ সালের ১৪ই জুলাই তারিখের "সমাচারদর্পণে" মুদ্রিত হইয়াছিল। রামমোহন রায় শিবপ্রসাদ শর্ম্মা এই ছদ্মনামে এই পত্রের উত্তর "সমাচারদর্পণে"র সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া-

* "ভক্তিরত্নাকর" দ্বিতীয় সংস্করণ, মুর্শিদাবাদ, চৈতন্যাব্দ ৪২৩, ৪৪ পৃঃ।

ভারতবর্ষ

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

সাঁজের গল্প

শিল্পী—শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল

COLOURED ILLUSTRATION

ছিলেন। ১৮২১ সালের ১লা সেপ্টেম্বরের "সমাচারদর্পণে" লিখিত হইয়াছে, "অনেক অজিজ্ঞাসিতাভিধান আছে বলিয়া এই উত্তর 'সমাচারদর্পণে' প্রকাশিত হয় নাই।" * রামমোহন রায় এই উত্তর ১৮২১ সালেই "ব্রাহ্মণ সেবধি। ব্রাহ্মণমিসনরি সম্বাদ" নামে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছিলেন। "ব্রাহ্মণসেবধি"র সূচনায় রামমোহন রায় অন্যধর্ম্মের প্রচারকগণ হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা করিয়া হিন্দুদিগের যে মনঃপীড়া উৎপাদন করেন তাহার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"এই তিরস্কারের ভাগী আমরা প্রায় নয় শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমাদের অতিশয় শিষ্টতা ও হিংসা, ত্যাগকে ধর্ম্ম জানা ও আমাদের জাতিভেদ—যাহা সর্ব্বপ্রকার অনৈক্যতার মূল হয়।" †

* ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "সংবাদপত্রে সেকালের কথা," প্রথম খণ্ড, ১৬৮ পৃঃ।

† "রাজা রামমোহন রায়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী" এলাহাবাদ পাণিনি কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত; কলিকাতা, ১৩১২, ৪৫৬ পৃঃ।

বখ্‌শীষ্‌

মনোজ গুপ্ত

লোক কথায় বলে লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না—এ লাখ কথা কোথায় সুরু হয়—আর কোথায় শেষ হয় তার—ধরা-বাঁধা কোন সীমা নির্দ্দেশ করা নেই, তাই এর বিপক্ষে কিছু বলাও চলে না। অবনীর বিয়ের ঠিক হল—লাখ কথার আগে কি পরে তা ঠিক জানা নেই, তবে ঠিক হল। আজ-কালকার হিসেবে একটু কম বয়েসেই বলতে হবে—এই তো সবে বি-এ পাশ করেছে! মেয়েরাই তো আর বি-এ পাশ করবার আগে বিয়ে করতে চায় না। অবনীর বন্ধুদের মধ্যে খুব কম ছেলেরই বিয়ে হয়েছিল। কেউ কেউ বলতেও ছাড়লে না—অবনীর বাবার আর একটি মেয়ে ছিল, তাই তাড়াতাড়ি পার করলেন।

আমাদের গল্পটা ঠিক অবনীর বিয়ে নিয়ে নয়—তার বিয়ের রাত্রির একটা ঘটনা নিয়ে। কিন্তু সব কিছুর মত এরও একটা আরম্ভ আছে, সেটা না বললে চলে না।

অবনীদের "মোটর" নেই। "ট্যাক্সি" করে বর নিয়ে যাওয়াটাও নেহাৎ ভাল দেখায় না—তাই একটা গাড়ীর সন্ধান করতে হল। যার একখানা গাড়ী থাকে—সে Ford হলেও—তার পক্ষে গাড়ী পাওয়া সম্ভব—কিন্তু অবনীর বাবার গাড়ী ছিল না তা বলাই হয়েছে! গাড়ী পাওয়া কষ্টকর দেখে অবনীর বাবা বললেন, "কিছু দরকার নেই লোকের খোসামোদ করবার। গাড়ী যখন নেই, তখন 'ট্যাক্সি' করেই যাওয়া ভাল।" এ কথায় কিন্তু সকলে সন্তুষ্ট হতে পারল না—তাই গাড়ীর চেষ্টা চলতে লাগল। শেষে একখানা গাড়ী যোগাড় হ'ল—কোন এক রায় বাহাদুরের গাড়ী। সন্ধ্যের পর তাঁর আর গাড়ীর দরকার থাকে না—সে সময় গাড়ী পাওয়া যাবে।

৭টার সময় বর নিয়ে বেরুতে হবে—৭টা বাজতে মাত্র দশ মিনিট বাকি আছে—তখনও গাড়ী এসে পৌছয় নি। অবনীর বাবার বয়েস পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গিয়েছে, কাজেই একটু ব্যস্ত হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। সাড়ে ছ'টা থেকে তিনি জিজ্ঞেস করতে সুরু করেছেন—গাড়ী এসেছে কি না। গাড়ী তো আসে নি দেখাই যাচ্ছে কিন্তু করা যায় কি? যে বেচারা গাড়ীর ঠিক করেছিল তার প্রাণ যায়; প্রতি মুহূর্ত্তে কৈফিয়ৎ দিতে হয় গাড়ী আসছে না কেন। আচ্ছা, সেই বা কি বলতে পারে? এক বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল গাড়ী না-পাওয়া নিয়ে। কে একজন ভদ্রলোক বন্ধুটির বাড়ীতে এসেছিলেন; তিনি নিজে থেকে জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় বিয়ে, কবে বিয়ে, সন্ধ্যের পর গাড়ী হলে চলবে কি না; শেষে বললেন, "তোমাদের ঠিকানাটা দাও, বিয়ের দিন ঠিক সময়ে আমার গাড়ী তোমাদের বাড়ী যাবে।"

অবনীর বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "কখন আসতে হবে ঠিক করে বলে দিয়েছিলি তো?"

"বাঃ, তা আর দিই নি!"

"বাড়ীর নম্বর ভুল করিস নি?"

"আপনি কি যে বলেন? বাড়ীর নম্বর ভুল করব?"

"কি জানি? তোরা সব পারিস! ভদ্রলোকের ঠিকানা জানিস তো?"

"না, ঠিকানাটা তো জেনে নিই নি!"

"বেশ কাজই করেছ! একটা নিমন্ত্রণের চিঠিও তো দাও নি?"

"কৈ না!"

"কি বুদ্ধিই তোদের হচ্ছে! একটা ভদ্রলোক নিজে থেকে গাড়ী দিতে চাইলেন, তাঁকে নিমন্ত্রণ করাটাও দরকার মনে করিস না। ঠিকানাটাই জেনে নিস নি। তোরা কি যে লেখা-পড়া শিখিস! কোন কাজটা তোরা নিজের বুদ্ধি করে করতে পারিস বল ত···" কোথায় গিয়ে যে থামত বলা যায় না, যদি না ঠিক সেই সময় পেছনে এসে একটা মোটার "হর্ণ" দিত। হাঁ, সেই মোটারই তো! অবনীর বাবা তাড়াতাড়ি Chauffeurকে জিজ্ঞেস করলেন, "এত দেরী করলে কেন হে?"

"ইস্ টাইমকো আনে বোলা রহা"—তাকে আর কোন কথা না বলে ভদ্রলোক বাড়ীর ভেতর তাড়া দিতে গেলেন। দেরী হবেই; কোন কাজ যদি মেয়েরা ঠিক সময়ে করবে! দেরী হয়ে যাচ্ছে বোঝে না।

গাড়ী আসবারও প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বর বেরুল। তার মধ্যে অবনীর বাবা কতবার যে চটে উঠেছেন—তা বলা যায় না। অবনীর বড় ভাই একবার বললেন, "আপনি কেন ব্যস্ত হচ্ছেন বাবা? এখনও সময় ঢের আছে। বিয়ে তো কোন রাতে—"

"আচ্ছা, থাক্! তোরা তো বুঝিস সব! ঠিক লগ্নর সময় সময় গেলে চলে?" বেচারা অতি ভাল-মানুষ, খুব সাহস করে কথাগুলো বলে ফেলেছিলেন, আর কিছু বলবার মত তাঁর সাহস ছিল না।

কোন কিছু না বলে Chauffeur গাড়ী ছেড়ে দিলে। সোজা গাড়ী চলল Cornwallis Street দিয়ে, তার পর College Street, তার পর Wellington দিয়ে—কেউ কিছু বলে দিচ্ছে না। Dhurmatallahর মোড়ে অসম্ভব ভিড়। Chauffeur গাড়ী ত চালাচ্ছিল বেজায় জোরে। অবনীর বাবার ভয় হওয়াই স্বাভাবিক। সাবধানে চালাতে বললেন কিন্তু সে শুনেছে বলে মনে হল না। রাসবিহারী এভিনু থেকে বাঁ দিকে একটা রাস্তায় যেতে হয়; রাত্রের অন্ধকারে সেটা ঠিক করতে চেষ্টা করছিলেন অবনীর বাবা। এক জায়গায় বললেন, "এই, এই বাঁ দিকে।" গাড়ীটা আসতে করে নিতেই বললেন, "না না, এটা তো নয়!" Chauffeur বললে, "রাস্তাকা নাম বাৎলাইয়ে, হাম্ ঠিক লে জায়েগা।" বটে তো, ভুল হয়ে গিয়েছিল! ও যখন গাড়ী চালায় তখন রাস্তা তো ওর জানা থাকারই কথা।

বিয়ে বাড়ীতে সানাই বাজছিল। অবনীর বাবা ভেবেছিলেন ঠিক গাড়ী থামবে; তাই আগে থেকে সাবধান করে দেন নি। গাড়ী কিন্তু না থেমে এগিয়ে চলল। ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, "কি বিপদ! ছাতুর কি এটুকুও বুদ্ধি নেই—এই রোখো, রোখো।" একটুও ব্যস্ত না হয়ে Chauffeur বললে, "ম্যুমা লেতা।"

গাড়ী থেকে নেমে অবনীর বাবা আর কোন দিকে তাকাবার অবসর পেলেন না। কন্যা-কর্ত্তাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই যে বাড়ীতে ঢুকলেন, তারপর বিয়ের হাঙ্গামে আর বাইরে আসবার সময় পেলেন না। বিয়ের পর বাইরে কেউ অভুক্ত আছে কিনা দেখবার জন্য আসছিলেন, দেখলেন গাড়ী ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। তাড়াতাড়ি Chauffeurএর কাছে এসে বললেন, "এখনও দাঁড়িয়ে যে?"

"কাল সুবে ক' বাজে আনে হোগা?"

ভদ্রলোক মহা বিপদে পড়লেন। তিনি শুনেছিলেন সকালের দিকে গাড়ী পাওয়া যাবে না, অথচ এ জিজ্ঞেস করছে। গাড়ী দরকার নেই এ কথা বলতেও ইচ্ছে হল না; বললেন, "আচ্ছা, সে কাল সকালে বলে পাঠাব।" এর পর সে নিশ্চয় চলে যাবে জেনে অবনীর বাবা ভেতরে চলে গেলেন। Chauffeur যে কাল ক'টার সময় আসবে সে কথা জানবার জন্য এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল তা জেনে তাঁর লোকটার ওপর বিরক্তি অনেক কমে গিয়েছিল। একবার মনে হ'ল, কৈ লোকটাকে তো কিছু দেওয়া হল না! যাক্ গে, পরে তখন দিলেই হবে।

* * * *

কে একজন বাইরে এসেছিল কি কাজে। গাড়ীটা

তখনও দাঁড়িয়েছিল। Chauffeur তাকে ডেকে পরিষ্কার বাঙ্গালায় বললে "কনের দাদাকে একবার ডেকে দেবেন?"

"এখন তাঁকে পাওয়া শক্ত—খুব ব্যস্ত আছেন। কি দরকার জানাতে আপত্তি আছে?"

"আজ্ঞে, আমার তাঁর সঙ্গেই দরকার—দয়া করে যদি একবার ডেকে দেন, বিশেষ দরকার। বলবেন, যে গাড়ীতে বর এসেছে তার Chauffeur."

এ কথা না বললে ডেকে দিত কি না বলা যায় না। কত গাড়ীই তো এসেছে—কোন একটা গাড়ীর Chauffeur বাড়ীর কর্ত্তাকে এত জোর 'তলব' দিতে দেখলে আশ্চর্য্যবোধ তো হয়ই, একটু বিরক্তিও। কিন্তু উপায় কি? বরের গাড়ীর কা'র গাড়ী—কাজেই ডেকে দিতে হবে।

কনের দাদাও শুনে এমন বিশ্বাসই করতে পারেন নি যে গাড়ীর Chauffeur তাঁকে ডাকতে পারে। জিজ্ঞেস করলেন, "তাকে খাবার দেওয়া হয়েছে তো—তাতেই বা আমায় ডাকবে কেন?"

গাড়ীর কাছে এসে বেশ একটু বিরক্ত হয়েই Chauffeurকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমায় কি দরকার?"

"হামারা তো বখ্‌শীষ্ মিলা নেই।"

কি বিপদ। বর নিয়ে এল তাও বখশীষ দিতে হবে কন্যাপক্ষকে। কেন ওঁরা দিয়ে গেলেই তো পারতেন। দিতে গেলে গোটা দু'য়েক টাকার কম তো দেওয়া যায় না। এই রকম বাজে খরচ করেই তো খরচ বেড়ে যায়! উপায়ই বা কি? দু'টো টাকা নিয়ে Chauffeurএর হাতে দিতে সে বললে, "দো রুপেয়া, ব্যস্! এতা ভারি কামকে খালি দো রুপেয়া বখশীষ!"

ভদ্রলোক এর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না—এর চেয়ে বেশী যে সে আশা করতে পারে—তা তিনি ধারণাও করেন নি। বেশ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তা কত দিতে হবে?"

"আপ্‌কে মর্‌জি!"

"এই তো দিয়েছিলাম—এখন তোমার কি চাই বল?"

"পাঁচ রুপেয়া সে কম্‌তি নেহি লেগা।"

নেহি লেগা তো মাথা কিনেগা! পাঁচ পাঁচটা টাকা দিতে হবে! না হলে নেবে না! নতুন জামাইএর বাড়ী; যদি কিছু না দিয়েই বিদেয় করা হয় তাতে বদ্‌নাম রটবে। আচ্ছা, ওঁদের ডাকলে কি হয়! না, তা হলে মনে করবে টাকা দেবার ভয়ে ডেকেছে—সে ঠিক হবে না। একবার বললেন, "তা আর এক টাকা নাও—তাহলেই তো হবে!"

"পাঁচ রুপেয়া সে কম্‌তি নেহি লেগা"—কাজেই একটা পাঁচ টাকার নোট দিতে হল। পেছন ফিরতেই Chauffeur ফের ডেকে বললে, "হুজুর কুছ মিঠাই তো মিলনা চাই!"

"হাঁ, হাঁ, মিলবে বৈ কি! তা তুমি খাবে চল না?"

"নেহি হুজুর! হুঁয়া বৈঠ্‌কে খানে নেহি সেকেগা। কেত্‌না আদমি খাতা হ্যায়—কৈ ঠিকানা তো নেহি!"

ওঃ একেবারে ব্রহ্মচারী রে! লোকের সঙ্গে বসে খাবে না! হাজার রাগ হলেও উপায় নেই—তাকে খাবার দেবার ব্যবস্থা করে দিতে হল। ভদ্রলোক ভাবলেন, বিয়ের হাঙ্গাম শেষ হয়ে যাক্, একদিন সব বলবেন। কি রকম লোকের গাড়ী! Chauffeurকে কি মাইনে দেয় না নাকি? না এই থেকেই মাইনে তুলে নেয়?

সকালে যখন বর কনে নিয়ে যাবার সময় হয়েছে—তখন খেয়াল হল গাড়ীর কথা বলে দেওয়া হয় নি। কি অন্যায় হয়ে গিয়েছে! একবার বলে দিলেই গাড়ীটা পাওয়া যেত, তা আর হয়ে উঠল না। শুধু শুধু এই বালিগঞ্জ থেকে ট্যাক্সি ভাড়া দিতে হবে। ট্যাক্সি ভাড়া কিন্তু সত্যই দিতে হল না—গাড়ী ঠিক সময়েই এসে হাজির হল। অবনীর বাবা তাড়াতাড়ি Chauffeurকে বললেন, "কৈ তোমায় তো সময় বলে দিই নি? ঠিক সময়ে এলে কি করে?"

"বাবুজী ভেজ দিয়া।"

"কা'র গাড়ী হে! বেশ ভদ্রলোক তো! না বলতে নিজে থেকে সময় বুঝে গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওহে দেখ, কাল তোমার বখশীষ্‌টা দিতে বড় ভুল হয়ে গিয়েছিল—"

"নেহি হুজুর বখশীষ হাম্ লেনে সেকেগা নেহি!"

"সে কি? কেন?"

"মনীবকা হুকুম নেহি—" কনের ভাই এতক্ষণ সব শুনছিলেন। আর চুপ করে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব; বললেন, "কার গাড়ী মশাই? এ রকম শয়তান driver

কেউ রাখে? বখশীষ লেনেকা হুকুম নেহি? কাল রাতকো তুম হাম্‌সে পাঁচ রুপেয়া লিয়া নেহি?"

"আপ্‌সে রুপেয়া লেগা কেঁও?"

"এ্যাঁ! বেটাকে কাল নিজে পাঁচ টাকার একটা নোট দিয়েছি, আর—"

"গাল মাত্ দেও! আউর কৈ কো দিয়া হোগা!"

সবাই অবাক হয়ে চেয়েছিল। অবনীর বাবার দিকে ফিরে কনের ভাই বললেন, "মশাই, কাল ডেকে পাঠিয়ে টাকা নিয়েছে। দু'টাকা দিতে গেলাম, নিলে না—জোর করে পাঁচ টাকা আদায় করলে। ভেবেছিলাম সব হাঙ্গাম শেষ হয়ে গেলে তবে বলব। অম্লানবদনে বলে কি না 'আউর কৈ কো দিয়া হোগা!' আচ্ছা করে প্রহার দিলে তবে হয়।"

"প্রহার আমাকে না দিয়ে তোকে দেওয়ার বেশী দরকার" গলার কম্ফাটারটা খুলতে খুলতে Chauffeur বললে। অবনীর বাবা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এত সুন্দর একটা লোককে তিনি ছাতুখোর বলে ভুল করেছিলেন মাত্র তার গোটাকতক হিন্দি কথা, আর কম্ফাটার থাকার জন্য!

"কি লোক তুই! বোনের বিয়েতে Chauffeurকে পাঁচ টাকা বখশীষও দিবি না। আমাদের তো জানাসও নি। এত টাকা জমিয়ে করবি কি?"

"তোর পাত্তা পাই কি করে বল! কত দিন তোকে দেখি নি, তাই মনে পড়ে না।"

"তা পড়বে কি করে! নিজের নিয়েই ব্যস্ত! আমি কিন্তু তোর বোনের নাম শুনেই সন্দেহ করেছিলাম—বিশেষ যখন ঠিকানাটা জানলাম। তাই নিজেই Chauffeur সেজে গেলাম।"

"সত্য কাল তোকে কত কষ্ট দিয়েছি বল ত?"

"যথেষ্ট হয়েছে—এখন তো আগে বর-কনে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

অবনীর বাবা একটু আপত্তি করতে ভদ্রলোকটি বললেন, "কাল গিয়েছিলাম Chauffeur হিসেবে—আর আজ যাচ্ছি কনের ভাই হয়ে। এবার কিন্তু বখশীষ দিতে হবে আপনাদের।"

* * *

প্রীতি ভোজে Chauffeurএর নিমন্ত্রণের ত্রুটি হয় নি।

"আজকে আমার প্রভাত হ'ল—"

শ্রীরামেন্দু দত্ত

(গান)

আজকে আমার প্রভাত হ'ল
শালের বনের শ্যামল মাথায়,
অরুণ আলোর বার্ত্তা এল
চিকণ সবুজ পাতায় পাতায়!
নীল পাহাড়ে সূর্য্য উঠি'
ছুড়্‌লো সোণা মুঠি মুঠি,
এই প্রভাতের শীতল হাওয়া
ঘুচায় সকল বিষণ্ণতায়!
আনন্দে আজ রঙীণ হ'ল
শিশির কণা পাতায় পাতায়!

গাছের শাখে ঐ যে ডাকে
নাম-না-জানা নতুন পাখী!
বনের কুসুম মনের মাঝে
যায় সুরভির পরশ রাখি'!
লতায় লতায় ফুলে ফুলে
ভোরের আলো উঠ্‌লো দুলে,
বন-দুলালী নয়ন তুলে
আনন-কুসুম রাঙ্‌লো রে তায়!
কানন-কুসুম ব্যাকুল হ'ল
রঙীণ আলোর চঞ্চলতায়!

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের মৃত্যু অতর্কিত না হইলেও অপ্রত্যাশিত। কারণ আট মাস পূর্ব্বে যখন বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যে তাঁহার রাজত্বকাল ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় উৎসবানুষ্ঠান হইয়াছিল, তখনও কেহ জানিতেন না মৃত্যুর ছায়া তাঁহার উপর পতিত হইয়াছিল। উৎসবের শেষ দিন ৬ই মে (১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ) তিনি যে বেতার-বিবৃতিতে তাঁহার প্রজাদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলেন—

"আর যে কয় বৎসর আমি জীবিত থাকিব, সে কয় বৎসরের জন্য আমি আপনাকে তোমাদিগের কার্য্যে উৎসর্গ করিলাম।"

তাঁহার এই উক্তি সর্ব্বতোভাবে প্রতীচীর নিয়মতন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত নৃপতির ও প্রাচীর "রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ"—আদর্শের অনুরূপ, সন্দেহ নাই। তিনি যে বিশেষভাবে এই আদর্শের অনুসরণ করিতে প্রয়াসী ছিলেন, তাহার পরিচয় তাঁহার জীবনে পাওয়া গিয়াছে।

তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান ঘটনাগুলি এইরূপ :—

জন্ম—৩রা জুন, ১৮৬৫ খৃঃ
বিবাহ—৬ই জুলাই, ১৮৯৩ খৃঃ
প্রিন্স অব ওয়েলস উপাধি লাভ—নভেম্বর, ১৯০১ খৃঃ
প্রথম ভারতে আগমন—১৯০৫ খৃঃ
সিংহাসন লাভ—৯ই মে, ১৯১০ খৃঃ
অভিষেকোৎসব—২২শে জুন, ১৯১১ খৃঃ
দিল্লীতে দরবার—১২ই ডিসেম্বর, ১৯১১ খৃঃ
সিলভার জুবিলী উৎসব—৬ই মে, ১৯৩৫ খৃঃ
ভারত শাসন আইনে স্বাক্ষর দান—১৯৩৫ খৃঃ
মৃত্যু—২০শে জানুয়ারী, ১৯৩৬ খৃঃ

তাঁহার রাজত্বকালের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা—জার্ম্মাণ যুদ্ধ।

বিলাতে মারলব্রা হাউসে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি যুবরাজের দ্বিতীয় পুত্র; সুতরাং সিংহাসনের উত্তরাধিকারী অগ্রজের জন্মে যে উৎসবানন্দ লক্ষিত হইয়াছিল, তাঁহার জন্মে তাহা হয় নাই। সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জীবন-চরিতে কেবল দেখা যায়—৩রা জুন যুবরাজ ও যুবরাজ-পত্নীর আর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে ও ৩ই জুলাই রাণীর উপস্থিতিতে উইণ্ডসর চ্যাপেলে তাহাকে "ব্যাপ্টাইজ" করা হয়। রাণী তাহার নামকরণ করেন—জর্জ্জ ফ্রেডরিড আর্ণেষ্ট এলবার্ট।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া

৬ বৎসর বয়সে জর্জ্জের শিক্ষাভার জন নীল ড্যালটনের উপর অর্পিত হয় এবং ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে উভয় ভ্রাতাকে

নৌবহরে শিক্ষানবিশ করা হয়। নৌ-সেনাবিভাগে কায করাই তখন জর্জ্জের অভিপ্রেত ছিল। সে সময় ইংলণ্ডের উপনিবেশসমূহ বিস্তার লাভ করিতেছিল। যুবরাজ স্থির করেন, পুত্রদ্বয়ের পক্ষে সমগ্র সাম্রাজ্য দর্শনে উপকার হইবে। তদনুসারে তাঁহারা সাম্রাজ্যের নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন। বিলাত প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জ্যেষ্ঠ সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর আবশ্যক শিক্ষালাভ করিতে থাকেন ও

সপ্তম এডওয়ার্ড

জর্জ্জ নৌবহরে কায করিতে থাকেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে জর্জ্জ পীড়িত হইয়া পড়েন এবং তিনি যখন রোগশয্যায় তখন প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া মেরীর সহিত অগ্রজের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়। ইহার পরই দুরন্ত ইনফ্লুয়েঞ্জায় অগ্রজের মৃত্যুতে জর্জ্জ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়েন এবং ভিক্টোরিয়া মেরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই বিবাহের সন্তান—

(১) প্রিন্স এলবার্ট এডওয়ার্ড (বর্ত্তমান সম্রাট)—২৩শে জুন, ১৮৯৪; (২) প্রিন্স জর্জ্জ (বর্ত্তমান ডিউক অব ইয়র্ক)—১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫; (৩) প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া—২৫শে এপ্রিল, ১৮৯৭; (৪) প্রিন্স হেনরী উইলিয়ম এলবার্ট (বর্ত্তমান ডিউক অব গ্লষ্টার)—৩১শে মার্চ্চ, ১৯০০; (৫) প্রিন্স জর্জ্জ এডমণ্ড (বর্ত্তমান ডিউক অব কেণ্ট)—২০শে ডিসেম্বর, ১৯০২; (৬) প্রিন্স জন—(জন্ম—১২ই জুলাই, ১৯০৫, মৃত্যু—১৮ই জানুয়ারী, ১৯১৯)।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সপ্তম এডওয়ার্ড নামে সিংহাসন লাভ করেন। দিল্লী দরবারের (১৯০২ খৃঃ) পরই বড়লাট লর্ড কার্জ্জন যুবরাজ ও যুবরাজপত্নীকে ভারত-ভ্রমণে আসিতে বলেন বটে, কিন্তু সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড লিখেন, দরবার উপলক্ষে রাজন্যগণকে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে—সুতরাং তাহার অব্যবহিত পরেই সস্ত্রীক যুবরাজের অভ্যর্থনায় তাঁহাদিগের পক্ষে বহু অর্থ ব্যয় করা সঙ্গত হইবে না। সেই জন্য ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে যুবরাজ জর্জ্জের ভারতে আগমন ঘটে নাই।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে স্বল্পকালস্থায়ী ব্যাধিতে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যু হয় এবং ৯ই তারিখে জর্জ্জ রাজা ঘোষিত হয়েন।

ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। প্রথমবার ভারত-ভ্রমণ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া তিনি রয়াল একাডেমীতে ভারতবর্ষের কথায় বলেন—ইহা বিস্ময়কর দেশ। ইহার বৈচিত্র্য, ইহার সৌন্দর্য্য ও ইহার স্থপতিকীর্ত্তি অসাধারণ।

এই বার তিনি তাঁহার স্বাভাবিক দয়ার যে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি যখন মহীশূরের রাজার আতিথ্য স্বীকার করেন, তখন রাজা যে সময় তাঁহাকে বনমধ্যে হস্তী ধৃত করা দেখাইতে লইয়া যাইতে-

ছিলেন, তখন পথিমধ্যে অগ্রগামী সিপাহীদিগের এক জন বাইক হইতে পড়িয়া আহত হয়। তথায় লোক দেখিয়া যুবরাজ স্বীয় যান হইতে অবতরণ করেন এবং তাহার জন্য জল আনাইয়া—তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া তবে সে স্থান ত্যাগ করেন।

বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরই তিনি ভারতে তাঁহার বাণী প্রেরণ করেন—সহানুভূতি। প্রজার সহিত এই সহানুভূতি তিনি নানা ক্ষেত্রে দেখাইয়াছেন। জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বিলাতে আন্দোলন হয়—মদ্যপান বন্ধ না করিলে সমর-সরঞ্জাম উৎপাদনে বাধা ঘটিতেছে এবং জাহাজ নির্ম্মাণকারীরা মদ্যপান নিষিদ্ধ করিতে বলিলে সম্রাট স্বয়ং মদ্যপান ত্যাগ করেন ও রাজপ্রাসাদে মদ্য ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়। ফ্রান্সে অশ্ব-পতনে তিনি আহত হইলে যখন চিকিৎসকদিগের উপদেশে কয় দিন পুনরায় মদ্যপান করেন, তখন চিকিৎসকদ্বয় বিবৃতি প্রকাশ করেন—সুস্থ হইলেই তিনি পুনরায় মদ্য বর্জ্জন করিবেন।

ভারতবর্ষে শিক্ষা-বিস্তার তাঁহার বিশেষ অভিপ্রেত ছিল। সম্রাটরূপে ভারতে আসিয়া দিল্লীতে দরবারে তিনি যে ঘোষণা করেন, তাহাতেও এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছিল। দিল্লী দরবারের পর কলিকাতায় আসিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনন্দনের উত্তরে বলিয়াছিলেন, দিল্লীতে তাঁহার আদেশে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, সপার্ষদ বড়লাট শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার সাধনকল্পে অধিক অর্থ ব্যয় করিবেন। "আমার ইচ্ছা এই যে দেশের সর্ব্বত্র বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সেই সকলে যাহারা শিক্ষালাভ করিবে, তাহারা শিল্প, কৃষি প্রভৃতি সকল কার্য্যে আপনাদিগের প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারিবে। ইহাও আমার অভিপ্রেত যে, জ্ঞান-বিস্তারের ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য ও চিন্তা সম্বন্ধে উচ্চতর ধারণার ফলে আমার ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের গৃহ সমুজ্জ্বল ও পরিশ্রম লঘু হইবে। শিক্ষার দ্বারাই আমার এই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে এবং ভারতে শিক্ষা বিষয়ে আমি সর্ব্বদাই অবহিত থাকিব।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই উক্তি মর্ম্মরফলকে ক্ষোদিত

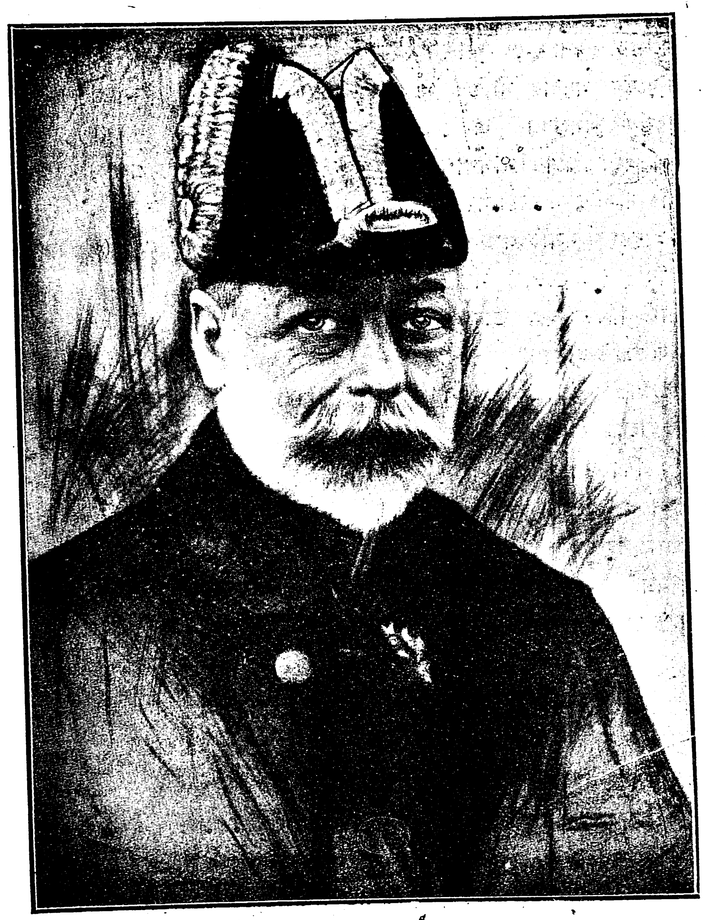

পঞ্চম জর্জ্জ

করিয়া রাখিয়াছেন। এই উক্তি পাঠ করিলে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত জাপানের সম্রাটের ঘোষণা মনে পড়ে :—

"আমার উদ্দেশ্য এই যে, অতঃপর শিক্ষা এরূপ বিস্তার লাভ করিবে যে, কোন গ্রামে কোন অজ্ঞ পরিবার থাকিবে না—কোন পরিবারেই কোন লোক অজ্ঞ থাকিবে না।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্রবণ হইতে উদ্গত বিদ্যার পাবনী ধারা শত পথে প্রবাহিত হইয়া দেশের উন্নতিসাধন করিবে, ইহাই সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের অভিপ্রেত ছিল।

শিক্ষার মত সমবায় নীতি সম্বন্ধেও তিনি আগ্রহশীল ছিলেন। নানা দরিদ্র দেশে এই নীতি যে বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করিয়াছে, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। আয়ার্লণ্ডে সার হোরেস প্লাংকেট প্রমুখ কর্ম্মীরা যখন দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের দুর্দ্দশা-দুঃখে ব্যথিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা স্থির বুঝেন সমবায়-নীতির প্রবর্ত্তন ব্যতীত সে অবস্থার পরিবর্ত্তন অসম্ভব। এ দেশে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম কৃষকদিগকে ঋণের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টায় সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জর্জ্জ বলেন :—

"যদি (এ দেশে) সমবায় নীতি সম্পূর্ণভাবে প্রবর্ত্তিত ও পরিচালিত হয়, তবে এ দেশে কৃষকদিগের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইবে।"

প্রজার মনোরঞ্জনে তাঁহার আগ্রহের পরিচয় আমরা বঙ্গবিভাগের পরিবর্ত্তনে পাইয়াছি। বঙ্গবিভাগ বাঙ্গালীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে করা হইয়াছিল বলিয়া বাঙ্গালী তাহাতে আপনাকে অপমানিত মনে করিয়াছিল এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে। যুবরাজ-রূপে সম্রাট জর্জ্জ এ দেশে আসিয়া বাঙ্গালায় আন্দোলনের প্রাবল্য লক্ষ্য করিয়া গিয়াছিলেন এবং সম্রাট হইয়া তিনি পূর্ব্বব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া বঙ্গ-ভাষাভাষীদিগকে এক-প্রদেশযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ না করিবার কোন কারণ আছে—ইহা তিনি মনে করেন নাই।

এই প্রসঙ্গে আয়ার্লণ্ডে প্রজার অধিকার-বিস্তারে তাঁহার কৃত কার্য্য স্মরণীয়। যখন রাজপুরুষগণের প্রবর্ত্তিত চণ্ড-নীতির অসাফল্য পদে পদে প্রতিপন্ন হইল, তখন তিনি স্বয়ং তথায় যে বক্তৃতা করেন, তাহাতেই নূতন নীতি প্রবর্ত্তিত হয় :—

"I appeal to all Irishmen to stretch out the hand of forbearance and conciliation, to forgive and forget, and to join in making for the land which they love, a new era of peace and contentment and goodwill."

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের রাজত্বকালে এ দেশে যে রাজ-নীতিক অধিকার-বিস্তার ঘটিয়াছে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই। সেই সম্পর্কে প্রধান বিষয়গুলি নিম্নে উল্লেখ করা গেল—

(১) মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তন ও পরে নূতন ভারত-শাসন আইন বিধিবদ্ধ করণ ;

(২) ভারতবর্ষকে অর্থনীতি সম্বন্ধে স্বাধীনতা প্রদান ;

(৩) ভারতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তনের আয়োজন ;

(৪) ভারতবাসীকে বিলাতের অভিজাত সম্প্রদায়ে গ্রহণ ;

(৫) ভারতবাসীকে সহকারী সচিবপদ প্রদান ;

(৬) সমর ও শান্তি পরিষদে ভারতবাসীর স্থান নির্দ্দেশ ;

(৭) ভারতবাসীকে গভর্ণর নিয়োগ ;

(৮) স্বরাজে ভারতবাসীর অধিকার স্বীকার।

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার-ব্যবস্থায় ও তাহার পরবর্ত্তী ভারত-শাসন আইনে ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে, এমন বলা যায় না। কারণ, যে দক্ষিণ আফ্রিকা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল এবং নানা স্থানে ইংরাজকে বিপন্নও করিয়াছিল, সেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে যে ভাবে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদান করা হইয়াছিল, ভারতবর্ষকে সে ভাবে তাহা প্রদান করা হইতেছে না। কিন্তু এই বিষয়ে দুইটি কথা স্মরণ করা প্রয়োজন—প্রথম, এ দেশে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠাই যে ইংরাজ শাসনের উদ্দেশ্য, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে ; দ্বিতীয়, এই সব বিধি-ব্যবস্থা করা রাজার ক্ষমতাতিরিক্ত—পার্লামেণ্টের অধিকারভুক্ত। নিয়মতন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত রাজা স্বীয় প্রভাবে মন্ত্রিমণ্ডলের নির্দ্ধারণ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন মাত্র।

ভারতবর্ষকে অর্থনীতি সম্বন্ধে যে স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছে, তাহার ফলে এ দেশে বয়নশিল্পের উন্নতির পথ সুগম হইয়াছে। পূর্ব্বে বিলাতের বয়নশিল্পের সুবিধার জন্য এ দেশের বয়নশিল্পেও কর সংস্থাপিত ছিল এবং সে ব্যবস্থা অসঙ্গত ও অন্যায় হইলেও তাহা বর্জ্জিত হয় নাই। প্রথম যখন এ দেশের এই শিল্পজ পণ্যের উপর কর বিদেশ হইতে আমদানী পণ্যের উপর কর অপেক্ষা কম হয়, তখন বিলাতে কাপড়ের কলওয়ালাদিগের আপত্তির উত্তরে ভারত-সচিব

(মিষ্টার চেম্বারলেন) বলেন, জার্ম্মাণ যুদ্ধে ভারতবর্ষ কেবল লোক দিয়াই বিলাতকে সাহায্য করিতেছে না ; পরন্তু অর্থ সাহায্যও করিতে চাহে এবং সেই জন্য আর্থিক প্রয়োজনে

সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড

আমদানী পণ্যের উপর কর-বৃদ্ধি করা হইতেছে। কিন্তু তাহার পর বার, যখন ভারতীয় পণ্যের আরও সুবিধা করা হয়, তখন ভারত-সচিব (মিষ্টার মণ্টেগু) নিঃসঙ্কোচে বলেন—বিদেশী পণ্যের উপর শুল্ক প্রতিষ্ঠা ভারতে শিল্পের সংরক্ষণকল্পে প্রবর্ত্তিত হইতেছে এবং সেরূপ ব্যবস্থা করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভারতবর্ষকে নূতন শাসন-ব্যবস্থায় প্রদান করা হইয়াছে। তাহার পর—ফিশক্যাল কমিশনের নির্দ্ধারণে—যে টারিফ বোর্ডের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার নির্দ্ধারণ অনুসারে এ দেশে নানা শিল্পের জন্য সংরক্ষণ শুল্ক ব্যবস্থা করা হইয়াছে ও হইতেছে। প্রথমে শিল্প কমিশনের নির্দ্ধারণ ও সামরিক প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠিত মিউনিশন বোর্ডের অভিজ্ঞতা বিশেষভাবেই প্রতিপন্ন করিয়াছে, ভারতবর্ষে নানা শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং কিছুদিনের জন্য সংরক্ষণ-

ওয়েষ্টমিনিষ্টার হলে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের শবাধার ;
শবাধারের উপর সম্রাটের মুকুট স্থাপিত

শুল্কের সুবিধা পাইলে পরে সে সব শিল্প অনায়াসে বিদেশী শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে।

সমগ্র সভ্যজগতে আজ যে বেকার-সমস্যা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিসে তাহার প্রতীকার করা যায়, সে বিষয়ে পঞ্চম জর্জ্জের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন তারিখে বিলাতে এই সমস্যার আলোচনার জন্য ৩৬টি জাতির প্রতিনিধিদিগের যে সম্মিলন হয়, তাহাতে তিনি

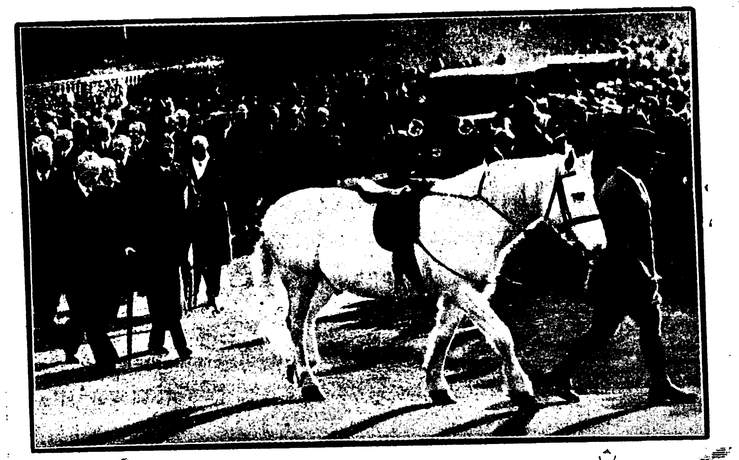

সম্রাটের শবের শোভাযাত্রা। চিত্রের শ্বেত-অশ্ব 'জ্যাক' সম্রাটের বিশেষ প্রিয় ছিল—তাহাকে শোভাযাত্রার সম্মুখে লওয়া হইয়াছে

সে সম্বন্ধে তাঁহার উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার পর মৃত্যুর কয়মাস পূর্ব্বে যখন তাঁহার শাসনকাল ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় উৎসব উপলক্ষে তিনি তাঁহার বাণী ব্যক্ত করেন, তখনও তিনি বেকারদিগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাহাদিগকে সাহায্য করিতে বলিয়াছিলেন।

এই উপলক্ষেই তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি আর যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিনের জন্য আপনাকে প্রজাপুঞ্জের কার্য্যে উৎসর্গ করিলেন।

সম্রাটরূপে ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি কলিকাতায় বলেন—"ছয় বৎসর পূর্ব্বে

নূতন সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড তাঁহার তিন সহোদরের সহিত শব-শোভাযাত্রার সঙ্গে যাইতেছেন। সম্রাট এডওয়ার্ডের পার্শ্বে লর্ড হেয়ারউড

বিলাত হইতে আমি ভারতবর্ষকে সহানুভূতির বাণী প্রদান করিয়াছিলাম; আজ ভারতে আমি ভারতবর্ষকে বলিতেছি—আশাকে মূলমন্ত্র করিতে হইবে। (I give to India the watchword of hope) আমি চারিদিকে নূতন জীবনের চিহ্ন ও চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিতেছি। শিক্ষা তোমাদিগকে আশা দিয়াছে—উন্নত শিক্ষার দ্বারা তোমরা উচ্চতর ও উন্নততর আশা গঠিত করিতে পারিবে।"

তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অষ্টম এডওয়ার্ড নাম গ্রহণ করিয়া পিতৃসিংহাসন লাভ করিলেন।

নূতন সম্রাট ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। পিতা এ দেশে আসিয়া বাঙ্গালায় যে আন্দোলন দেখিয়া গিয়াছিলেন, পুত্র সমগ্র ভারতে তদপেক্ষাও প্রবল আন্দোলন প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আগমনকালে গান্ধীজীর প্রবর্ত্তিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন অত্যন্ত প্রবল। যুবরাজ যে দিন বোম্বাইয়ে পদার্পণ করেন, সে দিন হরতাল ঘোষিত হইয়াছিল এবং গান্ধীজী স্বয়ং সে দিন তথায় উপস্থিত ছিলেন। সে দিন যে জনতাকে অহিংসায় অবিচলিত রাখা সম্ভব হয় নাই, তাহাতে গান্ধীজী যত দুঃখিত ও ব্যথিত হইয়াছিলেন, তত—হয়ত—আর কেহ হয়েন নাই। বাঙ্গালার আন্দোলনে কোথাও এরূপ বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন হয় নাই। কেবল বোম্বাইয়ে নহে, আরও নানা স্থানে তাঁহার আগমন দিবসে "হরতাল" হইয়াছিল। পিতা যে প্রজাদিগের রাজনীতিক অধিকার-বিস্তার-চেষ্টা-সমুদ্ভূত অনাচারকেও ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাহা নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনকালে তাঁহার ঘোষণায় বুঝা যায়। তখন মাণিকতলার বোমার বাগানে ধৃত ব্যক্তিরাও দণ্ডভোগ করিতেছিলেন। তিনি বড়লাটকে উপদেশ দেন, দেশের শান্তি বিপন্ন না হইলে তিনি যেন সর্ব্ববিধ রাজনীতিক অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে মুক্তিদান করেন—কেন না তাঁহারা রাজনীতিক উন্নতিলাভের আগ্রহাতিশয্যে আইন ভঙ্গ করিয়াছেন—"Let those who in their eagerness for political progress broke the law in the past, respect it in the future,"

অদূর ভবিষ্যতে ভারতে নূতন শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবে। তাহাতে ভারতে সাম্রাজ্যান্তর্গত সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন প্রদত্ত হইবে না বটে, কিন্তু গণতন্ত্রনীতির মর্য্যাদা বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিক রক্ষিত হইবে। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া আমেরিকার যুক্তরাজ্যের আদর্শানুগামী হইবে—এমন আশারও অবকাশ আছে।

মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনকালে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ রাজনীতিক অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের প্রতি যে দয়া দেখাইয়াছিলেন, তাহার কারণোল্লেখে তিনি বলিয়াছিলেন—তাঁহার ইচ্ছা এই যে, সে সময় ভারতের প্রজা ও তাহাদিগের শাসকদিগের মধ্যে বিরোধভাবের অবসান হয়। তাহাই যে নূতন সম্রাটের অভিপ্রায়—ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি। তিনি রাজা হইয়াই ঘোষণা করিয়াছেন, তিনি তাঁহার পিতার পদাঙ্কানুসরণ করিবেন। তাই আমরা আশা করিতেছি, বিনা বিচারে যাহারা বন্দী হইয়া আছে, তাহাদিগের প্রতি সম্রাটের সদয় দৃষ্টি পতিত হইবে; তিনি যে ব্যবস্থা করিবেন, তাহাতে পূর্ব্বে যাহারা আইনের বিধান ভঙ্গ করিয়াছে, ভবিষ্যতে

কলিকাতায় ময়দানে সম্রাটের শোকসভায় সমবেত জনতা—চিত্রে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, সার হরিশঙ্কর পাল প্রভৃতি ফটো—তারক দাস

তাহারা তাহা মানিয়া চলিবে—দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা দেশের লোকের সন্তোষের উপর প্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ় হইবে।

নবপ্রবর্ত্তিত শাসন-সংস্কারে গঠিত ব্যবস্থাপক সভার উদ্বোধন জন্য পঞ্চম জর্জ্জ তাঁহার পিতৃব্য ডিউক অব কনটকে এ দেশে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি প্রজ্ঞার প্রতিনিধি-রূপে বলিয়াছিলেন, ভারতবাসীর বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থার সহিত স্বৈর শাসনের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে না—কাযেই ভারত-শাসনে স্বৈর-শাসন নীতি বর্জ্জন

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের মৃত্যুতে কলিকাতার রাজপথে সঙ্কীর্ত্তনের দল ফটো—তারক দাস

করিতে হইবে। ভারতবাসীও ইহাই চাহিয়া আসিতেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বায়ত্ত-শাসনশীল অংশসমূহের অধিবাসীরা যে সব রাজনীতিক অধিকার সম্ভোগ করে, ভারতবাসী সেই সব অধিকারই চাহিতেছে এবং পঞ্চম জর্জ্জ বলিয়াছিলেন, শাসন-সংস্কারে ভারতে সেই স্বাধীনতার আরম্ভ হইল। তাহার পর পঞ্চদশ বর্ষ গত হইয়াছে। এই সময় ভারতের ইতিহাসে নানা কারণে স্মরণীয়। ইহার মধ্যে ভারতবাসীর রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষার যে পরিচয় প্রকট হইয়াছে, তাহা পঞ্চম জর্জ্জের মত তাঁহার পুত্র—বর্ত্তমান সম্রাটও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন এবং তাহাতে সহানুভূতি প্রদানেও কার্পণ্য করেন নাই।

যে ভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার পাইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে, সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ডের রাজত্বকালে ভারতবর্ষ সেই ভাবে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রাপ্ত হইয়া সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করিবে—ইহাই আজ ভারতবাসীর কামনা। পিতা যে মন্দিরের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, পুত্র তাহার উপর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে ভারতবাসীর পূজাধিকার প্রদান করিবেন, এই কামনাই আজ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার সময়—ভারতবাসীর হৃদয়ে সপ্রকাশ হইতেছে।

সাময়িকী

সার জন উডরফ—

য়ুরোপে কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারক ও তন্ত্রের নূতন ব্যাখ্যাকার সার জন উডরফের মৃত্যু হইয়াছে। সার জনের পিতাও কলিকাতা হাইকোর্টে এক জন অতি বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ছিলেন। যে সময় সার চার্লস গ্রিগরী পল, সার গ্রিফিথ ইভান্স, মিষ্টার হিল প্রভৃতি য়ুরোপীয় এবং উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সার তারকনাথ পালিত, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারদিগের জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছিল, সেই সময় সার জন উডরফের পিতা সার টি, উডরফ সেই সব উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের অন্যতম ছিলেন। ব্যারিষ্টার হইয়া পুত্র সার জন পিতার যশ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন এবং অধ্যয়নের জন্য অধিক অবসর লাভ করিবার আশায় তিনি যখন জজের পদ গ্রহণ করেন, তখনও বিচারকরূপে তাঁহার খ্যাতি অল্পদিনেই বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল।

কিন্তু বড় ব্যারিষ্টার বা বিখ্যাত জজ হিসাবে পরবর্ত্তী কালের লোক সার জন উডরফকে স্মরণ করিবে না। অন্য কারণে তিনি ভারতবাসীর শ্রদ্ধা ও সভ্য জগতের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি ভারতের পুরাতন সংস্কৃতির গৌরব উপলব্ধি করিয়া তাহার অনুরাগী হইয়াছিলেন এবং ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি—তন্ত্রের ব্যাখ্যা।

তাঁহার পূর্ব্বে অধিকাংশ বিদেশীই, অজ্ঞতা হেতু তন্ত্রের মূল তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে মানবের হীনবৃত্তির পরিপুষ্টিসাধক বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। আর আমরাও সেই সব বিদেশীর মতই অভ্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করিতাম। এমন কি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এক জন ইংরাজ লেখক তান্ত্রিক মতকে আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গের ম্যালেরিয়া-পীড়িত অধিবাসীদিগের বিকৃত মনোভাবের ফল বলিয়া মত প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।—

"It is in the most malarious regions of Eastern Bengal and Assam that we have the religion of necromancy, of charms and spells of Tantric rites which remind the scholar so vividly of the practices which characterised the decay of the Roman Empire."

সার জন উডরফ

ইংরাজ লেখকরা বলিতেন, তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের বীভৎসতা একরূপ মানসিক বিকারের ফল এবং সে বিকার হয়ত পুনঃ পুনঃ জ্বরে জীর্ণ হওয়ার দৌর্ব্বল্য হইতে উদ্ভূত।

আজ যে এই মত হাস্যোদ্দীপক অজ্ঞতার পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সত্যসন্ধিৎসায় লোক কুণ্ডলিনীর রহস্য-ভেদে ও যন্ত্রমন্ত্রের স্বরূপ নির্ণয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, সার জন উডরফের কার্য্য তাহার প্রধান কারণ।

লর্ড জেটলাণ্ড বলিয়াছিলেন, য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে তিনিই তন্ত্র সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান বিশেষজ্ঞ। কেবল তাহাই নহে—সার উইলিয়ম জোন্স যেমন অবজ্ঞাত সংস্কৃত সাহিত্যের স্বরূপ দেখাইয়া তাহাকে সমগ্র সভ্য জগতে সম্পূজিত করিয়াছিলেন, সার জন উডরফ তেমনই ঘৃণিত তান্ত্রিক ধর্ম্মের উচ্চাঙ্গের দার্শনিক তত্ত্ব বুঝাইয়া তাহাতে নিহিত ভারতীয় প্রতিভা-স্ফূর্ত্তি দেখাইয়াছেন।

কিরূপে তিনি প্রথম তন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই। কিন্তু আকৃষ্ট হইয়াই তিনি অসাধারণ উৎসাহ, আগ্রহ ও নিষ্ঠা সহকারে তাহাতে প্রবেশের চেষ্টা করেন। সে কার্য্যে তাঁহার গুরু হইয়াছিলেন শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব; আর সহকর্ম্মী—অটলবিহারী ঘোষ। শিবচন্দ্রের মত তন্ত্রশাস্ত্রে পণ্ডিত সচরাচর—বঙ্গদেশেও দেখা যায় না। উপযুক্ত শিষ্য পাইয়া গুরু যে বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অটল বাবু কলিকাতা স্মল কজেস্ কোর্টের উকীল ছিলেন। তাঁহার সহিত সার জনের বন্ধুত্ব এত ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল যে মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ যেন অটল বাবুকে তার করা হয়। তারে সেই দুঃসংবাদ যখন অটল বাবুর উদ্দেশে পাঠান হয়, তাহার চারিদিন পূর্ব্বে তিনিও মহাযাত্রা করিয়া—বন্ধুর পূর্ব্বগামী হইয়াছেন।

উপরে ভারতীয়ের বেশে সার জন উডরফ ও তাঁহার সম্মুখে অটলবিহারী ঘোষ উপবিষ্ট

১৮৬৫ খৃঃ অঃ সার জনের জন্ম হয়। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন ও ব্যারিষ্টার হইয়া ১৮৯০ খৃঃ অঃ কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবহারাজীবের কায আরম্ভ করেন। তিনি ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্যাণ্ডিংকাউন্সেল হইয়া ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জজ নিযুক্ত হয়েন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিবার পর তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় আইনের অধ্যাপক হইয়া ছিলেন।

মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

এ দেশের সভ্যতার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল এবং এ দেশে পুরুষদিগের ও স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা যে জাতীয়তার ভিত্তিভ্রষ্ট হইলে ব্যর্থ হইবে, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। মহাকালী পাঠশালায় ছাত্রীদিগকে যে ভাবে শিক্ষা প্রদান করা হয়, তিনি তাহার সমর্থক ছিলেন। আজ

যখন এ দেশে শিক্ষা-সংস্কারের কথা আলোচিত হইতেছে, তখন আমরা সকলকে স্যাডলার কমিশনের জন্য লিখিত সার জনের বিবৃতি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। এ দেশের পুরাতন শিল্পের প্রতি তাঁহার অনুরাগ কত প্রবল ছিল, তাহা বেঙ্গল হোম ইণ্ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠাকালে তাহার উদ্দেশ্য বিবৃতিতে দেখা যায়। যে বিবৃতি সার জনের লিখিত।

"আর্থার এভেলন" ছদ্মনামে তিনি—অটল বাবুর সহযোগে ও একাধিক পণ্ডিতের সাহায্যে বহু তন্ত্র গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং নানা পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা করিয়া তন্ত্রের তত্ত্ব ও ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ বুঝাইয়াছিলেন।

যে নীলাচলে জগন্নাথের মন্দিরে সাধনা শেষ করিয়া চৈতন্যদেব নীলাম্বুবিস্তারমধ্যে নীলমণিময় দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া—নীলাম্বুকল্লোলে তাঁহার বংশীধ্বনি শুনিয়া সাগরের নীলজলে মধ্যে বিলীন হইয়াছিলেন—সেই জগন্নাথ-ক্ষেত্রের নীলাম্বুবেলায় সার জনকে নগ্নপদে ভ্রমণ করিতে করিতে চিন্তারত অবস্থায় অনেকে দেখিয়াছেন। তিনি কি তখন হিন্দুসভ্যতার ও হিন্দুধর্ম্ম-তত্ত্বের রহস্যভেদ চেষ্টাই করিতেন? জাম্ববতী-তনয় শাম্ব অজ্ঞানকৃত পাপের জন্য পিতৃকর্ত্তৃক অভিসম্পাতপ্রাপ্ত হইয়া যে অর্কক্ষেত্রে আসিয়া দ্বাদশবর্ষকাল শান্ত, দান্ত, নিরাহার, জিতেন্দ্রিয় হইয়া সাধনার ফলে সর্ব্বপাপঘ্ন দিবাকরের আশীর্ব্বাদে পাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন, সেই কণার্ক মন্দিরে তিনি বাঙ্গালীর বেশে যখন নবগ্রহাদি শিল্পকীর্ত্তি তন্ময় হইয়া দেখিতেন, তখন কি তিনি ধ্যানমগ্নই হইতেন? স্মরণাতীত কাল হইতে যে ভুবনেশ্বর লক্ষ লক্ষ ভক্তের পূজাপুত—সেই ভুবনেশ্বরের মন্দিরের বাহিরে বাঙ্গালীর বেশে নগ্নপদে—উত্তরীয়াচ্ছাদিত দেহে তিনি যখন উপবিষ্ট থাকিতেন, তখন কি তিনি মন্দিরের দেবতাকে নিবেদন জানাইতেন—ভিন্ন জাতির মধ্যে ও ভিন্ন ধর্ম্মের অঙ্কে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি যে মন্দিরে প্রবেশের অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছেন, জন্মান্তরে যেন তাহাতে প্রবেশের অধিকার লাভ করেন? কে বলিতে পারে?

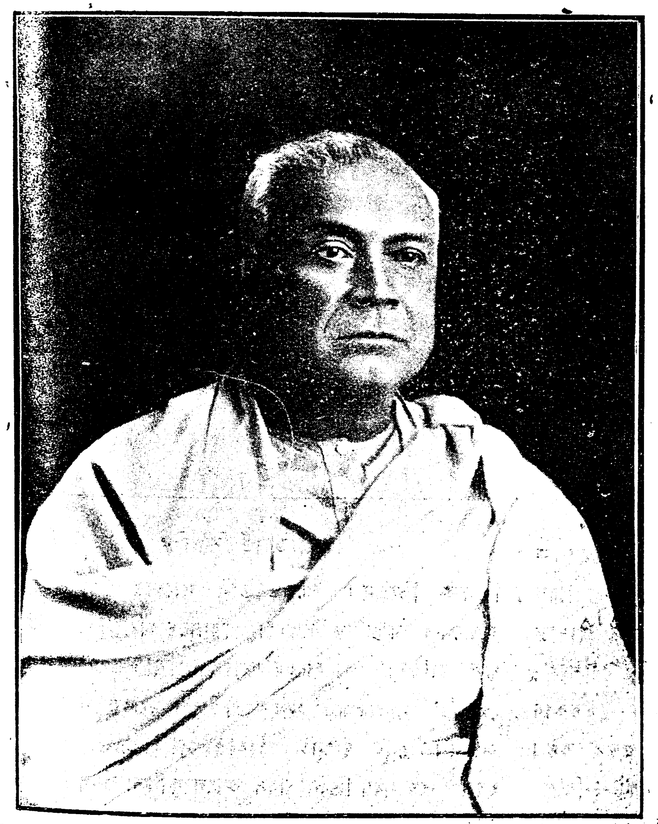

অটলবিহারী ঘোষ

আজ এই বিদেশী ভারত-বন্ধুর জন্য ভারতবর্ষ—বিশেষ তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ও সাধনার স্থান বাঙ্গালা—বিয়োগ-বেদনা অনুভব করিতেছে। তাঁহার কৃত কার্য্য যেমন তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে, তেমনই স্বভাবতঃ কৃতজ্ঞ ভারতবাসী—বিশেষ বাঙ্গালী কখন শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাকে স্মরণ করিতে বিরত হইবে না।

অটলবিহারী ঘোষ—

গত ২৭শে পৌষ ৭২ বৎসর বয়সে অটলবিহারী ঘোষের মৃত্যু হইয়াছে। অটল বাবু একই বৎসরে বি, এ, ও এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উকীল হইয়া কলিকাতা ছোট আদালতে ব্যবহারাজীবের কায আরম্ভ করেন। তিনি জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসর

কাল ব্যবসা ত্যাগ করিয়া সার জন উডরফের সহিত একযোগে তন্ত্রশাস্ত্র প্রচার ও ব্যাখ্যার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। উকীল অবস্থায় সার জনের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। উভয়ে একযোগে সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে থাকেন। পরে পাতিয়ালার রাজস্ব মহারাজার ও মহারাজা সার রমেশ্বর সিংহের (দ্বারবঙ্গ) বদান্যতায় "আগমানুসন্ধান সমিতি" প্রতিষ্ঠিত করিয়া উভয়ে তান্ত্রিক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে থাকেন। অটলবাবুর ও সার জন উডরফের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এইরূপ ১৯ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সব গ্রন্থে দেবনাগর অক্ষরে মূল ও ইংরাজীতে টীকা ও ভূমিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরাজী অনুবাদও অবজ্ঞাত হয় নাই। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন, গত ২৫ বৎসর কাল যে কায করিয়াছেন, তাহা ব্যর্থ হয় নাই; কেন না লোক এখন তন্ত্রের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা বর্জ্জন করিয়া তাহার স্বরূপ জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। মৃত্যুকালে তিনি কালিদাসের অপ্রকাশিত কবিতা 'চিদ্‌গন-চন্দ্রিকা' প্রকাশে ব্যাপৃত ছিলেন।

অটলবাবু নিরহঙ্কার ছিলেন এবং তাঁহার মত সংস্কৃত পণ্ডিত বিরল হইলেও তাঁহার ব্যবহারফলে ও আত্মগুণ-গোপন-স্পৃহার জন্য—অনেকে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের বিষয় অবগতও ছিলেন না। "আর্থার এভেলন" ছদ্মনামে সার জন ও অটল বাবু পুস্তক প্রকাশ করিতেন।

অটলবাবুর মৃত্যুতে আমরা একজন পরম পণ্ডিত হারাইলাম।

রাডিয়ার্ড কিপলিং—

বিলাতের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক—কবি ও গল্পলেখক রাডিয়ার্ড কিপলিংএর মৃত্যু হইয়াছে। তিনি সাম্রাজ্যবাদের কবি ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; ইংরাজের প্রাধান্য—ইংরাজের গৌরব কীর্ত্তন করাই তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য; আর শ্বেত জাতির গর্ব্বও তিনি সমর্থন করিতেন—শ্বেতকায় জাতিরা যেন অন্যান্য জাতির কল্যাণ সাধনের জন্যই সৃষ্ট। সুতরাং তাঁহার রচনা যে শ্বেতকায়দিগের নিকট—বিশেষ ইংরাজের বিশেষ আদৃত তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। কোন কোন কবিতার জন্য তিনি প্রতি শব্দে প্রায় ২ টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক পাইয়াছেন।

কিপলিং যে নানা শ্রেণীর জীবের ও মানুষের বিষয় সরস রচনায় বিবৃত করিতে পারিতেন, তাহার কারণ সন্ধান করিয়া কোন প্রসিদ্ধ সমালোচক বলিয়াছেন, যে ভারতবর্ষে জন্মান্তরবাদ আদৃত সেই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ ও শিক্ষালাভ করায় তিনি নিশ্চয়ই এই দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

বোম্বাই সহরে কিপলিং জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার পিতা—শিল্পী লকউড কিপলিং—তথায় শিল্প বিদ্যালয়ে

রাডিয়ার্ড কিপলিং

শিক্ষক ছিলেন। পরে তিনি লাহোর শিল্প বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষের কায করিতেন। বিলাতে শিক্ষা শেষ করিয়া পুত্র রাডিয়ার্ড লাহোরেই আসিয়া 'সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট' সংবাদপত্রে সহকারী সম্পাদকের কায আরম্ভ করেন। সেই স্থানেই তাঁহার সাহিত্যিক শিক্ষানবিশী হয়। এই সময় তিনি অবসরকালে কবিতা রচনা করিতেন। লাহোরের উদ্যানে যে ব্যাণ্ড বাজিত তাহারই সুরে তিনি গান রচনা করিতেন। সেগুলি 'সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেটে' প্রকাশিত হইত। তিনি লিখিয়াছেন, ছাপাখানার ফোরম্যান রুকন-দীন সে গুলির খুব আদর করিত; বলিত —"আপনার কবিতা খুব ভাল—আজ ঠিক যতটুকু জায়গা খালি ছিল, তাহার মত হইয়াছে।" সে সেগুলি "পাদ-পূরণে" ব্যবহার করিত। আর কম্পোজিটর মামুদ আসিয়া কবিতা চাহিত—"এক আউর চীজ।"

ক্রমে এই সব কবিতা আদৃত হয় এবং তিনি সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশের আয়োজন করেন। কাগজের এক পৃষ্ঠায় ছাপা ও "বালীর" কাগজে বাঁধা পুস্তকের মূল্য ১ টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া তিনি সকল বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীদিগের নিকট উহা—পত্র লিখিয়া—পাঠাইয়া দেন। গ্রন্থকার ও প্রকাশক দুই-ই এক। ইহাই তাঁহার প্রথম পুস্তকের জন্মের ইতিহাস।

লাহোরের দুরন্ত গ্রীষ্মে ছাপাখানায় কম্পোজ ঘর অপেক্ষাকৃত শীতল বলিয়া তিনি তথায় বসিয়া রাত্রিতে রচনা করিতেন। তখন তিনি ঐ পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, কিপলিং চঞ্চল ছিলেন এবং কলমভরা কালী এমনভাবে ছড়াইতেন যে দিনশেষে তিনি যখন গৃহে ফিরিতেন তখন তাঁহার সাদা কোট প্যাণ্টালুন কালীর ছাপে চিত্রিত হইয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষে বাসকালে যুবক রাডিয়ার্ড অত্যন্ত আমোদ-প্রিয় ছিলেন। সাত বৎসর ভারতবর্ষে নানা স্থান ও নানা রূপ লোক লক্ষ্য করিয়া তিনি রচনার বিচিত্র উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে ইংরাজ সে কথা তিনি ইংরাজের স্বাভাবিক গর্ব্বসহকারে সর্ব্বদাই স্মরণ করিতেন। ইংরাজ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন:—

করে বটে বাস তা'রা দেশ দেশান্তর,
হৃদয় তা'দের কিন্তু রহে এক স্থানে;
জননীর মুখে শুনি' শিশুর অন্তর—
সুদূর ইংলণ্ড তা'র দেশ বলি' জানে।

তাঁহার মতে সাগরে ইংরাজের প্রাধান্য বিশেষ গর্ব্বের বিষয়। তিনি গর্ব্বভরে লিখিয়াছেন—

"সিন্ধুর আহার মোরা জোগায়েছি সহস্র বৎসর।"

সাময়িক নানা বিষয়ে তিনি কবিতা রচনা করিয়াছেন। সে সকলের মধ্যে সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উপলক্ষে রচিত ক্ষুদ্র কবিতাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেই কবিতায়

প্রথম পাঠকরা বুঝিতে পারেন, সাম্রাজ্যবাদের কবি রাডিয়ার্ড সময় সময় গম্ভীরভাবে মানবের অন্তর্নিহিত ভাবের অভিব্যক্তি অনুভব করিয়া থাকেন। সেই কবিতায় তিনি দেবতার কৃপা ভিক্ষা করিয়া বলেন, ইংরাজ যেন সম্পদের ও সমৃদ্ধির গর্ব্বে তাঁহাকে বিস্মৃত না হয়; কেন না—সম্পদ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইতে বিলম্ব হয় না। বোধ হয়, ভারতের শিক্ষা ও প্রভাব তাঁহার ইংরাজ-প্রকৃতিগত ঔদ্ধত্য ও গর্ব্ব সংযত করিয়াছিল। সে প্রভাব সময় সময় তাঁহার রচনায় আত্মপ্রকাশ করিত।

তাঁহার বহু ক্ষুদ্র গল্পে অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কয়খানি উপন্যাস রচনাও করিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য, ইংরাজী সাহিত্যে ঔপন্যাসিক থ্যাকারের সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে না। কিন্তু এ কথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষে যে সব ইংরাজ সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে থ্যাকারের পর রাডিয়ার্ড কিপলিংএর মত যশ অর্জ্জন করা আর কাহারও ভাগ্যে সম্ভব হয় নাই। অবশ্য থ্যাকারে মানব-প্রকৃতি নখদর্পণে দেখিতেন এবং তিনি মানব-প্রকৃতির চিত্রকর; আর রাডিয়ার্ড কিপলিং ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদের কবি। এক জন প্রসিদ্ধ ইংরাজ সাংবাদিক তাঁহাকে Banjo-bard of the Empire নামেও অভিহিত করিয়াছেন।

রাডিয়ার্ড কিপলিং ভারতীয় প্রভাবের পরিচয় তাঁহার বহু রচনায় রাখিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার অনেক রচনার উপকরণ তিনি ভারতবর্ষ হইতেই সংগ্রহ করিয়া ইচ্ছানুসারে সে সকলের ব্যবহার করিয়াছিলেন।

মূক ও বধির শিল্পী
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চৌধুরী—

মানুষের চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম তাহার অসুবিধা সত্ত্বেও তাহাকে উন্নতির পথে কতদূর লইয়া যাইতে পারে, তাহা মূক ও বধির শিল্পী বিপিনবিহারী চৌধুরী মহাশয়ের পরিচয় হইতে জানিতে পারা যায়। বিপিনবিহারীর বয়স বর্ত্তমানে মাত্র ২৬ বৎসর; তিনি প্রথমে কলিকাতায় মূক বধির বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন; তথায় তিনি কথা বলিতে

সমর্থ হন এবং বৎসর বৎসর সকল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার লাভ করিতে থাকেন। বিদ্যালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া তাঁহাকে এক সময়ে তৎকালীন গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডসের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল। তাহার

মিঃ লয়ার্ডজর্জ্জ (পেন্সিলে অঙ্কিত)

পর গভর্ণমেণ্টপ্রদত্ত বৃত্তি লাভ করিয়া তিনি ছয় বৎসর কলিকাতা আর্ট স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন—সেখানেও

নৃত্যকারী দল

তিনি সহপাঠী সকল ছাত্রকে পরাজিত করিয়া বহু পুরস্কার ও মেডেল লাভ করিয়াছিলেন। শেষ পরীক্ষায় তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। কিছুকাল বোম্বাই আর্ট স্কুলে শিক্ষা লাভের পর ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনে গমন করেন। তিনি অর্থহীন অবস্থায় লণ্ডনে পৌঁছিয়া নিজ

বিপিনচন্দ্র চৌধুরী ও অন্যান্য দেশবাসী মূক-বধিরগণ

চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ের দ্বারা রয়াল আর্ট কলেজে প্রবেশ করেন। প্রথম পরীক্ষার সময়েই পরীক্ষকগণ তাঁহার

শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী এ-আর-সি-এ (লণ্ডন)

মূক-বধির আর্টিষ্ট

অসামান্য প্রতিভা দর্শনে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন ; তাঁহাদের অনুগ্রহে এবং হাই-কমিশনার সার ভূপেন্দ্র নাথ মিত্র ও

ব্যবসায়ী সার আলেকজাণ্ডার মারে'র অর্থ সাহায্যে তিনি তিন বৎসর তথায় শিক্ষা লাভ করেন।

তিনি ভারতের কমার্শিয়াল আর্ট সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান আহরণ করেন এবং রয়াল কলেজ হইতে পেণ্টিং-এর ডিগ্রী লাভ করেন। উক্ত কলেজের প্রিন্সিপাল সার রথেনষ্টিন বিপিনবিহারী সম্বন্ধে জানাইয়াছেন—"ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া শিক্ষক ও গবেষক হিসাবে তিনি দেশের উপকার করিতে সমর্থ হইবেন।" বিলাতের 'ডেলি মেল' 'ডেলি মিয়ার' প্রভৃতি পত্রে তাঁহার নৈপুণ্যের প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে কলিকাতার 'ষ্টেট্‌সম্যান' এবং বোম্বায়ের 'টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া' তাঁহার প্রশংসা ও পরিচয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিপিনবিহারীর অঙ্কিত যে দুইখানি চিত্র সর্ব্বত্র সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে, আমরা তাহা এই সঙ্গে প্রকাশ করিলাম। একখানি "পেন্সিলে অঙ্কিত মিঃ লয়াড জর্জ্জের প্রতিকৃতি"। এই ছবিখানি দেখিয়া বিলাতের শ্রমিকদলের নেতা খ্যাতনামা রাজনীতিক মিঃ ল্যান্সবারী ইহার নৈপুণ্যে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। অপর চিত্রখানিতে 'একদল নর্ত্তকী' প্রদর্শিত হইয়াছে। মহামান্য আগা খাঁ দ্বিতীয় চিত্রখানির অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। বিলাতস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার তত্রস্থ "ইণ্ডিয়া হাউস" সাজাইবার জন্য চিত্র দুইখানি রাখিয়া দিয়াছেন।

কলিকাতায় "শিক্ষা-সপ্তাহ"—

সোৎসাহে কলিকাতায় "শিক্ষা-সপ্তাহ" অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালার গভর্ণর, বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রভৃতি বক্তৃতা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে যে কি ফল ফলিবে—কি জন্য যে এই অর্থব্যয়—তাহা বুঝা যায় না। যে স্থানে বাঙ্গালার নানা স্কুল ও কলেজের প্রায় ১৭ শত প্রতিনিধি সমবেত হইয়াছিলেন—সে স্থানে যে বক্তৃতা ও সভাশোভন ব্যতীত শিক্ষা-বিষয় প্রকৃত আলোচনা হইতে পারে, তাহা মনে হয় না। ইংরাজীতে যাহাকে demonstrative বলে—এই অনুষ্ঠান তাহা হইতে পারে, শোভার্থ মাত্র হয় ; কিন্তু যাহাকে deliberative বলা হয়, তাহার আশা করা যায় না। নূতন শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বাহ্নে এই নূতন অনুষ্ঠানে মন্ত্রীর উদ্যম প্রকাশ পাইতেছে সন্দেহ নাই ; কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা হয়—ইহাতে "কি লভিনু ?" তবে কোন সন্তোষজনক ও উৎসাহপ্রদ উত্তর পাওয়া যায় কি ?

বলা বাহুল্য মন্ত্রী তাঁহার উদ্বোধন-বক্তৃতায় অনেক বড় কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এখন শিক্ষার শক্তি আর বিদ্যালয়েরই বদ্ধ নহে ; পরন্তু পাঠাগার, যাদুঘর, রঙ্গালয়, ব্যায়াম-সম্মিলন, সভা, ক্ষেত্র, কলকারখানা, সংবাদপত্র প্রভৃতির সাহায্যেও তাহা ব্যাপ্তিলাভ করিতেছে। আর এখন সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ আরম্ভ হইয়াছে। এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার প্রচারিত—নানা ত্রুটিপূর্ণ—বিবৃতির উল্লেখ করেন ও বলেন, শিক্ষাবিস্তার ও শিক্ষার উন্নতি সাধনই সে বিবৃতির মূল কারণ।

"It is in this spirit of critical analysis that in tackling the problems of education, we intend to initiate in this Eduation Week, a programme of work which attempts a new orientation, through a variety of channels, in order that its extension and projection may permeate every school in Bengal."

শিক্ষার নূতন ব্যবস্থার কোন পদ্ধতি-পরিচয় কিন্তু আমরা কাহারও বক্তৃতায় পাইলাম না। পরন্তু আমাদিগের মনে হয়, যে সরকার আজও বাঙ্গালায় প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে পারিলেন না, সে সরকারের পক্ষে এবং যে মন্ত্রী নির্ব্বিকারভাবে ঘোষণা করিতে পারেন, মাসিক ১৫ টাকা হইতে ২০ টাকা বেতনে উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যায় সে মন্ত্রীর পক্ষে—শিক্ষা-পদ্ধতির প্রকৃত পরিবর্ত্তন সাধনের কথা না বলিলেই শোভন হয়।

যে দিন মন্ত্রীর এই বক্তৃতা হয়, তাহার পরদিনই ভারত সরকারের শিক্ষা কমিশনার সার জর্জ্জ এণ্ডার্শন বলেন—যে সকল কারণে শিক্ষার গতি প্রহত হইতেছে, সে সকলেরই উচ্ছেদ-সাধন শিক্ষাবিভাগের সাধ্যাতীত। তিনি সে সকল কারণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে দারিদ্র্যের উল্লেখ করেন—

নানারূপ দারিদ্র্য এই পথে বিঘ্ন বিস্তার করিতেছে। সরকারের ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থাভাব। আবার দেশের জনগণের দারিদ্র্য এমন মর্ম্মন্তুদ যে, তাহারা দেহে প্রাণরক্ষা করাই দুষ্কর বলিয়া অনুভব করে ; সুতরাং

সন্তানদিগকে শিক্ষার্থ নিযুক্ত না করিয়া অন্নার্জ্জনের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হয়। ইহা ভিন্ন ব্যাধির বিস্তার শিক্ষাবিস্তার পথ বিঘ্নাবৃত করিতেছে এবং যাতায়াতের অসুবিধাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সর্ব্বাগ্রে আমরা সরকারের অর্থাভাবের আলোচনা করিব। লর্ড মেষ্টন এ দেশে প্রাদেশিক ছোট লাট ও ভারত সরকারের অর্থ-সচিব ছিলেন। প্রদেশসমূহের সহিত ভারত সরকারের যে আর্থিক ব্যবস্থায় বাঙ্গালা তাহার আয়ে ব্যয়সঙ্কুলান করিতে পারিতেছে না—সে ব্যবস্থার জন্য তিনি দায়ী। সে দিন কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্পোরেশনের স্বার্থরক্ষার্থ এ দেশে আসিয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন—সর্ব্ববিধ ব্যয়বাহুল্যের উপর কর ধার্য্য করিয়া সরকার আয়-বৃদ্ধি করিলে ভাল হয়। যদি এই নীতি অবলম্বনীয় হয় তবে কি সর্ব্বাগ্রে সরকারকেই কর দিতে হয় না? তিনি বিবাহের ব্যয়ের উপরও কর স্থাপন করিতে বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যে সিভিল সার্ভিসে চাকরীর ফলে প্রভূত অর্থ অর্জ্জন করিয়া এ দেশ হইতে গিয়াছেন, সেই সার্ভিসের লোকের বেতন-বাহুল্যের বিষয় মনেও করেন নাই। অথচ পৃথিবীর আর কোন দেশে সিভিল সার্ভিসে এত অধিক বেতনের ব্যবস্থা নাই। কেবল তাহাই নহে—প্রচলিত শাসন-পদ্ধতিতে যাঁহারা মন্ত্রী হইয়াছেন, তাঁহারাও সেই সার্ভিসে বিদেশী চাকরীয়াদিগের অত্যধিক বেতনের তুল্য বেতন সম্ভোগ করিয়া আসিতেছেন। সে বেতন যে দরিদ্র দেশের লোকের আয়ের তুলনায় অত্যন্ত অধিক তাহা মনেও করেন নাই। ইহাতে যে সরকারের অর্থাভাব অনিবার্য্য তাহা বলা বাহুল্য। "শিক্ষা-সপ্তাহের" অনুষ্ঠান করিয়া বাঙ্গালার নানা স্থান হইতে শিক্ষকদিগকে আনিয়া সভাশোভন করিলে যে শিক্ষা-প্রণালীতে প্রকৃত উন্নতি প্রবর্ত্তনের কোন উপায় হইবে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী তাঁহার বিবৃতিতে যে শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের আভাস দিয়াছেন, তাহার দ্বারা যে প্রকৃত উপকার হইবে—বর্ত্তমান শিক্ষার ত্রুটি দূর হইবে, এমন মনে করিবার কোনই কারণ নাই। শিক্ষার ত্রুটির বিষয় এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনকালে বাঙ্গালার গভর্ণরও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সে সব ত্রুটি সংশোধনের জন্য সরকার কি করিতেছেন? আজ যে শিক্ষার ত্রুটির দিকে সরকারের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, বেকার-সমস্যার উগ্রতাই কি তাহার কারণ নহে? অথচ যে শিক্ষায় ছাত্রদিগের মধ্যে বেকার-সমস্যাই বিস্তারলাভ করিতেছে, ছাত্রীদিগকেও সেই শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে! যে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে, তাহার সর্ব্বপ্রধান দৌর্ব্বল্য কোথায়, তাহা কি লক্ষ্য করা হইতেছে? এই শিক্ষার সহিত এ দেশের অবস্থা ব্যবস্থার, সমাজের সংস্কৃতির কোন সম্বন্ধ নাই এবং প্রধানতঃ সেই জন্যই ইহার ফলে সমাজের ভিত্তি শিথিল হইয়া যাইতেছে। যে শিক্ষার সহিত জাতির বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক নাই, সে শিক্ষা বিদ্যাকে কেবল অর্থকরী মনে করায় প্রকৃত ফলপ্রদ হইতে পারে না। এ দেশে ইংরাজ যে শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহা দেশীয় দীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে—সর্ব্বতোভাবে বিদেশী। গত শত বৎসরে ইহার প্রভাব সমাজে অনিষ্ট-সাধনই করিয়াছে—ইহা যদি শত শত লোকের অন্নার্জ্জনের উপায় করিয়া দিয়া থাকে, তবে সহস্র সহস্র লোককে বৃত্তিচ্যুত করিয়াছে, সমাজে যে স্তর-বিভাগ ছিল তাহা নষ্ট করিয়া কাঞ্চন-কৌলিন্যের প্রবর্ত্তন করিয়াছে, সমাজ হইতে সন্তোষের নির্ব্বাসন সাধন করিয়াছে এবং যত দিন যাইতেছে ততই দেখা যাইতেছে—ইহা মনীষার স্ফুরণেও সহায় হইতে পারিতেছে না।

স্যাডলার কমিশনের মত বিশেষজ্ঞ-সঙ্ঘ যখন শিক্ষায় আবশ্যক পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তনের প্রকৃত উপায় নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই, তখন যে কয়দিনের শোভাসভারূপে "শিক্ষা-সপ্তাহের" অনুষ্ঠান করিয়া শিক্ষাদানকার্য্যে শিক্ষানবিশ মন্ত্রী তাহা করিতে পারিবেন, এমন আশা কখনই করা যায় না। ইহা বিজ্ঞাপনের উপায় ও নির্ব্বাচনের সোপান হইতে পারে; কিন্তু ইহার দ্বারা শিক্ষার আবশ্যক সংস্কারোপায় নির্দ্ধারণের উপায় স্থির করা হইতে পারে না এবং সেই জন্য ইহার জন্য ব্যয়িত অর্থ অপব্যয়ের পর্য্যায়ভুক্ত না বলিয়া পারা যায় না। আমরা সরকারকে এই অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্তে বিশেষজ্ঞদিগের সাহায্যে এ দেশে দেশকালপাত্রোপযোগী শিক্ষার প্রবর্ত্তনোপায় স্থির করিবার চেষ্টায় রত দেখিলে সুখী হইব এবং সে বিষয়ে যে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সরকারকে সাহায্য করিবেন, এ আশাও আমরা করি।

আর্ট স্কুলের সরস্বতী মূর্ত্তি—

গত শ্রীপঞ্চমীতে কলিকাতা বহুবাজারস্থ ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের ছাত্রগণ স্বহস্তে নির্ম্মিত যে সরস্বতী মূর্ত্তির পূজা করিয়াছিলেন, তাহার চিত্র এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল।

শ্রীশ্রীসরস্বতী

ইণ্ডিয়ান আর্ট-স্কুলের উত্তীর্ণ ছাত্র গোষ্ঠ দ্বারা গঠিত

ফটো—শচীন সেন

আধুনিক মূর্ত্তি গঠনেও শিল্পের ধারা কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা এই চিত্রটি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

সঙ্গীতজ্ঞ অবিনাশচন্দ্র—

গত ২০শে পৌষ কলিকাতায় বিখ্যাত ধ্রুপদ-গায়ক অবিনাশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু হইয়াছে। "বিলম্বিত" ধ্রুপদ গায়কদিগের মধ্যে তিনি যেরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, সেরূপ অল্প সংখ্যক গায়কই লাভ করিতে পারিয়াছেন। ইনি বিশেষ যত্ন ও নিষ্ঠা সহকারে সঙ্গীতাচার্য্য সেখ মুরাদ আলি খাঁর নিকট শিক্ষা লাভ করেন এবং কেশবচন্দ্র মিত্র, অনন্তরাম মুখোপাধ্যায়, বসন্তলাল হাজরা, ভেইয়ালাল, উপেন্দ্র বসাক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী "সঙ্গত" করিয়া তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। অবিনাশবাবু সঙ্গীত সম্বন্ধে যে বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা অসাধারণ। যৌবনে তিনি শারীরচর্চ্চায় কৃতিত্ব লাভ

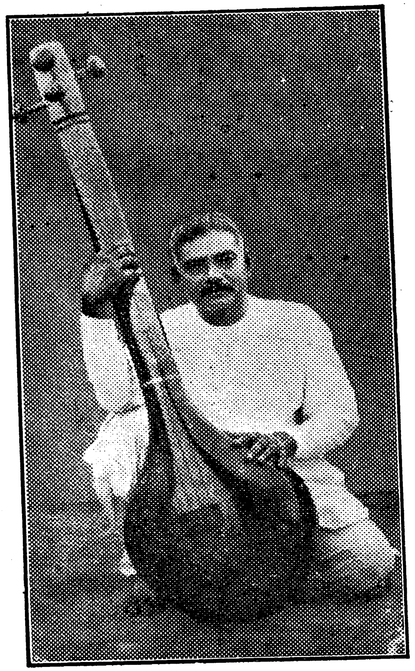

সঙ্গীতজ্ঞ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ

করিয়াছিলেন এবং নানা ক্ষেত্রে সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বাসপল্লীতে এক পরিবারে দুরন্ত বসন্ত রোগে কয় জনের মৃত্যুর পর যখন একটি বালিকার মৃত্যু হয়, তখন সৎকার করিবার লোকের অভাব ঘটিয়াছে জানিয়া তিনি একাকী সেই বসন্ত রোগে মৃত বালিকার শব বহন করিয়া শ্মশানে সৎকারার্থ লইয়া গিয়াছিলেন। সঙ্গীত-চর্চ্চাব্যপদেশে তিনি ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ স্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং নানা ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় তিনি যখন যে বিষয়ের আলোচনা

করিতেন, তখন তাহাতেই বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিতেন। কয় মাস রোগ ভোগ করিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। ১২৭৪ বঙ্গাব্দে ৩১শে শ্রাবণ তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। কেবল ধ্রুপদ্ গানে নহে, তিনি তানপুরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র স্বহস্তে প্রস্তুত করিতেও বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার মৃত্যুতে এক জন "গুণী" হারাইয়াছি।

উপাধিলাভ—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবার কয়েকজন মনীষীকে সম্মানিত উপাধি প্রদান করিবেন শুনিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম। যে কয়েকজন এই উপাধি লাভ করিবেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন ব্যতীত আর সকলেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট উপাধিধারী। যিনি এতদিন কোন উপাধি লাভ করেন নাই, তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃত গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন—আমাদের শ্রীমান্ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডি-লিট্ উপাধি লাভ করিবেন। বাঙ্গালা কথা-সাহিত্য ক্ষেত্রে শ্রীমান্ শরৎচন্দ্র যে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত, ডি-লিট্ উপাধি সে আসনের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি না করিলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সঙ্কল্পকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করিতেছি। শ্রীভগবান শ্রীমান্ শরৎচন্দ্রকে দীর্ঘজীবী করুন; তিনি বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে আরও অধিক প্রশংসা অর্জ্জন করুন।

শ্রীমান্ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পরলোকে অধ্যাপক বিপিনবিহারী—

আমাদের পরমহিতৈষী বন্ধু, 'ভারতবর্ষে'র কৃতী-লেখক অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়ের পরলোক গমন সংবাদে আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। বিগত ১৯শে মাঘ রবিবার রাত্রি

অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত

দশটার সময় তিনি তাঁহার রামকৃষ্ণপুরের (হাওড়া) ভবনে ৬১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বিপিনবাবু আমাদের পরম সুহৃদ ছিলেন; 'ভারতবর্ষে'র সূচনা হইতে বহু বৎসর পর্য্যন্ত তিনি 'ভারতবর্ষে'র নিয়মিত লেখক ছিলেন; তাঁহার 'বিবিধ-প্রসঙ্গ' 'পুরাতন-প্রসঙ্গ' প্রভৃতি পুস্তকের অধিকাংশ প্রবন্ধই

'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল। আমাদের 'সাময়িকী'র তিনিই প্রবর্ত্তক। কয়েক বৎসর যথানিয়মে তিনি সাময়িকী লিখিয়াছেন। বিগত কয়েক বৎসর শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য তিনি লেখাপড়া একেবারে ত্যাগ করেন। শিক্ষকতাকে তিনি জীবনের ব্রত স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকুরী গ্রহণ করেন নাই। কলিকাতার সাহিত্যিকগণের, বিশেষতঃ তাঁহার পরম বন্ধু আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের সাহচর্য্য লাভের জন্য তিনি শ্রীহট্টের মুরারীচাঁদ কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করিয়া কলিকাতা রিপণ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক হইয়া আসেন এবং সেই কার্য্যেই জীবন শেষ করেন। বিপিনবাবুর পরলোক গমনে আমরা পরমাত্মীয়ের বিয়োগ-বেদনা অনুভব করিতেছি।

কামিনীকুমার চন্দ—

পরিণত বয়সে শিলচরের প্রসিদ্ধ উকীল ও কংগ্রেসের কর্ম্মী কামিনীকুমার চন্দ মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। কামিনীবাবু বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি শ্রীহট্টাগত বাঙ্গালী যুবকদিগের মতই সোৎসাহে দেশ-সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন জানিয়া তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে শিলচরে যাইয়া ওকালতী করিতে আদেশ করেন এবং তিনি সেই উপদেশ শিরোধার্য্য করেন। তথায় অল্পদিনের মধ্যেই তিনি প্রধান উকীল বলিয়া বিবেচিত হয়েন এবং চা-কররাও তাঁহাদিগের মামলায় কামিনীবাবুকে উকীল নিযুক্ত করিতেন। উকীল হইবার কয়বৎসর পরেই তিনি বালাধুন হত্যা মামলায় হাইকোর্টে আপীল করিয়া দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে নিরপরাধ প্রতিপন্ন করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। সেই মামলা পরিচালনকালে তিনি যেরূপ শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা সে সময় তাঁহাকে দেখেন নাই, তাঁহারা অনুমান করিতেও পারিবেন না। এক এক দিন মামলার নথীপত্র দেখিতে দেখিতে তিনি আহার করিতেও ভুলিয়া যাইতেন। তিনি যখন বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দেন, তখন কোন ইংরাজ-চালিত পত্র বলিয়াছিলেন—আসামের চা-কররাই কামিনী বাবুকে বড় করিয়াছেন; তাঁহারা তাঁহাকে টাকা দিতে পারেন, কিন্তু বুদ্ধি ত দিতে পারেন না।

পুরাতন কংগ্রেসের তিনি একজন একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় তিনি নানা বিষয়ে দেশের অনিষ্টকর কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যখন ভারত সরকার আইন করিয়া পাঞ্জাবের অনাচারে সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে মামলা হইতে অব্যাহতিদানের ব্যবস্থা করেন, তখন তিনি ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব করিয়াছিলেন—তদন্ত কমিটীর বিবরণ প্রকাশের পূর্ব্বে এইরূপ আইন করা সঙ্গত নহে।

তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান অপূর্ব্বকুমার বাঙ্গালায় প্রথম 'বাঙ্গালী' ডিরেক্টার অব পাব্‌লিক ইন্‌স্ট্রাকশান্।

আমরা তাঁহার মৃত্যুতে একজন শ্রদ্ধেয় সুহৃদ হারাইয়াছি। আজ তাঁহার বিধবাকে ও শ্রীমান অপূর্ব্বকুমার প্রমুখ তাঁহার সন্তানদিগকে আমরা আমাদিগের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস—

গত ৩০শে জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রগণ ভাইস-চ্যান্সেলার শ্যামাপ্রসাদকে সম্মুখে লইয়া চলিয়াছেন ফটো—তারক দাস

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে বেথুন কলেজের
ছাত্রীদিগের শোভাযাত্রা ফটো—তারক দাস

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে গড়ের মাঠে সমবেত
ভিন্ন ভিন্ন কলেজের ছাত্রদল ফটো—এ, এন, দাস কোং

ছাত্রগণের ক্রীড়া প্রদর্শন (বিশ্ববিদ্যালয়-উৎসবে অনুষ্ঠিত)
ফটো—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

ছাত্রগণের অপর একটি ক্রীড়া

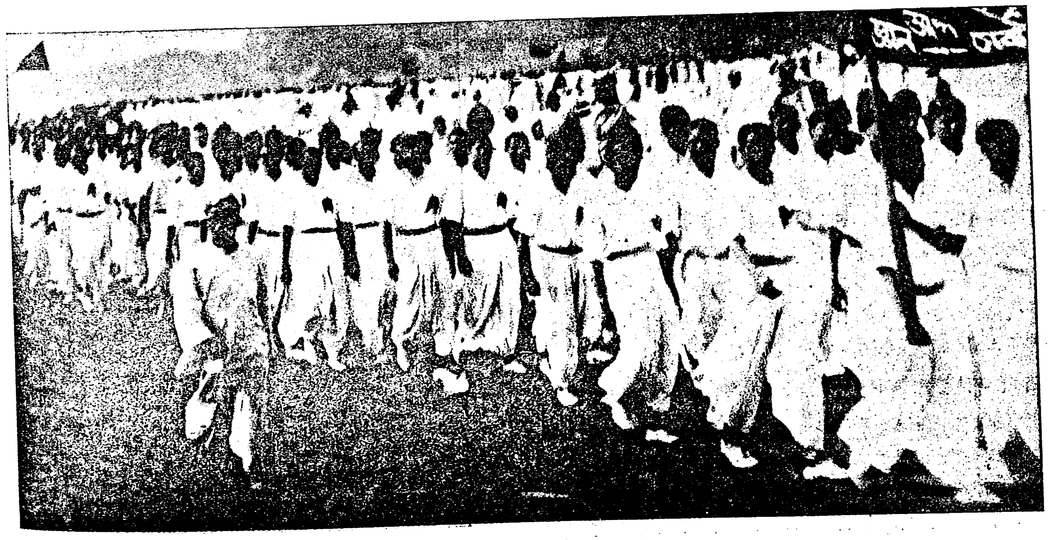

বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রগণের মিছিল ফটো—তারক দাস

উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে সেদিন সকালে বিভিন্ন কলেজের ছাত্রগণ শোভাযাত্রা করিয়া গড়ের মাঠে গিয়া সমবেত হইয়াছিল। তথায় চ্যান্সেলার (গভর্ণর) ও ভাইস-চ্যান্সেলারের বক্তৃতার পর ছাত্রগণ তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া মিছিল করিয়া যাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা অভিবাদন করিয়াছিল। অপরাহ্নে মাঠেই সকল কলেজের ছাত্রগণ নানাপ্রকার ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াছিল। আমরা উক্ত উৎসবের কয়খানি চিত্র এই সঙ্গে প্রকাশ করিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয় উৎসব উপলক্ষে অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত ব্রতাচারী নৃত্য

ফটো—তারক দাস

রায় সাহেব নবকৃষ্ণ রায়—

জয়পুর রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের পরিচালক রায় সাহেব নবকৃষ্ণ রায় মহাশয় গত ২৮শে নভেম্বর তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১২৭১ সালে বহরমপুরের সুবিখ্যাত সেন বাড়ীতে মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হয়। বহরমপুর হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতায় জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইনিষ্টিটিউটে শিক্ষালাভ করেন। বি, এ পাশ করিয়া বহরমপুরস্থ কৃষ্ণনাথ কলিজিয়েট স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকরূপে তাঁহার কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। কিছুকাল পরে জয়পুর কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে তিনি জয়পুরে গমন করেন। মধ্যে কিছুকাল তিনি মীরাট কলেজের অধ্যাপক হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরে তাঁহাকে জয়পুর রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের পরিচালক ও কলেজের প্রিন্সিপালরূপে জয়পুরেই ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না—তিনটি কন্যাকেই তিনি সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যম কন্যা গায়ত্রী বি এ, বি-টি পাশ করিয়া কিছুকাল জয়পুরস্থ মহিলা কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে নবকৃষ্ণবাবুর বয়স ৭১ বৎসর হইয়াছিল।

রায় সাহেব নবকৃষ্ণ রায়

ভ্রম সংশোধন—

এ মাসের প্রচ্ছদপটে পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিকৃতি এবং পরিচয়ে পরলোকগত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জীবন কথা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি ও দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবন কথা সন্নিবেশিত করিব।

তৃতীয় টেষ্টে ভারত বিজয়ী ঃ

লাহোরে ১৯৩৬ সালের ১০ই থেকে ১৩ই জানুয়ারী অষ্ট্রেলিয়ান ও সমগ্র ভারতের তৃতীয় টেষ্ট খেলায় সমগ্র ভারত ৬৮ রানে জয়লাভ করেছে। বোম্বাই ও কলিকাতায় প্রথম ও দ্বিতীয় টেষ্টে নয় উইকেটে ও আট উইকেটে পরাজয়ের গ্লানির কতকটা মুচেছে। এবারকার টেষ্টের খেলোয়াড় মনোনয়নে সকলেই হতাশ হয়েছিলেন। বড় বড় ধুরন্দর খেলোয়াড়, যেমন, সি কে নাইডু, অমরসিং, অমরনাথ, সি এস নাইডু, মুস্তাক আলি ও নাজির আলি খেলেন নি বা মনোনীত হন নি।

প্রশংসনীয় ব্যাটিং করেছেন, ক্যাপ্‌টেন ওয়াজির আলি এবং তার পরেই

ওয়াজির আলি

(ক্যাপ্‌টেন—ভারত)

আমীর ইলাহী

মেহেরমজী

বাঙ্গলার এস্ ব্যানার্জ্জি। ওয়াজির আলি প্রথম ইনিংসে ৭৬ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৯২ করেছেন। এস্ ব্যানার্জ্জি প্রথম ইনিংসে মাত্র ৫ করেন, কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে, যদিও কয়েকটি চান্স দিয়েছিলেন, ৭০ রান করে সমগ্র ভারতকে জয়ের দিকে অনেকটা এগিয়ে দেন। ব্যানার্জ্জি অক্সেনহাম ও লেদারের দু'টি সুন্দর ক্যাচ নিয়ে অষ্ট্রেলিয়াদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে দেন। অক্সেনহামের ক্যাচটি খুব শক্ত ছিল। বোলিংএ বাকা ও নিসার অত্যাশ্চর্য্য ফল দেখিয়েছে, বাকার ১৬ রানে চারটি শ্রেষ্ঠ উইকেট নেওয়া সত্যই অদ্ভুত। ফি ল্ডিং এ ভারতীয়রা বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছে, কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ারা খুব খারাপ ফিল্ডিং করেছে, বিশেষতঃ 'ক্যাচে'। অক্সেনহাম অশক্ত হওয়ায় অষ্ট্রেলিয়াদলের বোলিংও খা রা প হয়েছে। মেহেরমজীর উইকেট-রক্ষা

বাকাজিলানী

উৎকৃষ্ট হয়েছে। মাত্র একবার তার ভুল হয়েছে।

বিখ্যাত ব্যাটস্‌ম্যান ম্যাকার্টনে

লাহোরে তাঁর খেলায় বিশেষত্ব দেখাতে পারেন নি। ক্যাপ্‌টেন রাইডারই কেবল সর্ব্বোচ্চ রান ৭৩ করতে পেরেছেন।

এই খেলাটির সম্বন্ধে রাইডার মতামত প্রকাশ করে বলেছেন, ভারতীয় খেলোয়াড়গণ স্কুলে একজোটে এমন খেলেছেন যেন একটি মানুষ খেলছেন, ক্রিকেট খেলায় এটাই সকলের চেয়ে অত্যাবশ্যক। ওয়াজির আলি দু' ইনিংসেই অতি সুন্দর খেলেছেন। নিসার, বাকাজিলানী ও আমীর ইলাহীর বোলিংএ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন. ভারতীয়দের ফিল্ডিং অতীব সুন্দর বিশেষতঃ ভায়ার। The Indian Whippet (তিনি ভায়াকে ঐ নামে অভিহিত করেন) যে দলে যাবেন সেই দলই শক্তিশালী হবে। মেহেরমজীর উইকেট কিপিং প্রথম শ্রেণীর।

মাদ্রাজে সুন্দর আবহাওয়া ও নির্ম্মল আকাশতলে তৃতীয় টেষ্ট খেলা আরম্ভ হ'লো বেলা ১১-১৫ মিনিটে।

ওয়াজির আলি টসে জিতে মেহেরমজী ও এস্ ব্যানার্জ্জিকে ব্যাট করতে পাঠালেন। জনসমাগম তেমন হয় নি। অমরনাথ, মেজর নাইডু খেলছেন না, খেলোয়াড় নির্ব্বাচনও আশানুরূপ হয় নি। ১৫ মিনিট খেলার পরেই প্রথম উইকেট গেলো ১৭ রানের মাথায়। সমগ্র ভারতের শত রান উঠলো ২০ মিনিট খেলার পর বাকাজিলানীর মারে। ন্যাগেলের বলে ১০০ রানের মাথায় ষষ্ঠ ও সপ্তম উইকেট খোয়া গেল, বাকাজিলানী ও আমীর ইলাহীর। ওয়াজির আলি নিজস্ব ৫০ রান করলেন ১০২ মিনিটে, ১২৪ রানে ৮ম ও ৯ম উইকেট পড়লো। নিসার এসে ওয়াজির আলির সঙ্গে যোগ দিলে, যখন ওয়াজিরের স্কোর ৫৮। ওয়াজির পিটিয়ে খেলতে সুরু করলেন. পর পর দু'বার ন্যাগেলকে কভার বাউণ্ডারীতে পাঠালেন। নিসার ওয়াজিরের কাছে এগিয়ে গিয়ে জানালে যে সে তার উইকেট বাঁচিয়ে রাখবে, ওয়াজির যেন পিটাতে গিয়ে তার উইকেট নষ্ট না করে। সত্যই নিসার শেষ উইকেটের স্থিতিতে ওয়াজিরের চেয়ে বেশী সুখ্যাতি পাবার যোগ্য। ওয়াজির কভার বাউণ্ডারীতে পাঠাতে গিয়ে স্লিপে হেন্‌ড্রির হাতে আটকে গেলো বেলা ২-৫৫ মিনিটে, মোট স্কোর তখন ১৪৯। ওয়াজির আলি নির্দ্দোষ খেলে ৭৬ করেছে ১৩৭ মিনিটে, তার মধ্যে ১২টা ৪ ছিল।

৩-১০ মিনিটে ওয়েণ্ডেলবিল ও ব্রায়ার্ণ্ট এসে অষ্ট্রেলিয়াদের ইনিংস আরম্ভ করলে। নিসার ও পুরী বল দিতে লাগলো। পুরী ৩০ গজ দূর থেকে ছুটে এসে বল করছে। তার বল নিসারের চেয়ে দ্রুত বলে মনে হয় কিন্তু বলের গতি ও দীর্ঘতা নিসারের মত সঠিক ছিল না। অষ্ট্রেলিয়াদের ৫০ রান উঠ্‌লো ৭৫ মিনিটে। অত্যন্ত মন্দ গতিতে রান হচ্ছে, একটা উইকেট গেছে। আমীর ইলাহীর বলে মেহেরমজী মরিসবীকে চমৎকার ক্যাচ নিলে। মরিসবী বলটা 'ব্লক' করে নিজের সুমুখে বাঁ দিকে যেমন তুলেছে, মেহেরমজী দৌড়ে এসে মাটি থেকে মাত্র এক ইঞ্চি উঁচুতে বলটি অত্যাশ্চর্য্যরূপে লুফ্‌লে। বেলা শেষে যখন খেলা শেষ হলো অষ্ট্রেলিয়াদের মোট স্কোর ৭১ কিন্তু ৩ উইকেট গেছে। মেহেরমজীর উইকেট রক্ষা এত সুন্দর হয়েছে যে একটিও 'বাই' হয় নি। ভায়ার ফিল্ডিং অত্যাশ্চর্য্য।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় জনতা লাহোরের পক্ষে বেশীই বলতে হবে। গভর্ণর দিনটি সাধারণ ছুটীর বলে ঘোষণা করেছেন। পুরী তাঁর নিজের বলেই ব্রায়ার্ণ্টকে ক্যাচ করলে। ক্যাচটি অতি সুন্দর হয়েছিল। ম্যাকার্টনে এসে বাউণ্ডারের সঙ্গে জুটি হলেন। রাইডার নিসারের বল আটকাতে ক্যাচ তুললে মহম্মদ সৈয়দ পাশে লাফিয়ে ক্যাচ ধরলেন। ৪ রানের মধ্যে দু'টি উইকেট গেলো। ফিল্ডিং ও বোলিং খুব ভাল হ'চ্ছে। ম্যাক্ ও লাভে মিলে রান তুললে ৯০। ৯২ রানে লাভ গেলো, অক্সেনহ্যাম গেলো পুরীর হাতে ১০০ রানে। ন্যাগেল এলো ও ১০২ রানে আউট হলো। মেয়ার এসে ম্যাকের সঙ্গে যোগ দিলে। খেলার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হলো, রান সংখ্যা উঠ্‌লো ১২৯। ম্যাকার্টনে এল্ বি ডবলিউ হলেন ৩৪ রান করে ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট খেলবার পর। মেয়ার ও লেদারে মিলে ৩৭ রান তুললে, লেদার বোল্‌ড হলো ২৭ করে। অষ্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হলো ১২-৫০ মিনিটে।

বেলা ২-৫ মিনিটে ভারতীয়দের দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ হলো মেহেরমজী ও ব্যানার্জ্জিকে দিয়ে। মেহেরমজী ১২ করে রান আউট হলেন। বাকা জিলানী এলেন ও কিছু না করেই গেলেন। ক্যাপ্‌টেন ওয়াজির আলি নামলেন। ব্যানার্জ্জি ইতিমধ্যেই দু'টি 'চান্স' দিয়েছেন। ৮০ মিনিট খেলার পর সাত রান হ'লো। চা পানের সময় ব্যানার্জ্জির ৬৩ আর ওয়াজির আলির ৫

হয়েছে। এই জুটি ১২৮ রান করবার পর ব্যানার্জ্জি লেদারের বল তুল্‌লে আলেকজাণ্ডার লুফ্‌লেন। ব্যানার্জ্জি ১৩৫ মিনিট খেলে ৭০ রান করেছেন তার মধ্যে ৭টা ৪ ছিল। তিনি অনেকগুলি 'চান্স' দিয়েছেন। যুবরাজ এলেন ও বেলা শেষ পর্য্যন্ত খেলে রান সংখ্যা ৩ উইকেটে ১৭৭ হ'লো।

তৃতীয় দিনে খেলা আরম্ভ হলে, যুবরাজ মাত্র ১৬ করে গেলেন। ওয়াজির আলি ৯২ করে লাভের হাতে আটকালেন, তিনি ১১টা বাউণ্ডারী করেছেন। সৈয়দের সঙ্গে ভায়া যোগ দিলেন। সৈয়দ ২৬ করে ষ্টাম্পড হলেন। আমীর ইলাহী এলে খেলার স্কোর দ্রুত উঠতে লাগলো। ভায়া দ্রুত রান তুলতে গিয়ে ২৭ করে রান আউট হলেন। সালাউদ্দীন এলেন, আমীর ২৬ রান করে আউট হলেন, ডি আর পুরী এলেন ও বোল্‌ড হলেন। নিসার এসে মাত্র ৩ রান করে লাভের হাতে আটকালে ভারতীয়দের দ্বিতীয় ইনিংস মোট ৩০১ রানে শেষ হ'লো।

অষ্ট্রেলিয়ারা ২৮৫ রান পিছিয়ে আছে কিন্তু তাদের হাতে দেড় দিনের বেশী সময় আছে। লাঞ্চের পর ২৬ রানে আধ ঘণ্টার মধ্যে তাদের ২ উইকেট গেলো। সালাউদ্দীনের শেষের বলে ওয়েণ্ডেলবিল এল-বি হলেন। নিসারের বলে লাভ মেহেরমজীর হাতে আটকালেন। মরিসবী ও রাইডারের জুটি ভাঙ্গতে ওয়াজির আলি ঘন ঘন বোলার বদল করতে লাগলেন, তবুও রান সংখ্যা ৮০ হলো। নিসার পুনরায় এসে বাম্পিং বল করতে লাগলেন, মরিসবী আউট হলেন। ব্রায়ার্ণ্ট এসে ২৩ মিনিট খেলার পর প্রথম রান করলেন। বাকাজিলানী পর পর মেডেন পেলেন। ১১৩ মিনিটে শত রান উঠ্‌লো। ১০১ রানের মাথায় ব্রায়ার্ণ্ট মেহেরমজীর হাতে ক্যাচ হলো। ম্যাক্ এলো। রাইডার ৮০ মিনিট খেলে নিজস্ব ৫০ রান করলেন, ৬টি বাউণ্ডারী ছিল। চায়ের পর, ম্যাক্ ১৬ রান করে বাকাজিলানীর বলে এল্-বি আউট হলেন। হেনড্রি এলেন, কিন্তু রাইডার আমীর ইলাহীর বলে ক্যাচ তুললে, ওয়াজির আলি 'মিড্ অফ্' থেকে ছুটে এসে বোলারের ঠিক পিছনে সুন্দর লুফলেন। ১৪৮ রানে দু'টি ধুরন্দর উইকেট গেলো। ন্যাগেল এলেন ও গেলেন, অক্সেনহ্যাম যোগ দিলেন ও বেলা কাটিয়ে দিলেন। অষ্ট্রেলিয়াদলের ৭ উইকেটে মাত্র ১৫৭ রান হলো।

চতুর্থ দিনে খেলা আরম্ভ হলো। অষ্ট্রেলিয়াদের ১২৭ রান বাকী। অক্সেনহ্যাম ও হেনড্রি খুব সতর্কতার সঙ্গে খেলছেন, রান খুব ধীরে ধীরে উঠ্‌ছে। আমীরের বলে হেনড্রি ৪০ মিনিট খেলবার পরে আউট হলেন মাত্র ৬ করে। মেয়ার এলেন, দু'জনে মিলে রান সংখ্যা ওঠালে ৩০০এ। নিসারের বলে মেয়ার একটি ক্যাচ দিয়েছিলেন ব্যানার্জ্জি তা লুফ্‌লেন কিন্তু 'নো বল' থাকায় মেয়ার আউট হলো না।

নূতন বল নিয়ে নিসার অক্সেনহ্যামকে আউট করলেন, ব্যানার্জ্জি তাঁর খুব জোর মারের ক্যাচটি ধরলেন। শেষ খেলোয়াড় লেদার এসে ১১ রান করবার পরে বাকাজিলানীর বলে ব্যানার্জ্জির হাতে আটকে যেতে অষ্ট্রেলিয়াদের দ্বিতীয় ইনিংস মোট ২১৮ রানে শেষ হলো। ভারতীয়দল আন্তর্জ্জাতিক ক্রিকেট খেলায় এই সর্ব্বপ্রথম ৬৮ রানে জয়লাভ করতে সক্ষম হলো।

ভারতীয় দল—প্রথম ইনিংস

এস ব্যানার্জ্জী···কট লাভ, বো ন্যাগেল	৫
আর পি মেহেরমজী···কট লাভ, বো ন্যাগেল	২৬
মহম্মদ সৈয়দ ··কট হেনড্রি, বো লেদার	০
ওয়াজির আলি কট হেনড্রি, বো লেদার	৭৬
যুবরাজ পাতিয়ালা···বো অক্সেনহ্যাম	১৪
ভায়া···বো মেয়ার	৭
বাকাজিলানী···বো ন্যাগেল	৪
আমীর ইলাহী···বো ন্যাগেল	০
মাসুদ সালাউদ্দিন···বো লেদার	১২
ডি আর পুরী···বো লেদার	০
নিসার··· নট-আউট	০
অতিরিক্ত	৫
মোট	১৪৯

বোলিং—

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
লেদার	১৫	২	৩৮	৩
ন্যাগেল	১৫	২	৭২	৪
অক্সেনহ্যাম	৭	৪	১২	১
ম্যাকার্টনে	৪	১	১৪	০
মেয়ার	৩১	০	৮	২

অষ্ট্রেলিয়ান দল—প্রথম ইনিংস

ওয়েণ্ডেলবিল···এল বি ডবলিউ, বো বাকাজিলানী		১৭
ব্রায়াণ্ট···কট ও বো পুরী		১০
মরিসবী···কট মেহেরমজী, বো আমীর ইলাহী		২৩
রাইডার···কট সৈয়দ, বো নিসার		২১
হেনড্রি···বো আমীর ইলাহী		৩
লাভ···বো বাকাজিলানী		৩
ম্যাকার্টনে···এল বি ডবলিউ, বো নিসার		৩৪
অক্সেনহ্যাম···কট পুরী, বো নিসার		৪
ন্যাগেল···এল বি ডবলিউ, বো নিসার		১
মেয়ার	নট-আউট	১৭
লেদার···বো আমীর ইলাহী		২৭
	অতিরিক্ত	৬
	মোট	১৬৬

বোলিং—

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
নিসার	২০	৩	৭২	৪
ডি পুরী	৯	০	২৪	১
এস ব্যানার্জ্জি	২	০	৪	০
বাকাজিলানী	১৫	২	৪৫	২
আমীর ইলাহী	৬	০	১৫	৩

ভারতীয় দল—দ্বিতীয় ইনিংস

আর পি মেহেরমজী···	রান-আউট	১২
এস ব্যানার্জ্জি···কট ও বো লেদার		৭০
বাকাজিলানী···কট রাইডার, বো ন্যাগেল		০
ওয়াজির আলি···কট লাভ, বো লেদার		৯২
যুবরাজ পাতিয়ালা···কট ও বো ন্যাগেল		১৬
মহম্মদ সৈয়দ···ষ্ট্যাম্পড লাভ, বো মেয়ার		২৬
আমির ইলাহী···কট ন্যাগল, বো লেদার		২৬
জে এন ভায়া···	রান-আউট	২৭
মাসুদ সালাউদ্দীন···	নট-আউট	২৩
ডি আর পুরী···বো লেদার		০
এস এম নিসার···কট লাভ, বো লেদার		৩
	অতিরিক্ত	৩
	মোট	৩০২

বোলিং—

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
লেদার	২৭·১	২	১০২	৫
ন্যাগেল	১৭	২	৫০	২
মেয়ার	১২	০	৯১	১
ম্যাকার্টনে	২০	৮	৪৮	০
হেনড্রি	২	০	৬	০

অষ্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস

ওয়েণ্ডল বিল···এল বি ডবলিউ, বো সালাউদ্দিন		৫
এইচ এস লাভ···কট মেহেরমজী, বো নিসার		১০
আর মরিসবী···বো নিসার		৩৫
জে এস রাইডার···কট ওয়াজির, বো আমীর ইলাহী		৭০
এফ ব্রায়াণ্ট···কট মেহেরমজী, বো বাকাজিলানী		৬
সি জি ম্যাকার্টনে···এল-বি, বো বাকাজিলানী		১৬
এইচ এল হেনড্রি···বো নিসার		৬
এল ন্যাগেল···বো বাকাজিলানী		০
আর অক্সেনহ্যাম···কট ব্যানার্জ্জি, বো নিসার		৩০
মেয়ার···	নট-আউট	১৪
লেদার···কট ব্যানার্জ্জি, বো বাকাজিলানী		১১
	অতিরিক্ত	১৩
	মোট	২১৬

বোলিং—

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
নিসার	২৪	৩	৮০	৪
সালাউদ্দিন	৫	১	১৮	১
বাকাজিলানি	১২	৫	১৬	৪
এস ব্যানার্জ্জি	২	০	৮	০
পুরী	৭	০	২৬	০
আমীর ইলাহী	১৭	২	৫৫	১

মৈনুদ্দৌলাদলের অপূর্ব্ব সাফল্য ঃ

মৈনুদ্দৌলাদল প্রথমে সারা দিন ৫ উইকেটে ৪১৩ রান করে। অমরনাথ ক্রুটীহীন ১৪৪ রান করে

অমরসিং ··

অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত সর্ব্বোচ্চ রান করার কৃতিত্ব অর্জ্জন করলেন। এস এম হোসেন ৭৩, পালিয়া (নট্-আউট্) ৬১, এস্ এম হাডি (নট্-আউট্) ৩৮, এস ব্যানার্জ্জি ৩০, অমরসিং ১৭, হিন্দেলকার ১৭, ওয়াজির আলি ৭ করে আহত হয়ে চলে যান।

দ্বিতীয় দিনে মহারাজকুমার ভিজিয়ানাগ্রাম ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করলে অষ্ট্রেলিয়ানরা প্রথম ইনিংস আরম্ভ করে ২-৪০ মিনিটের মধ্যে ১৪৪ রানে সকলে আউট হওয়ায় তাঁদের 'ফলো-অন্' করতে হ'লো। নিসার ও অমরসিং ৫৬ ও ৫১ রানে প্রত্যেকে ৪টি উইকেট এবং এস্ ব্যানার্জ্জি ৩৪ রানে ২টি উইকেট নেন।

দ্বিতীয় ইনিংসেও অষ্ট্রেলিয়াদল বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। বেলা শেষে তাঁদের ৮ উইকেট গেলো আর রান হলো মোটে ১৪৬। ন্যাগেল, লেদার ও আলেকজাণ্ডার খেলতে বাকী। অষ্ট্রেলিয়াদের ইনিংস পরাজয় বাঁচাতে তখনও ১২৩ রান করতে হবে, যদিও তা করা অসম্ভব। লেদার ও আলেকজাণ্ডার আউট হয়ে গেলো তৃতীয় দিনের খেলা আরম্ভ হবার পনেরো মিনিটরও কম সময়ে, মোট রান হ'লো ১৫৪। অমরসিং একা ৩৬ রানে ৬টি উইকেট নিয়েছেন। মৈনুদ্দৌলাদল এক ইনিংস ও ১১৫ রানে জয়ী হয়ে রেকর্ড স্থাপন করতে সক্ষম হলেন।

ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে এই বিজয় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মহারাজকুমার যে একজন সুদক্ষ ও চতুর ক্যাপ্টেন তা' প্রমাণিত হ'লো। ১৯৩৩ সালে জার্ডিনের এম সি সি দলকে বেনারসে তাঁর অধিনায়কতায় ভারতীয় দল ১৪ রানে হারাতে সক্ষম হয়েছিল। 'গোল্ডেন কাপ্' এবং জুবিলী টুর্ণামেণ্ট বিজয়ী দলের ক্যাপ্টেনও ছিলেন তিনি।

পি ই পালিয়া

অমরনাথের চমৎকার ব্যাটিং, অমরসিংএর মারাত্মক বোলিং ও হিন্দেলকারের নির্দ্দোষ উইকেট রক্ষা এবং মহারাজকুমারের কুশলী অধিনায়কত্বের জন্যই মৈনুদ্দৌলাদল এরূপ অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করতে পেরেছে।

আন্তঃ প্রাদেশিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ঃ

ভারতের ক্রিকেট খেলার উন্নতির উদ্দেশ্যে মহারাজা পাতিয়ালা "রঞ্জি" নামক ট্রপী আন্তঃ প্রাদেশিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার জন্য প্রদান করেন। গতবৎসর বোম্বাই প্রেসিডেন্সী ক্রিকেট এসোসিয়েশন এই ট্রপী বিজয়ী হন। এই প্রতিযোগিতার ইষ্টার্ণ জোনের খেলায় বাঙ্গলা ও আসাম প্রদেশ ৫ উইকেটে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারকে হারিয়ে জয়ী হয়। মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ব্যাট করে প্রথম ইনিংসে মোট রান ১৪৯ করে। হীরালাল ৪৪, রহমন পাশা ৩১, ডি আর রতনাম ২৩, এস জে নাইডু ২০, ভি আর পাটকি (নট্ আউট্) ৫, পি এন লাঘেট ৪, জর্জ্জ লোখাণ্ডে ৪, ল্যান্স কর্পোরাল ফ্রেজার ১, ডি সি মোরিল ১, লতিফ ০, জহুর আমেদ ০।

ডি ডি হিন্দেলকার

গিলবার্ট ৫৪ রানে ৩, কে ভট্টাচার্য্য ৩৯ রানে

৩, বাপী বোস ১৮ রানে ১, জি এরাটুন ১ রানে ১, স্কিনার ৫ রানে ২ ও খাম্বাটা ২৬ রানে ৭ উইকেট নেন।

মহারাজা পাতিয়ালা প্রদত্ত রঞ্জি ট্রপী

বাঙ্গলা ও আসাম—প্রথম ইনিংস—১৯৬ রান এ এল হোসী ৮২, জি বোস ৪৬, সুশীল বোস ২৬, কে খাম্বাটা ৭, গিলবার্ট ৫, এরাটুন ৪, কিং ৪, ওয়ারেন ৩, কে ভট্টাচার্য্য ৩, স্কিনার ৩, বাপী বোস (নট্-আউট্) ২।

জহুর আমেদ ৫৪ রানে ৩, লোখাণ্ডে ৩৩ রানে ২, মোরিল ৩৫ রানে ২, লাঘেট ২৫ রানে ১, রহমন পাশা ৩৮ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ৭ উইকেটে ২৪৬ রান করে ডিক্লেয়ার্ড কর্‌লে, নিজেদের দু' ইনিংসের মোট স্কোরের কমে বাঙ্গলা ও আসামের সবাইকে আউট করে দেবার চেষ্টায়। কারণ সময়াভাবে খেলা শেষ হলেও নিয়মানুযায়ী প্রথম ইনিংসের স্কোর হিসাবে তাদের পরাজয় ঘটবে।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার—দ্বিতীয় ইনিংস—জে আমেদ ৭৭, ফ্রেজার ৬০, হীরালাল (নট-আউট) ৪৫, রহমন পাশা ৩৬, রতনাম (নট্ আউট) ১৬, এস জে নাইডু ১১, লাঘেট ৬, লতিফ ২, লোখাণ্ডে ০।

গিলবার্ট ১০০ রানে ৫ উইকেট, এরাটুন ১৮ রানে ১, কে ভট্টাচার্য্য ৭৫ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন।

২১৭ রান করলে তবে জয় হবে। বাঙ্গলা ও আসাম দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলে ১২-২৫ মিনিটে। ১০২ মিনিট খেলে ১০০ রান উঠ্‌লো। চায়ের সময় রান সংখ্যা ২৬৩ (৪ উইকেট), ভট্টাচার্য্য ও গণেশ বোস ব্যাট করছে। বাঙ্গলার জয়ী হবার আশা প্রায় নিশ্চিত—হাতে তখনও ছ'টা উইকেট ও এক ঘণ্টা সময় আছে, রান বাকী মাত্র ৫৫। ৪-৩৮ মিনিটে সুশীল বোস দু'য়ের বাড়ী মেরে ২১৮ করলে, বাঙ্গলা ও আসাম ৫ উইকেটে জয়ী হলো। ওয়ারেন ৬৬, ভট্টাচার্য্য (নট্ আউট) ৫৪, হোসী ৪১, গণেশ বোস ৩৬, স্কিনার ৭, এরাটুন ৪, সুশীল বোস (নট্-আউট) ৪।

লোখাণ্ডে ৪৬ রানে ২, মোরিল ৩৮ রানে ২, জে আমেদ ১৮ রানে ১ উইকেট পেয়েছে।

বাঙ্গলা বনাম মধ্যভারত ঃ

আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় খেলায় বাঙ্গলা ও আসাম মধ্যভারতকে প্রথম ইনিংসের স্কোরে হারিয়েছে। মধ্যভারত দলে কয়েকজন ভারত-বিখ্যাত খেলোয়াড় ছিলেন, যেমন,—সি কে নাইডু, সি এস নাইডু, মুস্তাক আলি, ভায়া ও জগদেল। এই দলকে হারিয়ে বাঙ্গলা প্রমাণ করেছে যে দরকার হলে এবং উপযুক্ত সুযোগ পেলে তারাও ক্রিকেটে ভালো ফল দেখাতে পারে। ক্রিকেট-জগত বাঙ্গলাকে চিরকালই অগ্রাহ্য করে এসেছে। আজ সেই বাঙ্গলাও দুর্দ্ধর্ষ খেলোয়াড়গণ পরিবৃত মধ্যভারত দলকেও হারিয়ে দিলে। বাঙ্গলা এবার সাদার্ণ জোনের বিজয়ী মাদ্রাজদলের সঙ্গে মাদ্রাজে খেলবে। ১৪ই ফেব্রুয়ারী থেকে ভাণ্ডারগাচ লংফিল্ড ও কমল ভট্টাচার্য্য যেতে পারবেন না—এজন্য বাঙ্গলাদল বিশেষ শক্তিহীন হ'লো।

এই খেলায় ভাণ্ডারগাচ দুই ইনিংসেই চমৎকার খেলেছেন। ৬ষ্ঠ উইকেট সহযোগিতায় ভাণ্ডারগাচ ও কে ভট্টাচার্য্য মিলে ১৯০ রান তুলেছেন। সি কে নাইডু তাঁদের জুটি ভাঙ্গবার জন্য তাঁর দলের সকল বোলারকেই বল দিতে দিয়েছিলেন। বাঙ্গলার ক্যাপ্‌টেন হোসী দ্বিতীয় ইনিংসে চমৎকার খেলে ৫৩ রান করেন ৫৫ মিনিটে, আটবার চার করেছেন। বোলিংএ প্রথম ইনিংসে সি কে নাইডু ৭ উইকেট, দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেট নিয়েছেন ও ভায়া ১ উইকেট। বাঙ্গলার নামকরা ব্যাটস্‌ম্যান কে বোস কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। এস

আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতা—বাঙ্গলা ও আসাম বনাম মধ্যভারত—সি কে নাইডু (ক্যাপ্‌টেন) মধ্যভারত দলকে ফিল্ড করতে নিয়ে যাচ্ছেন ছবি—দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

ব্যানার্জ্জি ব্যাটিং বা বোলিংএ বিশেষ কিছুই করেন নি, তিনি মাত্র ১টি উইকেট নিয়েছেন। বেরেণ্ড, লংফিল্ড ও কে ভট্টাচার্য্য বোলিংএ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। লংফিল্ড ব্যাটিংএ একেবারে অকৃতকার্য্য হয়েছেন।

ফিল্ডিংএ ভায়া সত্যই দারুণ। তিনি যে দলে যোগ দেবেন সেই দলই যে লাভবান হবেন ইহা ধ্রুব সত্য। তিনি অনেক নিশ্চিত রান বাঁচিয়েছেন। তিনি না থাকলে বাঙ্গলার রান সংখ্যা আরো অনেক বেশী উঠ্‌তো। বল মারবার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এসে বল ধরেছেন। তাঁর কাছাকাছি বল গেলে ব্যাটসম্যানরা আর রান নিতে সাহস করছিলেন না। তাঁর বল্ ধরা ও নিক্ষেপের তৎপরতা অনুকরণীয়। তুলনায় বাঙ্গলার ফিল্ডিং অতি নিকৃষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে। বাঙ্গলা কয়েকটি ক্যাচ ফেলেছেন ও খারাপ ফিল্ডিংএর জন্য রানও অধিক হয়েছে।

মধ্যভারতের পক্ষে দুই ইনিংসে সি এস নাইডু ও জগদেল ভালো খেলেছেন। সি কে নাইডু দ্বিতীয় ইনিংসে ভালো খেলেছেন, কিন্তু ভায়া ব্যাটিংএ কিছুই করতে পারেন নি। ভায়ার নিজের বোলিংএ বাপী বোসের মারের বলটা ধরা সত্যই সুন্দর ও অদ্ভুত।

৩৪৩ রান ১৫০ মিনিটে করলে তবে মধ্যভারত জিততে পারবে। ২-১৫ মিনিটে জগদেল ও মুস্তাক আলি খেলতে এসে পিটাতে সুরু করলে। ৪০ মিনিটে ৫০ রান হলো। মুস্তাক আলি এল-বি হলো ২৯ করে ৬৭ রানের মাথায়। ৬৮ রানে জগদেল বোল্‌ড হলো ৩৮ করে। বেরেণ্ড এক ওভারে দু'টি উইকেট নিলে। নাইডু ভ্রাতাদ্বয় খেলতে এলো। ১০০ রান ৮৫ মিনিটে উঠ্‌লো। বেলা শেষে ৫ উইকেটে মোট ১৯৫ রান হ'লো। প্রথম ইনিংসের অধিক রান সংখ্যার জন্য বাঙ্গলা ও আসাম জয়ী ঘোষিত হলো।

বাংলা ও আসাম ঃ—প্রথম ইনিংস, মোট স্কোর—২৮৩; কে বোস ০, বেরেণ্ড ৩৮, এস্ ব্যানার্জ্জি ১০, হোসী ২৭, লংফিল্ড ০, ভাণ্ডারগাচ ৯৩, কে ভট্টাচার্য্য ৪১, জি বোস ২০, এস বোস ২, বাপী বোস ২৭, জে এন্ ব্যানার্জ্জি (নট্-আউট্) ৫।

সি কে নাইডু ৬৩ রানে ৭ উইকেট, সি এস নাইডু ১১১ রানে ১, হাজারী ৩৮ রানে ১, মুস্তাক আলি ২৮ রানে ১ উইকেট নিয়েছে।

দ্বিতীয় ইনিংসে—মোট স্কোর ২৫৯;—কে বোস ১৬, বেরেণ্ড ৯, এস ব্যানার্জ্জি ০, লংফিল্ড ০, হোসী ৫৩, ভাণ্ডারগাচ ৭১, কে ভট্টাচার্য্য ৯, জি বোস ৮, বি বোস ১৫, এস বোস (নট্-আউট্) ৩৭, জে এন ব্যানার্জ্জি ১৫।

নাইডু ৫৩ রানে ৪, সি এস নাইডু ১১১ রানে গদেল ১০ রানে ১, ভায়া ১২ রানে ১ উইকেট পেয়েছেন।

মধ্য ভারত :—প্রথম ইনিংস, মোট স্কোর—২০০, ইস্তিক আলি ১৮, ভাণ্ডারকার ৯, জগদেল ৪৬, সি কে নাইডু ৮, মুস্তাক আলি ২০, সি এস নাইডু ৬৮, ভায়া ৮, হাজারি ২, মহম্মদ বসির ০, টাটারাও (নট্ আউট) ৭।

বাঙ্গলার প্রথম ব্যাটসম্যানদ্বয়—এস্ ডব্লিউ বেরাণ্ড ও কে বোস খেলতে নামছেন

ছবি—দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

বেরেণ্ড ২৯ রানে ৩, লংফিল্ড ৬৩ রানে ৩, কে ভট্টাচার্য্য ২০ রানে ২, এস ব্যানার্জ্জি ৩০ রানে ১, জে এন ব্যানার্জ্জি ১২ রানে ০, এস বোস ৩৪ রানে ০ উইকেট নিয়েছেন।

দ্বিতীয় ইনিংস—মোট রান ১৯৫ (৫ উইকেট) ;— মুস্তাক আলি ২৯, জগদেল ৩৮, সি কে নাইডু ৪৭, সি এস নাইডু ৫১, ভায়া ৫, ভাণ্ডারকার (নট্ আউট) ১৬, হাজারী (নট্ আউট) ৭।

লংফিল্ড ৩১ রানে ০, এস, ব্যানার্জ্জি ৩৭ রানে ০, বেরেণ্ড ২৬ রানে ২, কে ভট্টাচার্য্য ৬০ রানে ১, জে এন ব্যানার্জ্জি ১৪ রানে ১, জি বোস ৯ রানে ১, এস বোস ১৬ রানে ০ উইকেট পেয়েছেন।

মাদ্রাজ ও অষ্ট্রেলিয়া ঃ

মাদ্রাজ দলের সঙ্গে খেলায় অষ্ট্রেলিয়াদল এক উইকেটে জিতেছে। অষ্ট্রেলিয়ারা ভারতে এসে অনেক যুদ্ধেই সহজে জয়ী হয়েছে কিন্তু এরূপ কষ্টার্জ্জিত জয় তাদের এই প্রথম। প্রথম ইনিংসে মাত্র ৪৭ রানে সকলে আউট হয়ে যায়; দ্বিতীয় ইনিংসে ২৬১ রান করতে পারলে জয়ী হবে যা' কল্পনাতীত ছিল। পরাণকুসম ক্যাচ ফেলায় মাদ্রাজের জিত বাজী হারে পরিণত হ'লো। শেষ উইকেট ৫০ মিনিট দাঁড়িয়ে গেল, লেদার ও অক্সেনহ্যাম ত্ব'জন বোলারে মিলে ৮০ রান করে, নিশ্চিত হার থেকে দলকে নিয়ে গেলো জয়ের পথে। মাদ্রাজ দলের ফিল্ডিং ও নিক্ষেপ খুব ভালো হয়েছে, তার প্রমাণ রাইডার ও ম্যাকার্টনের রান-আউট হওয়া। গোপালন্ প্রথম ইনিংসে ২৩ রানে ৬ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৬২ রানে ৫ উইকেট মোট ১১ উইকেট এই খেলাতে নিয়ে বোলিংএ অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এ পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়াদের বিরুদ্ধে খেলায় কোন বোলারই এরূপ ফল দেখাতে পারেন নি। কলিকাতায় সমগ্র ভারত ৪৮ রানে আউট হয়। মাদ্রাজে অষ্ট্রেলিয়াদের ৪৭ রানে নামিয়ে দিয়েও নিতান্ত ত্বর্ভাগ্যবশতঃ মাদ্রাজ হেরে গেলো। মাদ্রাজ :—১৪২ ও ১৬৫ ; অষ্ট্রেলিয়া :—৪৭ ও ২৬২ (৯ উইকেট)।

এম্ জি গোপালন্

মাদ্রাজ পক্ষে রামাস্বামী অতি চমৎকার খেলেছেন, প্রথম ইনিংসে ৪৮ (নট্-আউট্), দ্বিতীয় ইনিংসে ৮২, ৩৪ ও ৫৪ রান কেবল বাউণ্ডারীতে করেছেন। তাঁর ভাই বালিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৪ করেছেন। অষ্ট্রেলিয়া পক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে, হেনড্রি ৪৯, লেদার (নট্-আউট্) ৪৬, ম্যাকার্টনে ৩৯।

চতুর্থ ও শেষ টেষ্ট ঃ

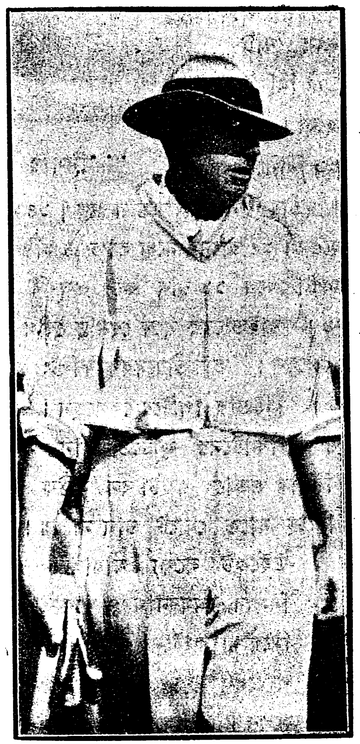

মাদ্রাজে চতুর্থ ও শেষ টেষ্ট খেলা ৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে আরম্ভ হয়ে ৮ই তারিখে তিনদিনেই শেষ হয়ে গেছে। সমগ্র ভারত ৩৩ রানে জয়ী হয়েছে। অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতের টেষ্ট খেলায় (যদিও বেসরকারী !) ফল সমান সমান হ'লো। অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ত্ব'টি খেলায় জয়ী হয়েছিল। ভারত তৃতীয় ও চতুর্থ খেলায় জয়ী হয়েছে। অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে ন্যাগাল ও অক্সেনহ্যাম অসুস্থতা ও আঘাতের জন্য খেলতে পারেন নি। নির্ব্বাচিত মহম্মদ হোসেন খেলেন নি, তাঁর ভ্রাতা এস এম হাদি খেলেছেন। তিনি ত্বই ইনিংসেই নট্-আউট্ ছিলেন, দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর ১৯, ভারতের সর্ব্বোচ্চ স্কোর। তিনি বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে খেলেছেন, তাঁর খেলার কৌশল সুন্দর ও প্রশংসনীয়।

জে এস রাইডার

আকাশ পরিষ্কার, উইকেট ভালো, প্রায় দশ হাজার দর্শক সমবেত। ভারত টসে জিতলে। ওয়াজির আলি কে বোস ও মুস্তাক আলিকে ব্যাট করতে পাঠালেন। মুস্তাক বেশ ভালই খেলছেন, কে বোস ৪ করেই গেলেন। বিপুল আনন্দ ধ্বনির সঙ্গে অমরনাথ নামলেন।

ম্যাকার্টনে

অমরনাথ সতর্কতার সঙ্গে খেলছেন, মুস্তাক আলি পিটাচ্ছেন। নিতান্ত ত্বর্ভাগ্যবশতঃ মুস্তাক আলি ৮২ মিনিট খেলে ৪৩ করে রান-আউট হলেন। অমরসিং এসে পিটিয়ে খেললেন। লাঞ্চের পর থেকেই ভারতের ভাগ্যবিপর্য্যয় সুরু হলো, এবং চা পানের সময় ৩-৫৫ মিনিটে মাত্র ১৮৯

রানে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হলো। এলিস ষ্ট্যাম্পড করেছেন তিন জনকে আর একজনকে কট্।

অষ্ট্রেলিয়াদের ইনিংস আরম্ভ হয়ে প্রথম ওভারেই স্লিপে হেনড্রি কট্ হলো, তখন তাদের এক রানও হয় নি। ব্রায়ান্টের ক্যাচ ফস্কেছে। ভারতের ফিল্ডিং অত্যন্ত খারাপ হচ্ছে। অমরসিং তার চতুর্থ ওভারের শেষ বলে মরিসবীকে বোল্ড করলে। বেলা শেষে অষ্ট্রেলিয়া ৪ উইকেট খুইয়ে মাত্র ৬১ রান করেছেন। অমরসিং ও নিসার প্রত্যেকে দু'টি করে উইকেট পেয়েছেন।

এম ডি হোসেন

দ্বিতীয় দিনের সকালে বৃষ্টি হওয়ায় মাঠ জলপূর্ণ হয়। শুকনো চট ভিজিয়ে মাঠ থেকে জল শুষে নেওয়া হ'লে, বেলা বারটায় খেলা আরম্ভ হলো। দর্শক সংখ্যা প্রায় হাজার বারো। লাভ ও এলিস খেলতে নামলেন। এলিসের ক্যাচ ওয়াজির ফস্কালেন, পুনরায় ক্যাচ উঠ্লে কার্ত্তিক ধরে ফেললেন। বাকী ৬টা উইকেট ১০১ রানে পড়ে গেলো বেলা ২-৩৫ মিনিটে, মোট স্কোর ১৬২তে। মাঠের অবস্থা বুঝে অষ্ট্রেলিয়ারা যেন শীঘ্র শীঘ্র আউট হয়ে যেতেই চাইলে, যাতে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে মাঠের ঐ অবস্থার সুযোগ তারা পায়।

মুস্তাক আলি

আবহাওয়ায় বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। ভারতীয় দল ২-৪৭ মিনিটে দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলে। এক রান করে কার্ত্তিক গেলেন, মুস্তাক ৭ করে ২৭-এর মাথায়। অমরসিং গেলো ১০ করে, ওয়াজির এলেন। অমরনাথ ১৮ করে গেলেন। চা পানের সময় রান হলো মাত্র ৫৬। ওয়াজির আউট হলেন। দর্শকরা বিদ্রূপ করলে। ১২৮ মিনিটে শত রান উঠ্লো, বেলা শেষে ৯ উইকেট গিয়ে ১০৩ রান হয়েছে।

তৃতীয় দিনে আকাশের অবস্থা ভালো। দিনটি ছুটির বলে ঘোষিত হওয়ায় দর্শক সংখ্যা বেশী হয়েছে। হাদি ও ভেঙ্কটাচারী খেলতে নামলেন। হাদির ৯ রান হ'লো। এলিস দক্ষতার সহিত ভেঙ্কটাচারীকে ষ্ট্যাম্পড করলে ১৭ মিনিট খেলার পর। ভারতীয়দের দ্বিতীয় ইনিংস মোট ১১৩ রানে ১৪৫ মিনিট খেলে শেষ হলো।

নিসার

বেলা ১১-৩৬ মিনিটে অষ্ট্রেলিয়ারা দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলে। ১৪১ রান করলে তাঁরা জয়ী হবেন। ১৫ রানের মধ্যে লাভ ও মরিসবী গেলেন। ব্রায়ান্ট একঘণ্টা খেলে ১১ রান করে এল্-বি হলেন, মোট রান মাত্র ৩৬। রাইডারের সঙ্গে হেনড্রি যোগ দিলেন ও ৯ রান করে গেলেন। ভারতীয়দের ফিল্ডিং ও ক্যাচ খুব ভালো হচ্ছে। রাইডার পিটিয়ে খেলছেন। লাঞ্চের পর রাইডার ও ম্যাকার্টনের জুটিতে রান সংখ্যা ৮৫তে উঠ্লো। নিসার ওভারে একটা বল সঠিক করছে বাকী ৫টা এমন দিচ্ছে যাতে মোটে রান না হয়। অমর সিং উইকেট লক্ষ্যে মারাত্মক বল দিচ্ছে। নিসার, অমরনাথ ও সালাউদ্দীন তিনজনে মিলে ম্যাকার্টনের ক্যাচ ধরতে গিয়ে কেহই পারলেন না। ৮৬ রানে ম্যাক্ বোল্ড হলেন। এলিস এল। রাইডার ৪১ রান ৮০ মিনিটে করে মোট ৯১ রানের মাথায় অমরসিংয়ের চমৎকার বলে বোল্ড আউট হলে অষ্ট্রেলিয়াদের জয়াশা শেষ হলো। মেয়ার এলেন, এলিস দুর্ভাগ্যবশতঃ নিসারের বলে ৯৯র গাঁঠে এল-বি হলো। এই বিচারে তিনি সন্তুষ্ট হন নি। ৭ উইকেট গেছে, এখনও পরাজয় থেকে

নিস্তার পেতে ৪০ রান বাকী। লেদার এসে ৩ রান করে নিসারের বলে গেলে ডেভিস এলো ও নিসারের বলে গেলো। আলেকজাণ্ডার এলো। সেই ওভারে আলেকজাণ্ডারকে আউট করতে পারলে নিসারের হ্যাট-ট্রিক্ হ'তো। পরের ওভারে নিসারের বলেই ২ রান করে বোল্ড হলে ২-৩৫ মিনিটে অষ্ট্রেলিয়াদের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ১০৭ রানে ১৩৯ মিনিটে শেষ হলো ভারত ৩৩ রানে চতুর্থ টেষ্টেও জয়লাভ করলে।

বোলিংয়ে প্রথম ইনিংসে নিসার ও অমরনাথ ৬১ ও ৫৪ রানে ৫টি করে উইকেট নিয়েছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে নিসার।

ভারতীয় দল—

প্রথম ইনিংস

কার্ত্তিক বসু···কট রাইডার, বো লেদার		৪
মুস্তাক আলি	রান আউট	৪৩
অমরনাথ···কট লাভ, বো লেদার		৩২
অমর সিং···কট লেদার, বো রাইডার		৪৫
এম এম নাইডু···কট এলিস, বো হেনড্রি		৭
ওয়াজির আলি···কট লাভ, বো ম্যাকার্টনে		১৮
রাম সিং···ষ্ট্যাম্পড এলিস, বো মেয়ার		৫
হাদি···	নট-আউট	১৯
সালাউদ্দিন···ষ্ট্যাম্পড এলিস, বো ম্যাকাটিনে		৫
নিসার···বো মেয়ার		০
তিরুভেঙ্কটাচারী···ষ্ট্যাম্পড এলিস, বো ম্যাকার্টনে		৫
অতিরিক্ত		৬
মোট		১৮৯

খেলাঘরের বার্ষিক স্পোর্টস "টাগ্ অফ্ ওয়ার"

ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

রেঞ্জার্স ক্লাবের বার্ষিক স্পোর্টস্ (পাগ্‌লা জিমখানা) ছবি—কাঞ্চন

মোহনবাগান স্পোর্টসে 'আমাদের ছয়জন'— আর সেন, জি সি দাস, এম ঘোষ, এল দেব, বি কে মুখার্জ্জি ও এন কে শীল— ডি এন গুঁইয়ের ছয় জনকে টাগ অফ্ ওয়ারে পরাভূত করছে ছবি—ভক্তকুমার ঘোষ

বোলিং—

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
লেদার	১৮	৩	২৯	২
হেনড্রি	১১	৪	৯	১
আলেকজাণ্ডার	৬	১	১৮	০
ম্যাকার্টনে	২০·৫	৫	৫২	৩
মেয়ার	১১	০	৬৪	২
রাইডার	৬	১	১১	১

ভারতীয় দল—দ্বিতীয় ইনিংস

কে বসু···বো লেদার	১
মুস্তাক আলি···কট লাভ, বো লেদার	৭
অমরনাথ···কট লেদার, বো ম্যাকার্টনে	১৮
অমর সিং···এল বি ডবলিউ, বো হেনড্রি	১০
ওয়াজির আলি···বো ম্যাকার্টনে	১৬
এম এম নাইডু···ষ্ট্যাম্পড এলিস, বো ম্যাকার্টনে	৭
রাম সিং···বো ম্যাকার্টনে	০
হাদি নট-আউট	১৯
সালাদ্দিন···কট ও বো লেদার	১২
নিসার···ষ্ট্যাম্পড এলিস, বো ম্যাকার্টনে	১৭
তিরুভেঙ্কাটাচারী···ষ্ট্যাম্পড এলিস বো ম্যাকার্টনে	১
অতিরিক্ত	৫
মোট	১১৩

বোলিং—

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
লেদার	১৬	৪	৩২	৩
হেনড্রি	১৩	৪	৩৫	১
ম্যাকার্টনে	১৮·৪	৭	৪১	৬

অষ্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস

হেনড্রি···কট অমরনাথ, বো নিসার	০
এফ ব্রায়ান্ট···কট মুস্তাক আলি, বো নিসার	২৬
আর মরিসবী···বো অমর সিং	১২
রাইডার···এল বি ডবলিউ, বো অমর সিং	২০
এইচ এল লাভ···কট ভেঙ্কটাচারী, বো নিসার	১৯
এলিস···কট বসু, বো অমর সিং	২
ম্যাকার্টনে···কট রাম সিং, বো অমর সিং	৩
মেয়ার···বো অমর সিং	৪৮
লেদার···বো নিসার	১৩
জে ডেভিস··· নট-আউট	৪
আলোকজেণ্ডার···বো নিসার	১
অতিরিক্ত	১৪
মোট	১৬২

বোলিং—

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
অমর সিং	১৭	৩	৫৪	৫
নিসার	১৬	২	৬১	৫
সালাউদ্দিন	১	০	১১	০
অমরনাথ	১	০	৬	০
রাম সিং	৪	১	৮	০
মুস্তাক আলি	৩	১	৮	০

অষ্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস

এফ ব্রায়ান্ট···কট অমর সিং, বো নিসার	১১
লাভ···কট অমর সিং, বো নিসার	২
মরিসবি···বো সালাদ্দিন	৩
রাইডার···বো অমর সিং	৪১
হেনড্রি···কট সালাদ্দিন, বো অমরনাথ	৯
ম্যাকার্টনে···বো অমর সিং	১৪
এলিস···এল বি ডবলিউ, বো নিসার	১২
মেয়ার··· নট আউট	৩
ডেভিস···বো নিসার	০
আলেকজাণ্ডার···বো নিসার	২
অতিরিক্ত	৭
মোট	১০৭

বোলিং—

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
নিসার	১৬·৪	৪	৩৬	৬
অমর সিং	২১	৬	৫৪	২
অমরনাথ	১	০	৩	১
সালাউদ্দিন	৪	৩	৭	১

বেঙ্গল অলিম্পিক স্পোর্টসের একশত মিটার দৌড়ে—
প্রথম জেড্ এইচ খাঁন ছবি—কাঞ্চন

বেঙ্গল অলিম্পিক স্পোর্টস্—মেয়েদের ৫০ মিটার
দৌড়—প্রথম, মিস্ এম্ স্মিথ ছবি—কাঞ্চন

মোহনবাগান এথ্লেটিক্ স্পোর্টসের ইণ্টার ক্লাব তিন-পায়া
রেসে বি উকিল ও এস উকিল ৯⅘ সেকেণ্ডে
জয়ী হচ্ছেন ছবি—ভক্তকুমার ঘোষ

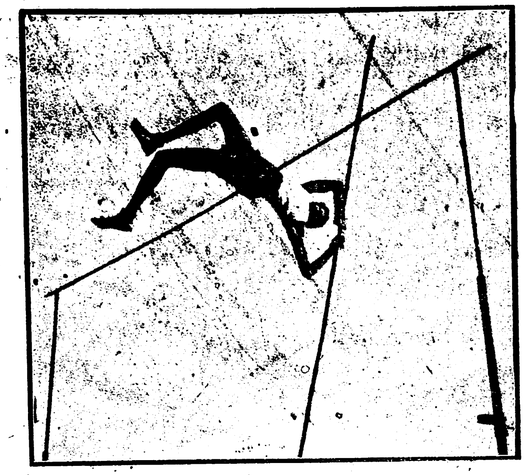

মোহনবাগান স্পোর্টস্—বিজয়ী এইচ কে মুখোপাধ্যায়
(আই এ ক্যাম্প) পোল্ ভল্টে ১০ ফুট ৭
ইঞ্চি লাফিয়ে অল্ বেঙ্গল রেকর্ড
স্থাপন করেছেন
ছবি—ভক্তকুমার ঘোষ

লণ্ডনে মূক বধিরগণের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঃ

১৯৩৫ সালের ১৯শে আগষ্ট থেকে মূক-বধিরগণের চতুর্থ আন্তর্জ্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হয়। সে এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। ইতঃপূর্ব্বে এরূপ আনন্দকর প্রতিযোগিতা লণ্ডনে হয় নি। গ্রেটবৃটেন মূক-বধিরগণের প্রতিযোগিতায় এই প্রথম সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করতে সক্ষম হলেন। সপ্তাহকাল প্রতি অপরাহ্নে হবর্ণ ষ্টেডিয়াম ক্লাবে যে মূকবধিরগণ সমবেত হয়েছিলেন, তাদের সংখ্যা পনেরো শত। পূর্ব্বে লণ্ডনে মূকসমাজে এতাদৃশ আনন্দ ও উল্লাস পরিলক্ষিত হয় নি। ভারতীয় শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী এ-আর-সি-এ (লণ্ডন) ইহাতে যোগদান করেন এবং Walter sportsman হয়ে কার্য্য করেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ হওয়ায় এবং তাঁর রয়েল কলেজ অফ্ আর্টের পরীক্ষায় উপাধিলাভ করার জন্য বহু মূক-বধির আনন্দ প্রকাশ করেন। অনেকে তাঁর ফটো ও 'অটোগ্রাফ' নেন।

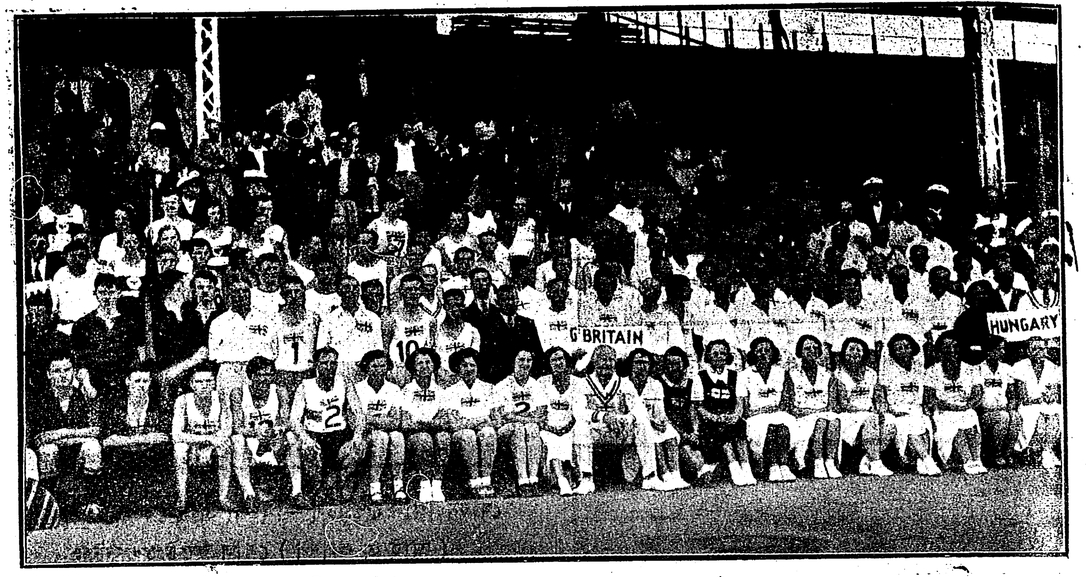

সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকারী গ্রেট বৃটেন দল বন্ধুবর্গ সহ

প্রতিযোগিতার ফলাফল ঃ

		এথ্‌লেটিক্‌স্‌	সাঁতার	ফুটবল	টেনিস্‌	সাইকেল দৌড়	পয়েণ্ট
১।	গ্রেটবৃটেন	৮৪	৪৭	১০	৪৯	১৬	২০৬
২।	জার্ম্মানী	৮১	৭৮	—	১০½	—	১৬৯½
৩।	ফ্রান্স	১০৫	১৫	৪	২০	৯	১৪৯
৪।	সুইডেন্‌	১২১	—	—	—	—	১২১
৫।	ফিন্‌ল্যাণ্ড	১১২	—	—	—	—	১১২
৬।	নরওয়ে	১৮	৩০	—	—	—	৪৮
৭।	বেলজিয়াম	—	—	৬	৩৫½	—	৪১½
৮।	ডেনমার্ক	২৬	১১	—	—	—	৩৭
৯।	হল্যাণ্ড	—	৩৬	—	—	—	৩৬
১০।	হাঙ্গেরী	—	৩০	—	—	—	৩০
১১।	ইউ এস এ	২৯	—	—	—	—	২৯
১২।	অষ্ট্রিয়া	১১	১২	—	—	—	২৩

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "রবীন মাষ্টার"— ২৲

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "সান্ত্বনা"— ১৷৷৹

রায় শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক বাহাদুর প্রণীত "কলিকাতার কথা" (মধ্যকাণ্ড ইতিহাস)— ৩৲

শ্রীসুজো ঠাকুর প্রণীত কাব্য "স্বপ্ন শেষ"— ১৷৷৹

শ্রীসতীশচন্দ্র ভক্তিরত্ন প্রণীত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা কীর্ত্তন"— ১৷৷৹

শ্রীচারুচন্দ্র রায় প্রণীত উপন্যাস "কাল-নিদ্রা"— ১৷৷৹

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত গল্প "বিদেশী ফুল"— ১৷৷৹

শ্রীজগৎ মিত্র প্রণীত উপন্যাস "এরা শুধু মানুষ"— ১৷৷৹

শ্রীজগদীশ গুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "পতিতার জাহ্নবী"— ২৲

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত প্রণীত কবিতা "রূপায়তন"— ১৲

গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত নারী জীবনী "জীবনী সংগ্রহ" দ্বিতীয় ভাগ— ১৷৹

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons,
at the Bharatvarsha Printing Works, 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta

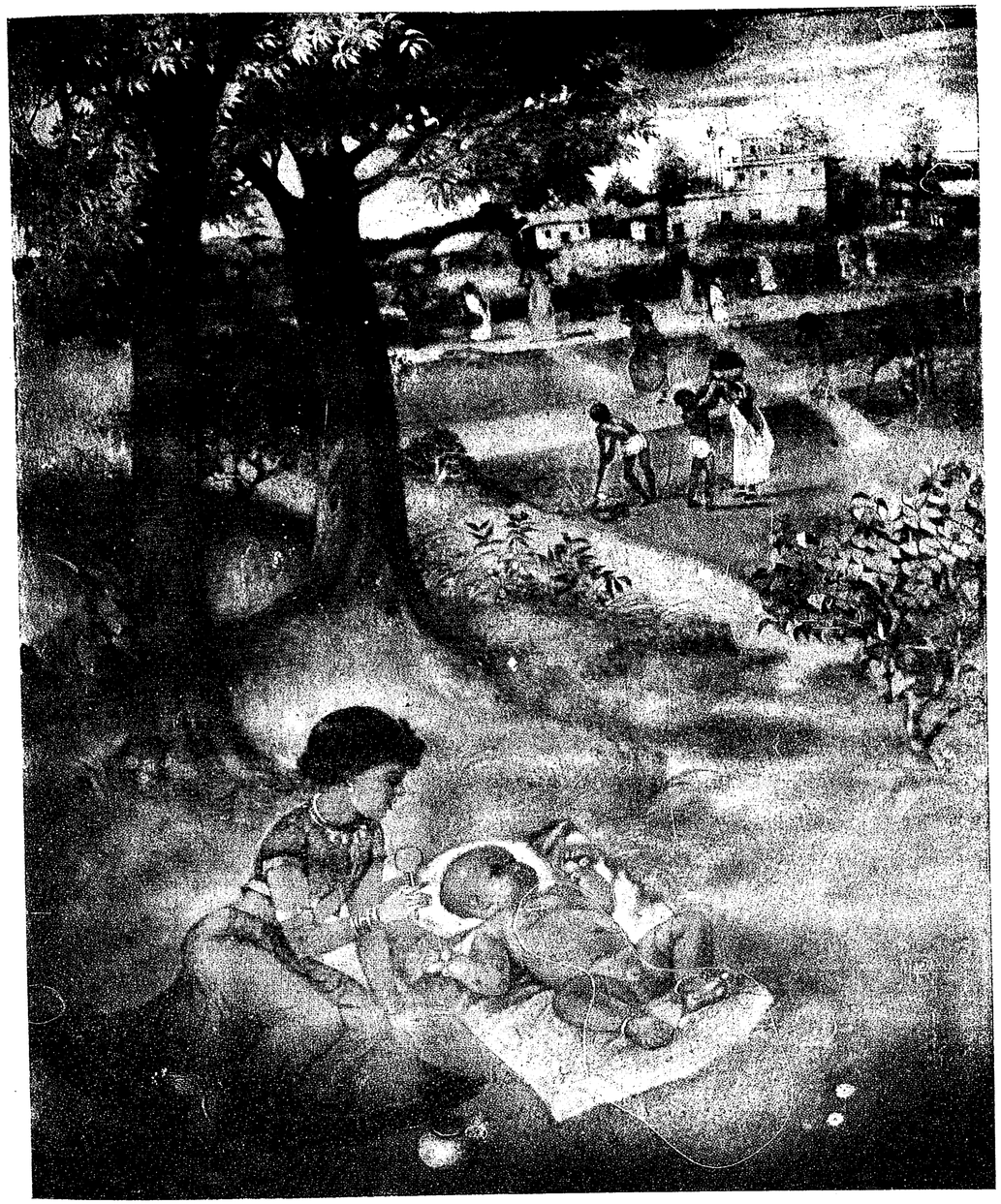

জননীর প্রতিনিধি

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

COLOURED ILLUSTRATION